

ଅନ୍ଧାର-୮-୨୨, ୨୦୧୦



ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମା-ନାମା

ସୁଗ୍ରହସମ୍ପାଦକ—ଗୌରପ୍ରେମସୁଧାସିନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀଗୁଣାଳକାନ୍ତ ଘୋଷ, ଭକ୍ତିଭୂଷଣ ।

ସାହିତ୍ୟଭୂଷଣ ଶ୍ରୀବିଧୁଭୂଷଣ ସରକାର, ବି. ଏ, ବିଦ୍ଵାବିନୋଦ ।

যুটীপত্র

১। সত্যের সন্ধান	৪৮৫	৫। রূপ-সনাতন ও শ্রীজীব
২। ভাল-মন্দ (কবিতা)	৪৮৭	৬। অন্ন-সমস্যা (কবিতা)
৩। ভক্তি	৪৮৮	৭। শ্রীল রসিক বিজ্ঞানভূষণের আত্ম-নিবেদন
৪। ফুল-তুলসী	৪৯৪	৮। বার্তাবহ

কেনবার সময়

“ড্যাড কো”

ছাপটি দেখে নিলে আর ভয় থাকে না

রবার সেট সেভিংব্রাশ

লজেন্স

হরেকরকম ডিজাইন

হরেকরকম ছাঁদে

মনিব্যাগ—ভ্যানিটি ব্যাগ, ফোনিও শান্তিনিকেতন ও অজন্তা ফ্রেস্কো, ইত্যাদি
বহুপ্রকার নক্সা, কার ও বিভিন্ন দামের,—সস্তা অথচ মজবুত

কেশশ্রী

রূপশ্রী

স্নানে নিত্যকেশরাগ

নিত্য ব্যবহারে মু

বিশুদ্ধতায় ও স্রাণে অতুলনীয়

অনিন্দ্য শ্রী লাভ

সোনার ছোপ দেওয়া

মেয়াদী গ্যারান্টিযুক্ত

হরেকনক্সার—বোতাম, হাতের বোতাম, হার, চুড়ি কানের অলঙ্কার, ইত্যাদি।

মেয়াদী সময়ের মধ্যে বর্ণচ্ছটার পরিবর্তন হইলে বিনামূল্যে পরিবর্তন করা হয়।

—ইহা ছাড়া—

মফঃস্বলের গ্রাহকবৃন্দের সুবিধার্থে—সর্বপ্রকার মাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়।

দাদা প্রমু কোং

অফিস :—২২১১২, ষ্ট্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা।

কারখানা :—৮৮বি, মেছুয়াবাজার, ষ্ট্রাইট, কলিকাতা ও যাদবপুর।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা



অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম্-এ, এফ্-সি-এস (লণ্ডন),
এম্-সি-এস (আমেরিকা), আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, ভাগলপুর কলেজের রসায়ন-
শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক (প্রফেসর)

মকরধ্বজ ।

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত)

প্রতি তোলা—৫ টাকা, সপ্তাহ—১/০ আনা ।

সর্বরোগনাশক মহৌষধ । ইহা ত্রিদোষ নাশক ।

সকল রোগে মকরধ্বজের অমুপান বিধির পুস্তিকা—১/০ আনা ।

সারিবাতি সালসা ।

(রেজিষ্টার্ড)

প্রতি শিশি—৬/১০ আনা ।

রক্ত পরিষ্কারক সর্বপ্রকার উপাদানে প্রস্তুত । এই সালসার গুণ অবর্ণনীয় । রক্তই আমাদের জীবন ।

রক্ত পরিষ্কার ও সতেজ থাকিলে কোন রোগের বীজাণুই সহজে আক্রমণ করিতে পারে না ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ ।

প্রতি সের—৩৮/০ আনা ।

সর্বোৎকৃষ্ট আমলকী, বংশলোচন ও অন্যান্য উপাদানে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করিয়া চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত হয় ।

অবলাবান্ধব যোগ ।

(রেজিষ্টার্ড)

প্রতি ১৬ মাত্রা—২১০ আনা ।

স্ত্রীরোগসমূহের অব্যর্থ মহৌষধ । ইহা সেবনে প্রদর, বাধক, পৃষ্ঠে বা কোমরে বেদনা, মাথাধরা রজ্জ্বদোষ,

মৃতবৎসান্ধ, বন্ধান্ত বিদূরিত হয়, জরায়ু সুস্থ ও সবল হয় এবং দীর্ঘায়ু সন্তানধারণের ক্ষমতা জন্মে ।

মৃতসঞ্জীবনী ।

(রেজিষ্টার্ড)

বড়শিশি—৪১০ টাকা, ছোটশিশি—২১০ টাকা ।

হৃদয়ে সুস্থ, সবল ও কর্মঠ করিতে ইহলে এই মৃতসঞ্জীবনী একমাত্র অবলম্বনীয় । প্রসূতির অবশ্য সেবনীয় ।

জ্বর, হৃৎকম্প, বাত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, রক্তাক্ততা, রোগান্তে দৌর্বল্যাদিতে সর্বদা প্রযোজ্য ।

অর্শবটী ।

(রেজিষ্টার্ড)

৩০ বটিকাপূর্ণ প্রতিশিশি—৫ টাকা ।

অসহনীয় কষ্টপ্রদ সকল প্রকার অর্শরোগ নিবারণের অদ্বিতীয় মহৌষধ ।

সর্বজ্বর বটী ।

(রেজিষ্টার্ড)

প্রতি ১৬ বটী—২১০ আনা ।

কোনও জ্বররোগে অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া বহু পরীক্ষিত । জরের এইরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ আজপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই ।

কৃষ্ণ জনসেবায় :—



প্রণব ঔষধালয়—ডাক
দুলভ ও বিপ্লবতম আয়ুর্বেদীয় প্রতিষ্ঠান
হেড্, অফিস ও কারখানা—
নারায়ণগঞ্জ (বেঙ্গল)

অধ্যক্ষ :—কবিশেখর শচীন্দ্রমোহন পোদ্দার, বি, এ,
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, সাহিত্যবিনোদী

প্রধান ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক :—
কবিরাজ মনোমোহন দাশ গুপ্ত, ব্যাকরণতীর্থ, বিচারক, কবিভূষণ

মকরধ্বজ—	৫, তোলা	চ্যবনপ্রাশ—	৩, প্রতি
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট—	১০ শিশি	বৃঃ ছাগলাত্ব ঘৃত—	১০, ”
বৃঃ দশমূলারিষ্ট—	১, ”	সপ্তপ্রস্থ মহামাষ তৈল	১৬, ”
পত্রাঙ্গাসব—	১০, ”	বসন্ত তিলক—	১, সপ্তাং
সর্ববিধ রক্ত ছুষ্টিতে—		স্নায়ুপুষ্টি ও সবলতালভে—	
সারিবাদি রসায়ন—	১৫০ বোতল	স্বী সঞ্জীবন—	১৪, সের

তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত প্রভৃতি যাবতীয় আয়ুর্বেদীয় ঔষধ সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

ইনজেক্সন ব্যতীত
কালাজ্বর চিকিৎসায়—
হারবেকস্
দেশীয় ভেষজে—নব আবিষ্কার

সর্দি, কাশি ও হুপিং কফে
চুষনী
আয়ুর্বেদের অভিনব দা

স্কুলের হেড্, মাস্টার, ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, মেম্বার অথবা স্থানীয় বিশিষ্ট লোকের
পত্রসহ অর্ডার দিলে আমাদের আর্সবিভাগ হইতে দরিদ্র রোগীদিগকে বিশেষ কনসেসনে ঔষধ সর
করিয়া থাকি।

• সর্বত্র শাখা ও এজেন্সী খোলা হইতেছে—আবেদন করুন।

— শ্রীশ্রীমা-দাদা —

“মাতৃশ্বের ভ্রাতৃশ্বের উজ্জল আলোকে,
নদীয়ার প্রেমধারা বহুক ভুলোকে।”

১৩৬, ১৬৬

বর্ষ	৪৫৯ গৌরাক	অগ্রহায়ণ
সংখ্যা	ইং নভেম্বর, ১৯৪৩	১৩৫০ সাল।

সত্যের সন্ধান

শ্রীবিষ্ণুভূষণ সরকার বিশ্বাবিনোদ।

হংসদেব বলিয়াছেন “যত মত, তত পথ।” কথাটা বটে, এবং ইহা গীতার কথাই প্রতিধ্বনি মাত্র। অর্জুনকে কহিয়াছেন, “মম বস্তুভূবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ” অর্থাৎ, মনুষ্য সর্বপ্রকারে ভগবানের পথই করে। পরমহংসদেব হয়ত কথাটা বলিয়াছেন সঙ্ক্ষেপে, তাহা হইলে কথাটা এই দাঁড়ায়—ধর্ম সম্বন্ধে পোষণ করুন, তাঁহার পক্ষে সেইটা ভগবানকে পথ। তবে কোন পথ সংকীর্ণ, কটকাকীর্ণ, সাচ্ছন্দ্য, কঠিন হইতে পারে, কোন পথ প্রশস্ত, জনবহুল, আলোকময় ও সহজ হইতে পারে। মাঝারী শ্রীগৌরঙ্গমহাপ্রভু প্রবর্তিত নামকীর্তন নাম-ধ্বজ সুন্দর উজ্জল সকলেরই অধিগম্য পথকে সর্বপ্রকারে সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যে, যুদ্ধক্ষেত্রে বসিয়া অর্জুনকে কীর্তন করার জন্য ঐ কথাটা বলিলেন, উহা আরো সত্য। ‘সর্বশঃ’ কথা দ্বারা তিনি হয়ত এই কথাটি কহিয়াছেন যে, ধর্ম-জগতেই হউক, কর্ম-জগতেই হউক, যিনি যে পথে বিচরণ করেন, সেই পথই তাঁহারই পথে লইয়া যাইবে। রক্তাক্ত পথেই দম্ভাতার পথই তাঁহাকে ভগবানের পথে লইয়া যাইবে। তিনি হইলেন বাঙ্গালী। শ্রীকৃষ্ণ ইহাও কহিয়াছেন—যিনি জাগতিক কাম্যকর্মের জন্য অস্তিত্ব করে ও পূজা করেন, তিনি ভগবানেরই পূজা

করেন বটে, কিন্তু তাহা অবিধিপূর্বক অর্থাৎ সে পথ বড় জটিল—বাসনা পূরণ করিতে করিতে ঘাতপ্রতিঘাতে সময়ে বাসনার ক্ষর হইয়া যাইবে—কিন্তু সে বড় সময়-সাপেক্ষ। বেদ সম্বন্ধেও কৃষ্ণ কহিলেন যে, বেদ গুণময়, তাই তিনি অর্জুনকে গুণাতীত হইতে কহিলেন। গুণাতীত অর্থে কিন্তু যুদ্ধ হইতে বিরতি বুঝায় না, কেননা অর্জুনের বিষাদবোগ ভাঙ্গিয়া যুদ্ধে—ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত কবাই শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত উপদেশের উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণই আবার বলিলেন, “যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি,” অর্থাৎ, জপযজ্ঞই সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ।

এখন কথা এই—সকল মতই যখন শ্রীভগবানকে পাওয়ার পথ, স্মরণ্য কর্ম বোগ জ্ঞান ভক্তি যখন বিভিন্ন পন্থামাত্র, আর, সকল পথই যখন তাঁহারই পথে লইয়া যায়, স্মরণ্য ধর্ম অধর্ম সকলই যখন ভগবানের পথ (বস্তু), তখন কি মানুষ বিচারবুদ্ধি ছাড়িয়া যাহার যাহা খুলী তাহাই করিয়া যাইবে? পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী ও নানুষে পার্থক্য এই,—মানুষের বিচারবুদ্ধি আছে। বানর ভারতবর্ষেও বসতি নির্মাণ করিয়া থাকে না, আফ্রিকায়ও নয়। পক্ষী এ দেশে ঘেরুপ বাসা নির্মাণ করে, অন্য দেশেও তজপ করে। সকল দেশেরই বানরের ভাষা একই রকম। মানুষের তাহা নয়। ইতর প্রাণী অপেক্ষা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি পরিপক্ব, যাহার পরিচালনায় সে স্বীয় উন্নতি সাধন করিতে পারে এবং তাহা দ্বারা জগতেরও কল্যাণ সাধন করিতে পারে। ইহাই মানুষের

বৈশিষ্ট্য। যুদ্ধাদিও যদি করিতে হয়, তবে তাহার মূলে পশু-প্রকৃতি আত্মগ্রাসিতা বা দানবতা থাকিবে না। জগতের হিত থাকিবে মহান উদ্দেশ্য। অবশ্য বাহিরে এই উদ্দেশ্য দেখাইয়া আত্মবঞ্চনা করা অতিশয় অসঙ্গত। এই জন্তই বিচাববুদ্ধির প্রয়োজন।

শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভু এই প্রশ্নের অতি সহজ সমাধান করিয়াছেন। তিনিও বলিয়াছেন বটে—যার যেই ভাব সেই সর্বোত্তম। ইহা আরও বিশ্বব্যাপক। শাস্ত্রদাস্যাদি পঞ্চবিধ রত্নের কথা বলিতে যাঁহা প্রভু এই কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহা ব্যাপকভাবেই প্রযোজ্য। মহাপ্রভু শুধু এই কথা কহিয়াই নীরব रहিলেন না। সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরো বলিলেন—তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তরতম। তটস্থ অবস্থা অর্থ ভাবসাক্ষী অবস্থা। যেমন নদী বা সমুদ্রের তটে থাকিয়া উভয় দিকের অবস্থাই দর্শন করা যায়, তেমন কোন ভাব ও তৎপ্রণোদিত কর্মের আলোড়নে না পড়িয়া জাগতিক সমস্ত ভাব পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করিতে হইবে, তারপর তারতম্য বিবেচনা করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এই বিচার-বিবেচনা সুগম করার জন্ত তিনি বলিলেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। যিনি দাস বলিয়া স্বীকার করেন তিনিও দাস, যিনি স্বীকার না করেন তিনিও দাস। কৃষ্ণ বলিতে যিনি দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীমহানন্দর যশোদানন্দন স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া স্বীকার না করেন, না করুন। সর্বসত্তাকর্ষক সর্বেশ্বর ভগবান্ একটা বস্তু আছেন, তাহাত সকলেই স্বীকার করেন। আর যদি বা কেহ নাস্তিক হন, তিনিও বিচার করিলে আস্তিক হইবেন। শ্রীদাদার কাছে একটা লোক প্রশ্ন করিয়াছিলেন, “ঈশ্বর আছেন কি নাই, কিরূপে বুঝিব?” শ্রীদাদা উত্তর করিলেন, “ঈশ্বর নাই” ইহাই প্রথমতঃ ভাবুন ও তদনুসারে কার্য্য করুন।” সেই সম্রাস্ত ও, বিদ্বান্ ব্যক্তি এইরূপ আচরণ করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হইলেন। একটা নাস্তিক ইংরেজ ধরের প্রাচীরে সর্বত্র লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, God is nowhere, তাহার মেয়ে উহা পড়িলেন ‘God is now here’। ইহাতে পিতা ঈশ্বর-বিশ্বাসী হইলেন। বাহা হউক, ভগবান্ অনন্ত-

চৈতন্য, জীব অমৃত-চৈতন্য। স্মরণ্য জীব শ্রীভগবান্ দাস। ইহাই মহাপ্রভু কহিলেন। ইহাই যদি বিবেচনা তবে এই বিশাল বিশ্ব-পরিবার সকলেই সকলে সকলেরই কর্তা বা নিয়ন্তা একজন। কোন পার্থক্য থাকিলে, সেই ভূত্যাগণের মধ্যে যদি কলহ উপস্থিত তবে গৃহস্থায়ী অপ্রীত হন। পরস্পর প্রত্যেক ভূত্যা নিরূপিত কর্ম করিয়া যায় এবং মনে করে সবার সমষ্টি লইয়াই ত গৃহস্থায়ীর কর্ম সম্পূর্ণ হয়, ইহা নিজের স্বত্বস্বামিস্ব নাই, সকলেই ত এক জনার ভূত হইলে আর ছোট-বড় ভেদ-জ্ঞান-জনিত কলহ হয় না। সুখে থাকে, কর্ম করার সময় কর্ম করে, আর সকল দ্রাঘত্ব-বোধ-জনিত সন্তোষ ও তৃপ্তি থাকে, কর্তাও তাহাতে বড় প্রীত হন। এই বিশাল বিশ্ব-তন্ত্রপ। এই বিশ্ব-পরিবার প্রতিষ্ঠিত করিতেই মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইলেন। তাই তাঁহার উপদেশ সূত্র হইল ঐ—

“জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।” তিনি উপদেশ দিলেন তাহা নহে, আচরণ করিয়াও অধ্যাপক অবস্থায় তিনি ছাত্রগণকে ‘ভাই’ বলিয়া কহিতেন। হরিনাম বিতরণেও তাহাই করিয়াছেন। শিষ্য, ছোট-বড়-ভেদজ্ঞান তিনি নিজে ভুলিয়া অপভুলিয়া বাইতে শিক্ষা দিয়াছেন।

এই সত্যের সন্ধান পাইলে তটস্থ বা ভাবনাক্ষী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভাবদ্রষ্টা হইয়া স্বয়ং কৃতি ও সামর্থ্যবান্ যিনি যে পরিবেষ্টনীতে বসবাস করেন তাহার বিচারে তারতম্য নির্ধারণ করিয়া ধর্ম ও কলহ লইয়া সেই পথে বিচরণ করিলে, কেহ হওয়া ত দূরের কথা, সকলেই সকলের শ্রীগোরাঙ্গ ইহার পরিপূর্ণতম আদর্শ দেখাইয়াছেন।

এখন প্রশ্ন এই হইতে পারে, যিনি দাস মনে না করিয়া আশ্বিনের বড়াই কহিলে বিরোধের স্বজন করেন, সে স্থলে উপস্থিত সহজ সমাধান শ্রীমহাপ্রভু করিয়াছেন

আচরণ, ভগবৎ-কথা আধাপন ও সর্বোপরি উচ্চ-সংকীর্ণন। ইহা দ্বারা বস্তু-শক্তি-প্রভাবে ভাবের সম্প্রসারণ হয়, প্রতি-কূল অকূল হয় এবং সকলের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হয়। তাহারই অবশ্রুতাবী কল—পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেম। উহাই পরম সত্য।

কর্ম, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি, ইহার সূত্রবিচারে ভক্তির শ্রেষ্ঠতাই প্রতিপন্ন হয়। কাম্যকর্ম দ্বারা অতীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি, যোগ দ্বারা অষ্ট-সিদ্ধি-লাভ, নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা প্রাপ্ত ব্রহ্মলয়। ইহার কোনটাই ভগবানের সহিত সম্বন্ধ রাখা হয় না। ভগবান যে কর্ম্মাভীত, যোগাভীত, জ্ঞানাভীত, কিন্তু ভক্তির অধীন ইহাও সকলে বলেন। ভক্তির পরিপাক্যবস্থাই প্রেম। ভালবাসা নামে একটা বড় মধুর বস্তু প্রত্যেকের চিত্তবৃত্তিতে বিরাজমান। ইহার অমূল্যলন করায়ই মানবজীবনের সার্থকতা। দাম্পত্যপ্রণয়ে এই ভালবাসার বিশিষ্ট বিকাশ, আবার এই দাম্পত্যপ্রণয়ই মায়ার অধীন হইয়া বন্ধন ও জিতাপজ্ঞানার প্রধান হেতু। ইহা হইতে পরিত্রাণের জন্ত আসিলেন পরিপূর্ণ আদর্শ দম্পতি শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া। নরনারী লইয়া মানবসমাজ। সূত্রায় দুইটা আদর্শের প্রয়োজন। তাই সেব্য-সেবক, আরাধ্য-আরাধক—দুইটা বস্তুর উদয় হইল। ইহারাই হইলেন গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া—ইহার নিত্যচিদানন্দধনবিগ্রহ। ইহাদের অপ্রকট-লীলায় এই নিত্যচিদ্রস্বয় পরিপূর্ণ প্রকাশিত। ইহারাই বিশ্বপরিবারের কর্তা-কর্তা। কোন পরিবারের কর্তা-কর্তা যদি আত্মসুখরত হন, তবে সে পরিবারে বিরোধ, বিশৃঙ্খলা, অশান্তি অনিবার্য। দাবাইয়া বা ধমক দিয়া কে কবে শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষা করিতে পারিয়াছে? গৌর-

বিষ্ণুপ্রিয়ার বিশ্বপ্রেমের কথা কে না জানেন? আত্মসুখ-লেশাভাসশূন্য-প্রেমপরিতত্ত্বাবশতঃ তাঁহাদের আত্মোৎসর্গ জগতের ইতিহাসে আর নাই। এই দুইটা বস্তুকে আদর্শ লইয়া জীবনপথে চলিলে বিশ্ব প্রেমসয় হইবে। ইহাই বিচারের কথা। ঠাকুর নরোত্তম বিচার করিয়াই বলিয়াছেন—

দেখিয়া শুনিয়া ভক্ত সাধু শাস্ত্রমত যজ
যুগলচরণে কর রতি।

তাই তিনি খেতরীতে নদীয়া-যুগল-সেবা স্থাপন করিলেন।

বলদ্বন্দ্ব নেপোলিয়ন যুদ্ধের তীব্রতার মধ্যে জোছেফাইনকে মনে পড়ায় ভাবিয়াছিলেন, আড়ম্বরবিহীন সাধারণ একজন কৃষকের দাম্পত্যজীবনও তাঁহার সময়বিষ্কৃত জীবন অপেক্ষা বরগীয়া। নেপোলিয়নও দাম্পত্যজীবন ভালবাসিতেন বটে, কিন্তু তাহা কামকলুষিত। তাঁহার লালসা ছিল রাজ্য হওয়ার, আর পত্নীকে রাণী করায়। এই লোভপরবশ হইয়া তিনি কত দাম্পত্যজীবন বিনষ্ট করিয়াছেন। তিনি যদি সত্যসত্যই দাম্পত্য প্রণয় ভালবাসিতেন তাঁহার দাম্পত্য-প্রণয় যদি মায়ার বিজ্ঞপ্ত না হইত, তবে তিনি নৃশংসভাবে অপরের দাম্পত্যপ্রণয়ে করাবাত করিয়া বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে পারিতেন না। বর্তমান বিশ্বব্যাপী-সংগ্রামেও এই কথা প্রযোজ্য। মানুষ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। এই সময় এই পরম ও চরম সত্য প্রেমধনবিগ্রহ নদীয়া-যুগলের দিকে দৃষ্টি পড়িলে বিশ্বপরিবার জগন্ময় স্থাপিত হইবে, আবার জগৎ হাসিবে, বস্তুধরা নাচিয়া উঠিবে; সুখের সংসারে বসতি করিয়া দেখিবে

বিশ্ব পূর্ণ সুখায়তে।

ভাল-মন্দ।

সবাই ভাবে আমি ভাল, মন্দ তবে কে?

আমায় যে জন মন্দ বলে, নিশ্চয় মন্দ সে।

এমনদ্বারা ভালয় মন্দয় ব্যর্থ সময় যায়,

আপন মনে কর্ম করে, বুদ্ধিমান যে হয়।

ভক্তি

(পূর্বানুসরণ)

শ্রীবাধাগোবিন্দ নাথ

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্তাৎ-

ঈশাদপেতস্ত বিপর্যায়োহস্থতিঃ ।

তদ্ব্যয়য়া ইত্যাদি । ১১।২।৩৭-

পরমেশ্বর হইতে অপগত বা বিমুখ জীবের মায়াবশতঃ স্বরূপের বিস্মৃতি জন্মে এবং তজ্জন্ম বিপরীত বুদ্ধি—দেহ-দৈহিক বস্তুতে অহং-মমত্বাদিবুদ্ধি—জন্মে; এই বিপরীত বুদ্ধি হইতেই দ্বিতীয় বস্তুতে অর্থাৎ ঈশ্বরাতীত দেহাদিতে অভিনিবেশ জন্মে এবং তাহা হইতেই ভয় জন্মে ।

পূর্বের বলা হইয়াছে, জীবাত্মা দেহেন্দ্রিয়াদিতে নিজেকে শিশাইয়া দিয়া, দেহেন্দ্রিয়াদিতে আমি-আমার-ইত্যাদিরূপ ভাব আবোপিত করিয়া দুধের সাধ কর্দ্ধমজ্জলে মিটাইতে চায়। ইহাও মায়ারই ক্রিয়া। এই অবটন-বটন-পটয়সী মায়ার ঈশ্বরের স্মৃতি মনে জাগিতে দেয় না, জীবের নিজের স্বরূপের কথাও ভুলাইয়া রাখে এবং বাহিরের বস্তুতে অভিনিবেশ জন্মাইয়া দেয়। তাই আমাদের মন দুর্দাসনায় পরিপূর্ণ। ভগবৎ-সম্বন্ধিনী বাসনা ব্যতীত অন্য সমস্ত বাসনাই দুর্দাসনা। এই মায়ার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইতে না পাবিলে আমাদের বহির্ভূতাই ঘুচিবে না।

কিন্তু মায়ার ভগবৎ-শক্তি, জীবের পক্ষে ছবতিক্রমণীয়া। গীতায় শ্রীকৃষ্ণই একথা বলিয়াছেন—

দৈবী হ্যেবা শুণময়ী মম মায়ী দুঃখময়া । ৭।১৪

তাহা হইলে উপায়? উপায়ের কথাও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

মামেব যে প্রপত্তস্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে ॥ ৭।১৪

যাহারা ভগবানের শরণাপন্ন হন, তাহারাই এই মায়ার কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারেন।

কিন্তু ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া সহজ কথা নয়—মুখের কথা তো নয়ই। শরণাগতির যে ছয়টা লক্ষণ হরিভক্তি বিলাসে দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেই ইহা বুঝা যাইবে।

আমুকূল্যস্ত সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্ত বর্জনম্ ।

রক্ষিত্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা ।

আত্মনিষ্কেপকার্পণ্যো বড়বিধা শরণাগতিঃ ॥ ১১।৪।১৭

ভগবদ্ভক্তনের অমুকূল্য বিষয়ের ব্রতরূপে গ্রহণ এবং তাহার প্রতিকূল বিষয়ের বর্জন, ভগবান্ আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন—এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস, রক্ষাকর্ত্তারূপে ভগবান্কে বরণ করা, ভগবানে আত্মসমর্পণ এবং তাহার চরণে আর্জি-জ্ঞাপন—এই ছয় প্রকার শরণাগতির লক্ষণ।

শরণাগতির যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। এই যোগ্যতা অর্জনের যে সাধন, প্রেমপ্রাপ্তিরও সেই সাধন। কিন্তু কি সেই সাধন? ভক্তি।

কিন্তু ভক্তি বলিতে কি বুঝায়? ভক্তির তাৎপর্য কি? ভজ্-ধাতু হইতে ভক্তিগত নিষ্পন্ন; ভজ্-ধাতুর অর্থ সেবা; ভক্তি অর্থও সেবা। গোপালতাপসী শ্রুতিও একথাই বলিয়াছেন—ভক্তিরন্ত ভজনম্—এই রসস্বরূপ সচ্চিদানন্দ-পুরুষের সেবাই ভক্তি। কি রকম সেবা? ইহা মূত্রোপাধি-নৈরাস্যো নৈব অমৃশ্বিন্ মনসং কল্পনম্—ইহকালের ও পরকালের সমস্ত স্বেচ্ছাভোগের বাসনা পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাতে সম্যকরূপে মনের অর্পণ—তাহাই সেবা, তাহাই ভক্তি। তাঁহাতে মন অর্পণের তাৎপর্য হইল এই যে, যাহা কিছু চিন্তা করিবে এবং সেই চিন্তার ফলে যাহা কিছু কাজ করিবে, তৎসমস্তই যেন ভগবৎ-সম্বন্ধীয়ই হয়। অস্ত্রাত্ম ইন্দ্রিয়ও মনের অন্তর্গত; সুতরাং ইহাও ধ্বনিত হইতেছে যে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কেই ভগবৎ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে সর্বদা নিয়োজিত রাখিতে হইবে। ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি এবং নারদপঞ্চরাত্রও একথাই বলিতেছেন—

সর্বোপাধিবিমুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্ ।

হৃদীকেশ হৃদীকেশ-সেবনং ভক্তিরূচ্যতে ॥

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর ভগবানের সেবনই ভক্তি—যদি সেই সেবায় অন্য কোনও বাসনার সংযোগ না থাকে এবং যদি তাহা ভগবানের প্রীতির আনুকূল্যদ্বারা নির্মল হয়।

ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা কিছু করিবে, মনের দ্বারা যাহা কিছু ভাবিবে, তৎসমস্তই যেন সাক্ষাদ্ভাবে—অন্ততঃ পরম্পরা-

ক্রমেও—ভগবৎ-সম্বন্ধে হয়, ইহাই অধ্যাত্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা। শ্রীমন্ মহাপ্রভুও একথাই বলিয়াছেন—“কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা।”

এইরূপ বিধানের একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা আছে; তাহা এই। ভগবানকে ভুলিয়া, স্নেহের মূল উৎসের সন্ধান হারাইয়া আমাদের মন ইন্দ্রিয়বসের সহিত তথাকথিত স্নেহের সন্ধান বাহিরের দিকে ছুটিয়া চলিতেছে; অথচ স্নেহ পাইতেছে না, পাওয়ার কথাও নয়। প্রকৃত স্নেহ পাইতে হইলে বহিমুখ মনের, বহিমুখ ইন্দ্রিয়-বর্গের গতি ফিরাইতে হইবে, তাহাকে অন্তর্মুখী—ভগবৎমুখী করিতে হইবে। মনকে এবং ইন্দ্রিয়বর্গকে যদি সর্বদা ভগবৎ-সম্বন্ধীয় কার্যে ব্যাপৃত রাখা যায়, তাহা হইলেই তাহাদের পক্ষে ভগবৎস্নেহ হওয়া সম্ভব।

মনকে সর্বদা ভগবৎ-সম্বন্ধি কার্যে ব্যাপৃত রাখার আর একটা প্রয়োজনীয়তাও আছে; তাহা এই। পূর্বে বলা হইয়াছে ভগবৎ-বিশ্বতিবশতঃই আমরা মায়ার কবলে পতিত হইয়াছি; তাহারই ফলে আমাদের নানা রকম দুর্ভোগ; তাহারই ফলে নানারকম দুর্কীসনা, নানারকম অনর্থ আমাদের চিত্তে কেবল পুঞ্জীভূত হইয়াই চলিতেছে। সাধনার লক্ষ্যই হইল—এই সকল অনর্থের নিবৃত্তি, দুর্কীসনার মূলোৎপাটন, মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি। এ সমস্তের আদি কারণই হইল যখন ভগবৎ-বিশ্বতি, তখন ভগবৎ-বিশ্বতি দূর করিতে পারিলেই সমস্তের মূলোৎপাটন সম্ভব হইতে পারে। অন্ধকারকে দূর করিবার একমাত্র উপায় যেমন আলোক, তেমনি বিশ্বতিকে দূর করিবার একমাত্র উপায়ও স্বতি। তাই সর্বদা ভগবৎ-স্বতি অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয়। আমাদের সাধনমূলক শাস্ত্রও একথাই বলেন :—

সততং স্মার্তব্যোবিস্তুর্বিস্তব্যো ন জাতু চিং ।

সর্বো বিধিনিষেধাঃ স্ম্যন্তেতস্মোরেচ কিস্করাঃ ॥

সর্বদা ভগবানকে স্মরণ করিবে; ইহা একটি বিধান; সাধন সম্বন্ধে অন্তর্যত রকম বিধান আছে, তৎসমস্তই এই একটা বিধানের কিস্কর বা অঙ্গুগত। আর, কখনও ভগবানকে ভুলিবে না—ইহা একটা নিষেধ; সাধন সম্পর্কে

অন্তর্যত রকম নিষেধ আছে, তৎসমস্তই এই একটা নিষেধের কিস্কর বা অঙ্গুগত। এই স্লোকে অস্মরী ও ব্যতিরেকীভাবে একটীমাত্র কথাই বলা হইল—সর্বদা ভগবানকে স্মরণ করিবে। ইহাই সাধনমূলক অঙ্গুষ্ঠানের মূল্যনির্ণয়ের কষ্টি-পাথর। চিত্তে ভগবৎ-স্বতি আগ্রত করা এবং সেই স্বতিকে রক্ষা করার জন্তই সাধনাস্থের অঙ্গুষ্ঠান; স্মরণ যে অঙ্গুষ্ঠানে ভগবৎ-স্বতির সহিত সম্বন্ধ নাই, লৌকিক জগতে তাহার সামাজিক মূল্য কিছু থাকিলেও তখনো থাকিতে পারে, কিন্তু সাধনরাজ্যে তাহার কোনও মূল্য নাই। ইহা যে কেবল ভক্তিমার্গের বিশেষত্ব, তাহা নয়। সাধকমার্গের পক্ষেই ভগবৎ-স্বতি অপরিহার্য; স্মরণ জ্ঞানমার্গে বা যোগমার্গেও ইহা অপরিহার্য। সাধকের ভাববৈশিষ্ট্য অবশ্য এই ভগবৎ-স্বতিকে একটা বিশিষ্টরূপ দান করিয়া থাকে।

কিন্তু ভক্তিমার্গের ভাববৈশিষ্ট্য কি এবং ভগবৎ-স্বতিকে তাহা কি বিশিষ্ট রূপ দান করে?

পূর্বে বলা হইয়াছে—ভক্ত চাহেন ভগবানের মাধুর্যের আন্বাদন—যাহার জন্ত তাহার প্রয়োজন গাঢ় প্রেমের। প্রেমের অর্থ হইল ভগবানের প্রীতিবাসনা; এই বাসনা যখন অত্যন্ত বলবতী হয়, তখনই প্রেম গাঢ় হয়। কিন্তু কোনও বলবতী বাসনাই নিষ্ফল থাকে না, থাকিতে পারে না। বলবতী ভগবৎ-প্রীতি-বাসনাও ক্রিয়াশীল হয়, ভগবৎ-সেবাতে পরিণতি লাভ করে। সেবাদ্বারা—ভগবৎ-স্বৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা দ্বারা ভগবানের প্রীতিবিধান করে এবং তাহারই প্রভাবে আপনা-আপনিই ভক্তের ভাগ্যে মাধুর্যের আন্বাদন লাভ হইয়া থাকে।

এই ভগবৎ-স্বৈকতাৎপর্যময়ী সেবাই হইল ভক্তিমার্গের বৈশিষ্ট্য। এই ভাববৈশিষ্ট্য ভগবানকে দেয় সেব্যের রূপ এবং ভক্তকে দেয় সেবকের রূপ; এই সেব্য-সেবকত্ব-ভাবে দ্বারাই ভক্তের ভগবৎ-স্বতি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

যাহা হউক, দেখা গেল—ভক্তের মূল কাম্য হইল ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে ভগবৎ সেবা। পূর্বে দেখান হইয়াছে, তাহার সাধন যে ভক্তি, তাহার তাৎপর্য ও সেবা।

এইরূপে ভক্তিমার্গের সাধনে ও সাধ্যে—উপায়ে ও উপেষে—
একটা সামঞ্জস্য আছে, বাস্তবিক উহাদের তাৎপর্য একই,
পার্থক্য কেবল পরিণতি বিষয়ে। ইহাই নরোত্তমদাস
ঠাকুর মহাশয় নিয়োদ্ধৃত বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন :—

সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধদেহে তাহা পাই,
পঞ্চাপকমাত্র সে বিচার ।

পাকিলে সে প্রেমভক্তি, অপেক্ষে সাধনগতি,
ভকতিলক্ষণ তৎসার ॥

সাধনের উদ্দেশ্যই হইল, মনকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছবার
উপযুক্ত এবং অমুকুল করার নিমিত্ত একটা নিয়মানুবর্তিতার
ভিতর দিয়া অগ্রসর হওয়া। ভক্তিমার্গের নিয়মানুবর্তিতার
প্রাণ হইল—ভগবৎ-সুধৈক্যতাৎপর্যময়ী সেবায় অমুকুল
ভগবৎ-স্বত্তি। যে যে অমুষ্ঠানের দ্বারা এইরূপ স্বত্তি হৃদয়ে
জাগ্রত হইয়া স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে, তৎ-সমস্তই হইল
সাধন ভক্তির অঙ্গ। সুতরাং যে কোনও কার্যের সহিতই
উক্তরূপ স্বত্তি জড়িত থাকে, তাহাই সাধনভক্তির অঙ্গ বলিয়া
পরিগণিত হইতে পারে। একান্ত সাধনভক্তির অঙ্গ অনেক।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহুত বিস্তার ।

সাধনভক্তির বহু অঙ্গ থাকিলেও নয়টা অঙ্গই শ্রেষ্ঠ। শ্রীমন্
মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি ।

কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি । চৈঃ চৈঃ ৩।৪।৬৫
এই নববিধা ভক্তির কথা ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের মুখে শ্রীমদ্-
ভাগবতে এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে :—

শ্রবণং কীৰ্ত্তনং ত্রিষোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।

অর্চনং বন্দনং দাস্যং সধ্যমাশ্রনিবেদনম্ ॥

ইতি পুংসাপিতা বিষ্ণো ভক্তিশ্চৈকবলক্ষণা ।

ক্রিয়তে ভগবত্যাক্ষা তস্মাত্ত্রৈবীতমুত্তমম্ ॥৭।৫।২৩-২৪

গুরুগৃহে অধ্যয়ন-সমাপ্তির পরে প্রহ্লাদ যখন পিতার
চরণে বাইয়া প্রণত হইলেন, তখন তাঁহার পিতা দৈত্যরাজ
হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে আশীর্বাদ ও স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া
বলিলেন—“বৎস, এতকাল গুরুগৃহে থাকিয়া যাহা শিখিয়াছ,
তাঁহার মধ্যে উত্তম যাহা, তাহা কিঞ্চিৎ শুনাও দেখি ।”

তখন প্রহ্লাদ উক্ত শ্লোকের কথাগুলি বলিয়াছিলেন ; এই
শ্লোকটির মর্ম এইরূপ—ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির
শ্রবণ, কীৰ্ত্তন ও স্মরণ, ভগবানেব পাদসেবন অর্থাৎ ধুব প্রীতির
সহিত সেবা, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সধ্য ও আশ্রনিবেদন—এই
নববিধা ভক্তি প্রথমতঃ ভগবানে সাক্ষাৎ অর্পিত হইয়া তাহার
পরে কোনও ব্যক্তিকর্তৃক যদি অমুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে
তাহাই উত্তম অধ্যয়ন। প্রহ্লাদের উক্তির তাৎপর্য এই যে—
সর্বোত্তম অধ্যয়নের বাহা ফল, এইরূপ শুভাভক্তির অমুষ্ঠান
যিনি করেন, ঐ অমুষ্ঠান দ্বারাই তিনি সেই ফল পাইতে
পারেন। যাহা হউক, আমাদের অমুসন্মত-কিন্তু ভক্তি-
অঙ্গ ; এই শ্লোকে শ্রবণ কীৰ্ত্তনাদি নয়টা অমুষ্ঠানের কথা
বলা হইয়াছে এবং এই নয়টা অঙ্গ কিরূপে অমুষ্ঠিত হইলে
ভক্তি-অঙ্গের অমুষ্ঠানরূপে পরিগণিত হইতে পারে, তাহাও
বলা হইয়াছে। এইগুলি যে কোনওরূপে অমুষ্ঠিত হইলেই যে
উত্তমা-ভক্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহা নয় ; অমুষ্ঠানের
পূর্বে যদি এই অঙ্গগুলি ভগবানে অর্পিত হয়, তারপরে
অমুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেই ভক্তি-অঙ্গের অমুষ্ঠানরূপে গণ্য
হইতে পারে। অর্পণেরও আবার একটা রকম আছে—
অর্পণ করিতে হইবে ‘অক্সা’—সাক্ষাৎরূপে, ফলরূপে বা
পরম্পরারূপে নহে। শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদির ফল অর্পণ না করিয়া
সাক্ষাৎ শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদিই ভগবানে অর্পণ করিতে হইবে।
ফল অর্পণ করিলে কর্ম্মজের অমুষ্ঠানের তুল্য হইয়া যাইবে,
ভক্তি-অঙ্গ হইবে না। তাৎপর্য এই :—“এ সমস্ত শ্রবণ-
কীৰ্ত্তনাদি ভগবানেরই নিমিত্ত, ভগবানেরই প্রীতির নিমিত্ত,
আমার ধর্ম্মার্থাদি লাভের নিমিত্ত নহে, আমার ইহকালের
বা পরকালের কোনওরূপ সুখের নিমিত্ত নহে”—এইরূপ
ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া যদি কেহ শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদি ভক্তি-
অঙ্গের অমুষ্ঠান করেন—কিন্তু আগে শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদি করিয়া
পরে সেই শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদির ফলমাত্র ভগবানে অর্পণ করার
কথা যদি তাঁহার মনেও না জাগে, তাহা হইলেই বলা যায়
যে, তিনি আগে তৎসমস্ত ভগবানে অর্পণ করিয়া পরে
তৎসমস্তের অমুষ্ঠান করিয়াছেন। শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদি ভগ-
বানেরই জিনিষ, যেহেতু তৎসমস্ত তাঁহার প্রীতির সাধন ;
তাঁহাবই জিনিসের দ্বারা তাঁহার সেবক আমি তাঁহার প্রীতি

সাধনের চেষ্টা করিতেছি—এরূপ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া শ্রবণ-কীর্তনাদির অমুষ্ঠান করিলেই সেই অমুষ্ঠান শুদ্ধা-ভক্তির অঙ্গ হয়। আহা! সকলেরই প্রয়োজন; আহা! আয়োজনও সকলেই করিয়া থাকে। কিন্তু ইহার মধ্যে দুই রকমের লোক আছে। এক—যাহারা নিজেদের জন্ত রান্নাদি করিয়া খাইতে বসিয়া ভগবানের নামে নিবেদন করে। আর—যাহারা রান্নাদিই করে ভগবানের জন্ত; ভগবানের জন্ত রাঁধিয়া সমস্তই ভগবানের ভোগে নিবেদন করিয়া পরে প্রসাদ গ্রহণ করে। (১) প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণের—আগে অমুষ্ঠান, পরে ভগবানে অর্পণ। শেষোক্ত ব্যক্তিগণের—আগে অর্পণ, পরে অমুষ্ঠান। ভগবানের জন্ত রান্না করে ভগবানেরই জিনিস; সুতরাং সমস্ত জিনিস পূর্বেই ভগবানে অর্পিত হইয়া গিয়াছে। রান্নাদির অমুষ্ঠান পরে। ভোগ নিবেদন—বস্তুতঃ সর্বপ্রথম অর্পণ নহে। “প্রভু, তোমারই জিনিস, তোমারই উদ্দেশ্যে তোমারই ভৃত্য রাঁধিয়া আনিয়াছে, কুপা করিয়া গ্রহণ কর”—ইহাই নিবেদনের তাৎপর্য; সুতরাং ইহা সর্বপ্রথম অর্পণ নহে; ইহা অর্পিত বস্তুর সংস্কারপূর্বক সমুৎক্ষেপ আনয়ন; ইহাও অমুষ্ঠানই, সমর্পণের পরবর্তী অমুষ্ঠান।

যাহা হউক, এই নববিধা ভক্তির সমস্ত অঙ্গের অমুষ্ঠানই যে অবশ্য কর্তব্য, তাহা নয়। উল্লিখিত শ্লোকের টীকার শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন—“তত্র নবলক্ষণে সমুচ্চয়ো নাবশ্যকঃ। একেনৈবাক্ষেন সাধ্যাব্যভিচারশ্রবণাৎ।” শ্রীমন্ মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—“এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ ॥” চৈঃ চঃ ২।২২। ৭৬ ॥ যাহার যেই অঙ্গে শ্রদ্ধা ও রুচি জন্মে, তিনি সেই অঙ্গের অমুষ্ঠান করিতে পারেন; একাধিক অঙ্গের অমুষ্ঠানও শাস্ত্রসম্মত। তবে যিনি যে অঙ্গেরই অমুষ্ঠান করুন না কেন, তাহার সঙ্গে যেন স্বীয়ভাবে অমুকুল ভগবৎ-স্মৃতি জড়িত থাকে; তাহা না হইলে—

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্তন।

তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥ বৈঃ বঃ ১।৮ ১৫

নববিধা ভক্তির মধ্যে আবার নামসংকীৰ্তনই শ্রেষ্ঠ। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

ভক্তনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—নববিধা ভক্তি।

কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥

তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সঙ্কীৰ্তন।

নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন ॥ চৈঃ চঃ ৩।৪।৬৫-৬

অতএবও তিনি বলিয়াছেন—

এক কৃষ্ণনাম করে সর্বপাপক্ষয়।

নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥

দীক্ষা পুরশ্চর্যাবিধি অপেক্ষা না করে।

জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সভারে উদ্ধারে ॥

আমুষ্ণ কলে করে সংসারের ক্ষয়।

চিত্ত আকর্ষণ করে কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥ চৈঃ চঃ ২।১৫।১০৮-১০

নামের মহিমা শ্লগ্বেদের বিকৃতভেদেও দৃষ্ট হয় :—

তমু স্তোতারঃ পূর্য্যং যথাবিদগ্ধতয়া

গর্তং জন্মযা পিপর্তন।

আস্য জ্ঞানস্তো নাম চিদ্বিবক্তন

মহন্তে বিষ্ণো স্মৃতিং ভক্ত্যমহে ॥ ১।২২।১৫৬।৩০

সায়নাচার্যকৃতব্যাক্য্যাসারে উক্ত মন্ত্রের তাৎপর্য এইরূপ—

হে স্তবকারিগণ, বিষ্ণু অনাদিসিদ্ধ, তাঁহা হইতেই যজ্ঞের অথবা জলের উৎপত্তি, তিনিই যজ্ঞরূপে অবস্থিত। কাহারও বর বা অমুগ্রহলাভাদির অপেক্ষায় নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া না থাকিয়া জন্মধারা আপনা হইতেই (অর্থাৎ জন্মহেতু যে জীবন লাভ করিয়াছে, সেই জীবনব্যাপী স্তোত্রাদিধারা নিঃসর চেষ্টাতেই) তোমরা সেই বিষ্ণুর প্রীতি বিধান কর—যাহাতে তোমরা তাঁহার মাহাত্ম্য অবগত হইতে পার। অধিকন্তু সেই সর্বাঙ্গী মহামুগ্ধবে বিষ্ণুর নাম চিৎ (তৎ-জড়, অপ্ৰাকৃত), সকলেরই নমনীয় (প্রণম্য) এবং সর্বপুরুষার্থপ্রদ ইহা অবগত হইয়া তোমরা সম্যকরূপে তাঁহার নাম কীর্তন কর। অথবা, সকলের স্বর্গাপবর্গসাধন যজ্ঞাদি, বা সেই যজ্ঞাদির উপকরণ,

(১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

“যৎ করোষি যদানসি যজ্ঞং হোষি নদাসি যৎ।

যত্তপস্তসি কোন্তেয় তৎকৃষ্ণং যদর্পণম্ ॥ ২।২৭

—হে কৌন্তেয়, তুমি যাহা কিছু কর্ম কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, এবং যাহা কিছু তপস্যা কর—তৎসমস্ত আমাতে অর্পণ কর। ভগবানের এই আদেশ পালন করিয়া যাহারা অনিবেদিত কিছু গ্রহণ করেন না, এম্বলে কেবল তাঁহাদের কথাই বলা হইয়াছে।

অথবা সেই যজ্ঞাদির অধিষ্ঠাতা দেবতা—এ সমস্ত সেই বিষ্ণুরই পরিণাম, ইহা সম্যকরূপে অবগত হইয়া তোমরা তাঁহার স্তব কর। হে বিষ্ণো, হে সর্বাংক-দেব, উত্তমরূপে বেন তোমার স্তুতি করিতে পারি, ইহাই প্রার্থনা করি।

উল্লিখিত ঋক্-মন্ত্রটীর দ্বিতীয়ার্ধের ব্যাখ্যা শ্রীজীব গোস্বামী তৎকৃত ভগবৎ-সন্দর্ভে এইরূপ করিয়াছেন— হে বিষ্ণো, তব নাম চিং—চিংস্বরূপঃ অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপম্ । তস্যা অস্য নাম আ ঈষৎ অপি জানন্তঃ নতু সম্যক্ উচ্চারমাংসাদি পুরস্কারেণ তথাপি বিবক্তন ক্রবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাস-মাত্রং কুর্যাণাঃ স্মৃতিং স্বধিষ্যাং বিদ্যাং ভজ্যমহে প্রাপুমঃ ॥— হে বিষ্ণো, তোমার নাম চিং (চৈতন্ত্যস্বরূপ) এবং সে জন্ত তাহা মহঃ (স্বয়ং-প্রকাশ) ; সেই হেতু সেই নামের ঈষৎ মহিমা জানিয়াও (উচ্চারণাদি ও মাহাত্ম্যাদি পূর্ণভাবে না জানিয়াও) নামের কেবল অক্ষরমাত্র উচ্চারণ করিলেও তোমাবিষয়ক বিদ্যা আমরা লাভ করিতে পারিব।

এইরূপে ঋগ্বেদ হইতে জানা গেল—ভগবানের নাম-কীর্তন সর্বপুরুষার্থক্ষির উপায়, নামকীর্তনের প্রভাবেই ভগবদ্বিষয়িনী বিজ্ঞা বা ভক্তি লাভ হইতে পারে। আরও জানা গেল—নাম চৈতন্ত্যস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, অপ্ৰাকৃত।

পরবর্তী শাস্ত্রেও বেদের এই কথাই পরিস্ফুটরূপে বিবৃত হইয়াছে :—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্ত্যরসবিগ্রহঃ ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নস্বাম্যনামিনোঃ ॥

—ভ, র, সি, ১।২।১০৮। গঙ্গাপুরাণবচন।

নাম ও নামীর ভেদ নাই বলিয়া ভগবানের নাম ভগবানেরই জ্ঞায় চৈতন্ত্যরসবিগ্রহ, সর্বশক্তিপূর্ণ, মায়াগন্ধশূদ্ধ (শুদ্ধ) নিত্যমুক্ত এবং চিন্তামণিবৎ সর্বাভীষ্টপ্রদ।

ভগবান্ চিং-স্বরূপ এবং স্বপ্রকাশ ; নাম ও চিং-স্বরূপ এবং স্বপ্রকাশ। তাই নাম ও নামীর অভেদ।

কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলা বৃন্দ।

কৃষ্ণের স্বরূপসম সব চিদানন্দ ॥ চৈঃ চঃ ২।১৭।১৩০

প্রাকৃত বস্তুব নামের জ্ঞায় ভগবান্নাম জড় অক্ষরের সমষ্টি মাত্র নহে ; নাম চিংস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, নাম একটা

মহাশক্তি। এই নামরূপ মহাশক্তি নামো ভগবান্কে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ।

অগ্নির দাহিকাশক্তির কথা না জানিয়াও তাহাতে হাত দিলেই যেমন হাত পুড়িয়া যায়, তদ্রূপ নামের মাহাত্ম্য সম্যক না জানিয়াও নামের অক্ষর মাত্র উচ্চারণ করিলেই পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে। যে হেতু অগ্নির দাহিকা শক্তির জ্বালা, পুরুষার্থ প্রদত্তও নামের স্বরূপগত ধর্ম্ম। ভগবানের নাম চৈতন্ত্যস্বরূপ বলিয়াই ইহা সম্ভব।

উপরে উদ্ধৃত ঋক্-মন্ত্রের ভাষ্যে সায়নাচার্য্য বলিয়াছেন— যজ্ঞাদি এবং যজ্ঞাদির উপকরণাদি সমস্তই ভগবানের পরিণাম ; ইহা হইতে জানা যায় শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধনাক্রমে ভগবানেরই পরিণাম। ভগবানের নাম কিন্তু তাঁহার পরিণামমাত্র নহে ; নাম ভগবানেরই এক স্বরূপ ; যে হেতু নাম চৈতন্ত্যস্বরূপ, স্বপ্রকাশ।

নামের এই সমস্ত স্বরূপগত অসাধারণত্ববশতঃই সাধনাক্রম-হিসাবে নামসকীর্তনের শ্রেষ্ঠত্ব।

বৃহস্পতীর পুরাণ কলিতে নামসকীর্তনের আবার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন :—

হরেন্নাম হরেন্নাম হরেন্নামৈব কেবলম্ ।

কণো নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরগ্যাথা ॥

* শ্রীমদ্ভাগবতও অল্পরূপে কথাই বলেন।

নামসকীর্তনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

* চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাঘান্নির্কাপণং

শ্রেয়স্কৈকরব চন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।

আনন্দাধুখিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণায়তান্বাদনং

সর্বাংগপ্রাপনং পরং বিজ্ঞতে শ্রীকৃষ্ণসকীর্তনম্ ॥

—যাহা চিন্তরূপ দর্পণকে মার্জিত করে (অর্থাৎ যাহা দ্বারা চিন্তের দুর্কাসনাসমূহ দূরীভূত হয়), যাহা সংসারতাপরূপ মহাদাবানলকে নির্কাপিত করে, যাহা মঙ্গলরূপ কৌমুদীকে জ্যোৎস্না-বিতরণ করে (অর্থাৎ যাহা সর্বপ্রকার মঙ্গলের উৎকর্ষ সাধন করে), যাহা বিজ্ঞরূপ বধূর প্রাণস্বরূপ (অর্থাৎ যাহা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান বা ভক্তি হৃদয়ে স্ফুরিত, বিকাশিত, এবং রক্ষিত হয়), যাহা আনন্দসমুদ্রে বর্দ্ধিত করে, যাহার প্রতি

পদেই পূর্ণামৃতের আশ্বাদন—সকল রসেরই আশ্বাদন পাওয়া যায় এবং যাহা সর্বাশ্বতৃষ্ণাজনক (অর্থাৎ মন-আদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃষ্ণাবিধায়ক)—সেই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন সর্বোৎকর্ষে জয়যুক্ত হউক।

এস্থলে “কৃষ্ণসঙ্কীর্তন” বলিতে যে কেবল “কৃষ্ণ” এই নামেরই কীর্তনের কথা বলা হইয়াছে, তাহা নয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ভূমারসস্বরূপবস্ত্র ভগবান্ সর্ষচিন্তাকর্ষক বলিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণ বলা হয়। যেই নামেই তাঁহাকে ডাকা হউক না কেন, তাহাতেই কৃষ্ণ বা আকর্ষক আছে; সুতরাং কৃষ্ণসঙ্কীর্তন বলিতে সর্ষচিন্তাকর্ষক ভগবানের যে কোনও নামের কীর্তনই সূচিত হইতেছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু একথা পরিস্ফুট করিয়াই অন্য এক শ্লোকে বলিয়াছেন :—

নামায়কারি বহুধা নিজসর্ষশক্তি-

স্তত্রোপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।

—ভগবান বহুপ্রকারে নিজ নাম প্রচার করিয়াছেন। সেই সমস্ত নামে আবার নিজের সমস্ত শক্তিও অর্পণ করিয়াছেন। সেই নামের স্মরণ বিষয়ে সময় সঙ্কীর্ণ কোনও নিয়মও নাই।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এইরূপে ইহার অলুবাদ করিয়াছেন :—

অনেক লোকের বাহ্য অনেক প্রকার।

কৃপাতে করিল বহু-নামের প্রচার ॥

ধাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।

কালদেশ-নিয়ম নাহি সর্ষসিদ্ধি হয় ॥

সর্ষশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ।

চৈঃ চৈঃ ৩২০।১৩-১৫

জগতে সকল লোকের বাসনা বা রুচি সমান নহে; এক একজন এক এক বিষয় কামনা করেন। ভগবানের একই নামে সকলের রুচিও হয় না—এক একজন এক এক নামে প্রীতি পান। তাই তাঁহাদের প্রতি কৃপা করিয়া পরমকরূপ ভগবান্ নিজের অনেক রকম নাম প্রকট করিয়াছেন—যেন যাহার যে নাম ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারেন। “এবংব্রতঃ স্প্রিয়নামকীর্ত্য” —ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতেও নিজের প্রিয় নাম কীর্তনের ইঙ্গিতই পাওয়া যায়।

নামসঙ্কীর্তনের অস্ত্রাচ্ছ সুবিধাব কথাও এস্থলে বলা হইয়াছে। যে কোনও লোক, যে কোনও সময়, যে কোনও অবস্থাতেই স্বীয় অভীষ্ট নাম কীর্তন করিতে পারেন। নাম গ্রহণের নিমিত্ত কোনও নিয়মের আদেশও ভগবান রাখেন নাই—ধাইতে বসিয়া শুইতে যাইয়া কি শুইয়া শুইয়াই, পবিত্র স্থানে হউক কিবা অপবিত্র স্থানেই হউক—যে কোনও স্থানেই হউক না কেন, কিবা যে কোনও সময়েই হউক না কেন—শ্রীভগবানের নাম কীর্তন করিলেই সর্ষাভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। ভক্তিমার্গের সাধারণ বিধানই এই যে—“সর্ষদেশ-কাল-পাত্র-দশাতে ব্যাপ্তি যার।” নামসঙ্কীর্তনে যে দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাবিধিরও অপেক্ষা নাই, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। নামীর ভায় নামও কোনও বিধি-নিষেধের অধীন নহেন; যেহেতু নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া উভয়েই স্বতন্ত্র।

যাহা হউক, ভক্তি-অঙ্গের অলুষ্ঠানে কষ্ট বিশেষ কিছু নাই; বিশেষতঃ নামসঙ্কীর্তনে কোনও অসুবিধাই নাই; অত্যন্ত সহজ। কিন্তু চিন্তে ভক্তির আবির্ভাব সহজ নয়; কারণ যে চিন্তে ইহকালের বা পরকালের সুখভোগের বাসনা, এমন কি মুক্তির বাসনা কিছুমাত্র থাকিবে, সেই চিন্তে ভক্তির আসন হইতে পারে না।

অলুষ্ঠান সহজ; কিন্তু অলুষ্ঠানের জন্য মনকে প্রস্তুত করা শক্ত। ভোগবাসনা ত্যাগ করা যায় না; এমনও হয়—কোনও ভোগবাসনা ত্যাগ করিতে চাহিলে প্রাণ ফাটিয়া যাওয়ার মত যেন দুঃখ হয়; কেহ ভোগবাসনা ত্যাগ করার উপদেশ দিলে তাঁর প্রতি মনটা বেশ অপ্রসন্ন হইয়া পড়ে। আপনা হইতে যে বাসনা একটু অপ্রসন্ন হইবে, তাহাও আশা করা যায় না। কোনও এক সাধক দুঃখ করিয়াই যেন বলিয়াছেন :—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা

পালিতা দুর্নিদেশা

স্তেবাং জাতা ময়ি ন করুণা

ন ত্রপা নোপশান্তিঃ ॥

—আমি কামাদির কত দুর্নিদেশ কত প্রকারেই না পালন করিলাম, তথাপি আমার প্রতি তাহাদের দয়া হইল

না; দয়া করিতে অসমর্থ হইয়া তাহারা লজ্জিত হইল না, তাহাদের দাসত্ব হইতে আমাকে অব্যাহতিও দিল না।

এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, এই ভাগ্যবান সাধক কামাদির দাসত্ব করিতে একেবারেই অনিচ্ছুক; অথচ তাহাদের দাসত্ব ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যাইতেও ভয় পায়েন, পাছে তাহারা আবার ধরিয়া আনিয়া দাসত্বেব কর্তোরতর নিগড় পরাইয়া দেয়। ইঠাৎ ভগবৎ কৃপায় যেন একটা সম্পূর্ণ নিরাপদ স্থানের সন্ধান পাইয়া তিনি প্রার্থনা জানাইলেন :—

উৎস্রজ্যেতান্ অথ যদুপতে

সাম্প্রতং লবুবুদ্ধিঃ

তামায়াতঃ শরণমভ্যসং

মাং নিযুক্ত্বাদ্যদাস্তে ॥

—হে যদুপতি এখন আমি তোমাব কৃপায় বৃত্তিতে পারিয়াছি; তোমার ঐ অভয় চরণই নিরাপদ আশ্রয়; তাই আমি সেই কামাদিকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার অভয় চরণে শরণ নিলাম, কামাদির দাসত্ব ছাড়াইয়া তুমি আমার তোমার নিজদাস্তে নিয়োজিত কর।

তখনই কোনও সাধক নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে পারিবেন, যখন সেই ভাগ্যবান সাধকের দ্বায় কামাদির ছর্গদেশ পালনে তাহার বিতৃষ্ণা জন্মিবে, যখন দেহ দৈহিক মুখের—ইহকালের ও পরকালের ভোগস্বথের বাসনাব

প্রতি জ্রুক্ষেপ না করিয়া তিনিও ভগবানের অভয় চরণে শরণ লইতে পারিবেন এবং প্রহ্লাদের ভাষায় অকপট চিত্তে বলিতে পারিবেন :—

—হে প্রভো, আমার কৰ্মফল অল্পসারে আমাকে সহস্র সহস্র যোনিতেই জন্মগ্রহণ করিতে হইবে; তাহা হইতে অব্যাহতি আমি চাইনা, আমার কৰ্মের ফল আমিই ভোগ করিব; কিন্তু প্রভো, দয়া করিয়া ইহা করিও—যখন যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, তোমার চরণে যেন অচ্যুতা ভক্তি থাকে; বিষয়ী লোকের বিষয়ে যেক্রপ অবিচ্ছিন্না আশক্তি থাকে, তোমাতেও সেরূপ অবিচ্ছিন্না রতি যেন আমার হৃদয়ে সর্বদা বর্তমান থাকে।

আরও যখন অকপট চিত্তে তিনি বলিতে পারিবেন :—

ন ধনং ন জনং ন সুলন্দরীং

কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে

ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী স্বয়ি ॥

ধন জন নাহি মাগো কবিতা-সুলন্দরী।

শুদ্ধ-ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি ॥

হে পরম কৃপালু,

কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম।

তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবক ॥ *

* গত মাঘোৎসব উপলক্ষে কুমিল্লা ব্রাহ্ম-মন্দিরে পঠিত।

ফুল-তুলসী

ফুল বলে ‘আমি বড়’, তুলসী বলে ‘আমি’।

“তুই-ই আমার সমান প্রিয়”—কহেন জগৎ-স্বামী ॥

“বড়-ছোট-ভেদ-বিচারে ঝগড়া করে যারা।

আমার প্রাণে দিয়েছে ব্যথা মিথ্যা ক’রে তারা ॥”

রূপ-সনাতন ও জীবী

(পূর্বানুসরণ)

(৭).

প্রভু প্রয়াগে দশদিন দশাশ্বমেধযাগে থাকিয়া শ্রীকৃপকে শক্তি-সঞ্চার করিয়া শিক্ষা দিলেন। এই শক্তি-সঞ্চার প্রক্রিয়াটি কি? ইহা অতি সহজ। সেটি কি? না—ভালবাসা। ভালবাসার মত প্রবল শক্তি ত্রিভুগতে আর নাই। ইহাতে পর আপন হইয়া যায়। ভালবাসার দোষ-দর্শন থাকে না। ভালবাসা দ্বারা মানুষকে—মানুষ কেন, পশুপক্ষী যাবতীয় জীবকে বিনামূল্যে জয় করা যায়। ভালবাসা দ্বারা যখন কাঙ্ক্ষাও আশ্রসাৎ করা হয়, তখন তাঁহার মধ্যে, যিনি ভালবাসেন তাঁহার ভাবসমূহ আপনা হইতে সঞ্চারিত হয়। শ্রীকৃপ ও সনাতনকে দিয়া প্রভুর পশ্চিম-ভারতবর্ষে তথা সমগ্র জগতকে জানাইতে হইবে যে, শ্রীভগবান্ প্রেমস্বরূপ, তিনি দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা নহেন বা পাপ-পুণ্যের বিচারক নহেন,—তিনি সকলকেই নির্বিচারে ভালবাসেন। রূপসনাতন ছিলেন ঘোর বিষয়ী, ব্রাহ্মণ হইয়া স্নেহাচার করিয়াছেন, লোকের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছেন; কিন্তু, তাই বলিয়া প্রভু তাঁহাদিগকে কর্মফল প্রাপ্তির প্রতীক্ষার রাখিয়া দিলেন না, অথবা পুনরায় সংকর্ষ করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইয়া প্রভুর কৃপা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য সময়ের অপেক্ষা করিতে বলিলেন না। প্রভু স্বয়ং রামকেলি গ্রামে যাইয়া তাঁহাদিগকে আশ্রসাৎ করিলেন।

কলিকাতা ওভারটুন হলে রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বক্তৃতা দিতে অনিয়াছি। তিনি বলিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ‘পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং’ আসিলেন, কিন্তু যীশু আসিয়া বলিলেন ‘whoever cometh unto me, I in nowise cast him out’ অর্থাৎ, যে-ই আমার কাছে আসুক না, আমি তাহাকে কিছুতেই পরিহার করি না। তিনি যদি শ্রীগৌরান্দের কথা জানিতেন যে,—জীবকে উদ্ধারের নিমিত্ত প্রভুর কাছে যাইতে হয় নাই, জীব ত চিরবহির্ভূত, সে

যাইতে পারিবেই বা কেন? বাওয়ার জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষাই বা হইবে কেন? তিনি যদি জানিতেন—শ্রীগৌরান্দের স্বয়ং জীবের দুয়ারে দুয়ারে যাইয়া ভালবাসা দ্বারা সকলকেই উদ্ধার বা আশ্রসাৎ করিয়াছেন, তাহা হইলে আর তাঁহার যীশুখ্রিষ্টের অলুপ্ত হইতে হইত না, শ্রীগৌরান্দের আত্মগত্যে প্রেমধর্ম বাঞ্ছন করিয়া জীবন ধস্ত করিতেন। তিনি যদি জানিতেন শ্রীগৌরান্দের প্রেমস্বরূপ, প্রেমময় এবং অদোষদর্শী, —তাহা হইলে আর তিনি কর্মফলবাদময় খ্রীষ্টীয় গ্রন্থের অনন্তকাল স্বর্গ বা অনন্তকাল নরকভোগের মতবাদ গ্রহণ করিতেন না, পঞ্চমপুরুষার্থ যে প্রেম তাহারই অন্তর্নিহন করিয়া জীবন মধুময় করিতেন, এবং তাঁহার মত ঋণিতুল্য ব্যক্তি দ্বারা পাশ্চাত্যদেশে বিস্তৃত প্রেমধর্ম বিস্তার লাভ করিত ও সেই দেশের লোক সুশীতল হইত।

মহাপ্রভু শ্রীকৃপকে আশ্রসাৎ করিয়া তাঁহাকে দিলেন কি? দিলেন তাঁহার প্রধান সম্পত্তি প্রেম—প্রেমই শ্রীভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। শ্রীকৃপের কাছে প্রভু চাহিলেন কি? চাহিলেন,—শ্রীকৃপ যেন এই সম্পত্তি নির্বিচারে জনে জনে বিতরণ করেন। শ্রীকৃপ সমৃদ্ধিশালী লোক ছিলেন। প্রভু মঠ বা আশ্রম স্থাপনের জন্য তাঁহার নিকট টাকা-কড়ি চাহিলেন না, বা বার্ষিক কিম্বা মাসিক গুরুদক্ষিণা বরাদ্দ করিয়া দিলেন না, অথবা তাঁহাকে ঋদ্ধিকপদবাচ্য করিয়া গ্রামে গ্রামে শিষ্য করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন না এবং ঐ শিষ্যের নিকট হইতে দক্ষিণা আদায় করিয়া উহার ভাগ তাঁহাকে পাঠাইয়া দেওয়ার জন্য আদেশ দিলেন না। মহাপ্রভু দিলেন প্রেম, পাইলেন প্রেম। নিজেও ইহা বিতরণ করিলেন, ভক্তগণকে দিয়াও বিতরণ করাইলেন। ইহাই হইল প্রভুর শক্তিসঞ্চার। এইরূপ তিনি এক একটা ভক্তকে একটা জীবন্ত মঠ করিলেন, উহা অত্যাধি বর্তমান এবং চিৎকাল উহার অস্তিত্ব থাকিবে।

প্রভু শ্রীকৃপকে বলিতেছেন—“রূপ! ভক্তিরসামৃতসিদ্ধ

পারাবার শূন্য, গভীর ; অতলস্পর্শী । তোমাকে চাখাইতে
তাহার এক বিন্দু কহিতেছি ।”

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃপাকে বাহা কহিয়াছেন, তাহাই কৃষ্ণদাস
কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে মধ্যখণ্ডে
উনবিংশ পরিচ্ছেদে মদনমোহনের আজ্ঞায় লিপিবদ্ধ
করিয়াছেন । প্রভু এই যে ভক্তিরসামৃতসিদ্ধির কথা শ্রীকৃপাকে
কহিলেন, ইহার পর কৃষ্ণলীলামৃতের কথাই বলিয়াছেন ।
রসিকভক্ত কবিরাজ গোস্বামীর রসবিচার ও তাঁহার রসাস্বাদন
বড়ই অপূর্ণ । এই কথা বর্ণনা করার বহুপূর্বে আদিখণ্ডে
দ্বাদশ পরিচ্ছেদের শেষভাগে তিনি বলিয়া রাখিয়াছেন—

গৌরলীলামৃতসিদ্ধু অপার অগাধ ।

কে করিতে পারে তাহা অবগাহ-সাধ ॥

তাহার মাধুরীগন্ধে লুপ্ত হয় মন ।

অতএব তটে রহি’ চাখি এক কণ ॥

এই কথা কবিরাজ গোস্বামী লিখিলেন বটে, কিন্তু
লেখাইলেন মদনমোহন । গোস্বামীপাদ নিজেই বলিয়াছেন—

এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন ।

আমার লিখন যেন শূন্যের পঠন ॥

সুতরাং উপরি উক্ত ঐ পরারের অর্থ এই পাড়ায় যে,
মদনমোহন গৌরলীলামৃতসিদ্ধুর এক কথা নিজে চাখিয়া—
কবিরাজ-গোস্বামীকে দিয়া চাখাইতেছেন এবং জীবগণের
চাখিবার জন্য উহা গ্রন্থকার দ্বারা রাখিয়া দিতেছেন, আর
এদিকে শ্রীগোবিন্দ কৃষ্ণলীলামৃতসিদ্ধুর এক বিন্দু নিজে
চাখিয়া, শ্রীকৃপাকে দিয়া চাখাইতেছেন ও তাহা জীবের জন্য
রাখিয়া দিতেছেন । এখানে দেখা যায়, গৌর যে হিসাবে
কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণ সেই হিসাবে গৌরভক্ত । আর বস্তুতঃ তিনি
নিজে নিজের রস আশ্বাদন না করিলে অপরে পাইবে
কিরাপে ? তাই কৃষ্ণ গৌরলীলা আশ্বাদন করিলেন, গোব
কৃষ্ণলীলা আশ্বাদন করিলেন,—ইহাই কবিরাজ গোস্বামীর
বক্তব্য । সাধে কি ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন—

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভক্ততম্য

বিহো কৈল চৈতন্যচরিত ।

গৌরগোবিন্দ-লীলা শুনিতে গলয়ে শীলা

তাহাতে না হৈল মোর চিত ॥

গৌর ও গৌরিন্দলীলা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যুগপৎ আশ্বাদ্য ।

আর একটি কথা বড়ই রসাত্মক । শ্রীকৃষ্ণ ও
শ্রীগোবিন্দের প্রত্যেকেরই লীলা দুইভাগে বিভক্ত—আদি
ও অন্ত্য । শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা ব্রজধামে, শ্রীগোবিন্দের
আদিলীলা নবদ্বীপধামে । শ্রীকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা ব্রজের
বাহিবে, শ্রীগোবিন্দের অন্ত্যলীলা নবদ্বীপেব বাহিবে ।
শ্রীগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা, অর্থাৎ শ্রীরাধার কৃষ্ণবিরহ-
লীলা হইতে ব্রজমাধুরী বিকাশ করিলেন ও রাধাকৃষ্ণযুগল
মিলনের নিত্যতা স্থাপন করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগোবিন্দের
অন্ত্যলীলা, অর্থাৎ, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াব গৌরবিরহলীলা হইতে
নদীরামাধুরী বিকাশ করিলেন ও নিত্য গৌরবিষ্ণুপ্রিয়াযুগল-
মিলন স্থাপন করিলেন । বিশেষ অন্তর্নিবিষ্টচিত্তে যিনিই
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তিনিই ইহা স্বীকার
করবেন ।* এইজন্যই শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের প্রভুর
শেষলীলা শুনিবার আকাঙ্ক্ষা এবং তাহা লিখিবার জন্য
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকে বৈষ্ণবগণের আদেশ ও
স্বয়ং মদনমোহনের আজ্ঞা-মালা প্রদান ।

ঐ যে দ্বাদশ পরিচ্ছেদোক্ত গৌরলীলামৃতসিদ্ধুর কথা
বলা হইল, কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামীর উহা আগেই লিখিয়া
রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে, গৌরলীলামৃতসিদ্ধুর কথা আশ্বাদন
না করিতে পারিলে কৃষ্ণলীলামৃতসিদ্ধুর বিন্দু আশ্বাদন করা
অসম্ভব । সুতরাং উভয় লীলাই যুগপৎ আশ্বাদ্য ।
কৃষ্ণলীলামৃতরসাস্বাদনে যেমন শ্রীরাধাকে বাদ দেওয়া যায়
না, গৌরলীলামৃতসিদ্ধুর কথা আশ্বাদনেও তদ্রূপ শ্রীবিষ্ণু-
প্রিয়াকে বাদ দেওয়া যায় না, তাহা হইলে অর্ধকুক্কটীবৎ
সকল পণ্ড হইয়া যায় । শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের গৌর-
গোবিন্দলীলা বলিতেও গোবিন্দলীলায় যেমন রাধাগোবিন্দ-
লীলা বুঝায়, গৌরলীলা বলিতেও তেমন গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ালীলা
বুঝায় । লোকে রাম অবতার বৃষ্ণ অবতার বলে, সীতারাম
অবতার বা রাধাকৃষ্ণ অবতার বলে না । সীতা ও
রাধা তত্ত্বলীলার কেন্দ্র । গোবলীলায়ও তদ্রূপ—শ্রীবিষ্ণু-
প্রিয়া গোবলীলার কেন্দ্র ।

শ্রীকৃপা-শিক্ষা বড়ই কঠিন । ইহাতে প্রবেশ করিতে
অনেকেই ভয় পাবেন । কিন্তু, শ্রীগোবিন্দ কৃপাময়, পতিত-

* শ্রীশ্রীমা-দাদা কার্যালয় হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের শ্রীগৌরভজ্ঞানামুগা টীকায় কথঞ্চিৎ দেখান হইয়াছে ।

পাবন, প্রেমময়, অদোষদর্শী, এই সত্য মনে রাখিলে, অর্থাৎ, গৌরভজন করিলে আর ভয় থাকে না।

প্রভু তারপর শ্রীরূপকে বলিলেন, ‘ব্রহ্মাণ্ডস্থ অনন্ত জীবগণ চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করে।’

বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায় :—

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ ।

কুমারো রুদ্রসংখ্যাকাঃ পশুণঃ দশলক্ষকম্ ॥

ত্রিংশলক্ষাণি পশবশ্চতুল্লক্ষাণি মামুখাঃ ।

অর্থাৎ, জলজ যোনিতে নয়লক্ষবার, স্থাবর (বৃক্ষলতাদি) যোনিতে বিশ লক্ষ বার, কুর্গিযোনিতে এগারলক্ষবার, পক্ষী জন্মে দশ লক্ষ বার, পশু জন্মে ত্রিশ লক্ষবার, মামুখযোনিতে চারিলক্ষ বার, (৯+২০+১১+১০+৩০+৪=৮৪) চৌরাশীলক্ষ যোনিতে জীব ভ্রমণ করে।

কর্মফলবাদীরা ব্যাখ্যা করেন যে কর্মফল অনুসারে এইরূপ জন্মজন্মান্তর হয়, এমন কি, মামুখও নিম্নযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে পারে। এ ত বড় ভয়েরই কথা। কিন্তু, প্রভু এখানে কর্মফলের কথা কহিলেন না। তিনি

পূর্বেই বলিয়াছেন, “বিশ্ব-প্রেমে ভরপুর করিবার জন্যই আমি বিশ্বস্তর নাম ধারণ করিয়াছি।” শ্রুতিতেও শ্রীভগবানের ‘বিশ্বস্তর’ নাম পাওয়া যায়, তাহা কেবল এই অবতারেই প্রকাশ—আর কোন অবতার বিশ্বস্তর বলিয়া আখ্যাত নহেন। এই বিশ্বস্তর নামের অর্থ প্রভু স্বয়ং বলিলেন ও কার্যতঃও দেখাইলেন। আবার বাসুদেব দত্ত সকলের পাপ নিজের স্বক্ষে লইয়া অনন্তকোটি জীবের উদ্ধার শ্রীপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রভু বলিয়াছিলেন, জীব উদ্ধার হইবে, বাসুদেবের পাপভোগ বা নিরয়গমন করিতে হইবে না। প্রভুর লীলায় এইরূপ শত সহস্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন প্রভু, তেমনই তাঁহার পার্শ্বদগণ; নিত্যানন্দ অদ্বৈতের ত কথাই নাই। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ত জীবের হিত কামনায়ই বিরহ বরণ করিয়া লইলেন। সুতরাং গৌরভজনে কর্মফলবিচার, বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ এ সব প্রশ্নই উঠিবার অবকাশ নাই। তাই বলিতেছিলাম, গৌরবস্তুটির সহিত পরিচয় হইলে রূপ শিক্ষার কাঠিন্দ আর মামুখকে ভীত সজ্জ করিতে পারে না।

ক্রমশঃ

অন্ন-সমস্যা

তিনবার নাওয়া একবার খাওয়া বিষ্ণুর আদেশ হল,
একবার নাইতে তিনবার খেতে গরুড় বলে গেল
পেটের জ্বালায় রোগের জ্বালায় তাইত হাহাকার
বিষ্ণুর আদেশ পালন করা উচিত প্রতীকার।

শ্রীল রসিক বিদ্যভূষণের “আত্ম-নিবেদন”

(পূর্বাহ্নসরণ)

ডাঃ সরসিলাল সরকার

তিনি একটা রাজদ্রোহ মামলার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :—এই মোকদ্দমায় যে ১৯০টা আসামীকে উপস্থাপিত করা হইয়াছিল তাহাদের প্রত্যেকের হৃদয় স্বার্থশূন্য ছিল। উহাদের হৃদয়ে স্বার্থেব গন্ধমাত্রাও ছিল না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছেন, অতর্কিত অদৃশ্যভাবে ঠিক সেই উপদেশেই যেন ইহাদের জীবন গঠিত হইয়াছিল।

অনান্দিত কর্মফলঃ কার্যং কর্ম করোতিয়ঃ।

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরশ্বির্গ চাক্রিয়।”

“আত্মনিবেদন” গ্রন্থে এই দেশসেবকগণকে “কর্মযোগী সন্ন্যাসী” “মহাত্মাগী” ও “মহাযোগী” প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যদিও ইহারা ভগবান মানেন না, কিন্তু তাহাতে যে তাঁহাদের সাধনাব কিছু দোষ স্পর্শ করে নাই, যেন ইহাই বুঝাইবার জন্ত বিদ্যভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থের মলাটের উপর মুণ্ডক উপনিষদের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে—“ভগবান” প্রভৃতি নাম ও উপাশ্রয়ের কোন একটা রূপ কল্পনা করিয়া সাধনা করিলেই যে যথার্থ সাধনা হয়, তাহা নয়। অসীম সমুদ্রে যেমন নানা নদী নানা পথে গিয়া নামরূপের অতীতে মিশ্রিত হয়, সেইরূপ বিদ্বান নামরূপ বিমুক্ত হইয়া সেই পরাৎপর পুরুষে মিলিত হয়। রাবিরার দেশসেবকগণের জীবনী যেভাবে “আত্মনিবেদন” গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, সে বর্ণনা যে উচ্ছ্বাসময় ইহাতে সন্দেহ নাই। মনস্তত্ত্বের সত্যে এইরূপ উচ্ছ্বাসের মূলে বিশেষ একটা কারণ বর্তমান থাকে। সোফিয়ার পেরোভস্কিয়ার জীবনী বর্ণনায় এই উচ্ছ্বাস যেন পূর্বনাত্ম্য প্রকটও হইয়াছে। মহাপুরুষের পক্ষে সোফিয়ার রূপের সম্বন্ধে যে ভাবে বর্ণনা আছে তাহা বৈষ্ণব-সাধকগণকে শ্রীমতী রাধার রূপ বর্ণনাই স্মরণ করাইয়া দেয়। দেশেব জন্ত দেশপ্রাণা সোফিয়ার সর্বত্যাগ যে শ্রীকৃষ্ণপ্রাণা রাধিকার কুল, মান, ঘৃণা, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি যাহা কিছু সমস্ত শ্রীকৃষ্ণ

চরণে নিবেদনের অম্লরূপ—ইহাই যেন গ্রন্থকারের হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছে। কিশোরী সোফিয়ার ভিতরে যেন তিনি সেই ব্রজ-কিশোরীরই দর্শন পাইয়াছেন। সোফিয়ার সম্বন্ধে গ্রন্থকারের উক্তিগুলি যদি তাহারই ভাষায় তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হইত তাহা হইলে আমরা তাঁহার সেই উদ্দীপনা-ময়ী অপূর্ব অম্লভূতি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা তুলিয়া দিয়া এই সর্বত্যাগিনী দেশসেবিকার সম্বন্ধে তাঁহার বাহা অভিমত তাহা পাঠকদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম। বৈষ্ণবধর্মে “দুস্ত্যজ আর্ধ্যপথ” বলিয়া যে একটি কথা আছে তাহার, ভাবার্থ লোকান্তরমোদিত পন্থা, অর্থাৎ যে পথে অখ্যাতির ভয় নাই বরং খ্যাতি লাভেরই সম্ভাবনা আছে। অনেক কিছু ত্যাগ করিয়াও লোকে প্রতিষ্ঠার মোহ ত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু বৈষ্ণব-সাধনায় এই প্রতিষ্ঠার মোহ ত্যাগ করাই সর্বপ্রধান কথা। কুলগোরব, ধনগোরব, পদ-মর্যাদা ও সাধুস্বের খ্যাতি—এই সমস্ত ত্যাগ করিয়া অখ্যাতিতে শিরোভূষণ করা যে কত কঠিন তাহা একটু ভাবিলেই বুঝা যায়। শ্রীমতী রাধিকা রাজনন্দিনী, সোফিয়াও অতি সম্ভ্রান্তবংশের কন্যা। সোফিয়ার পিতা সেন্ট-পিটার্স-বর্গের গভর্নর-জেনারেল ছিলেন। কিন্তু আভিজাত্যের গোরব ও ধনীকন্টার বিলাসময় জীবনযাত্রা তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। তিনি এ সমস্ত ত্যাগ করিয়া সেই পথে যাত্রা করিলেন, যে পথে অগোরব ও দারুণ দুঃখ সহ্য করিতে হইবে। শ্রীমতী রাধিকাও বলিয়াছিলেন “প্রেম কবে বন্ধুহার সনে, আমার কিরিতে হবে বনে বনে, ভুজঙ্গ কটক পঙ্ক মাঝে।”

আর আমরা বিদ্যভূষণ মহাশয়ের জীবনেও দেখিতে পাই— তিনি অতি সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত ও শাস্ত্রবংশের সন্তান হইয়াও বংশগরিমা তুচ্ছ করিয়া দীনাতিদীন বৈষ্ণব-সাধকরূপে জীবন-পাত করিয়াই নিজের জীবনকে চরিতার্থ ভাবিয়াছিলেন। রাবিরার বৈপ্লবিকগণের জীবন সম্বন্ধে বিদ্যভূষণ মহাশয়

বলিয়াছেন, “তাহাদের ইতিহাস—এক বিশাল আগ্নেয়গিরির ইতিহাস,” (১৭৩ পৃষ্ঠা) তাহাদের সহিত আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃবর্গের সম্বন্ধে তুলনা করিয়া বিভাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন—“রাজদ্রোহের বড়স্বাক্ষরকারীদের যে বিপুল শ্রম ও চিন্তা করিতে হয়, ভারতবাসী রাজনীতিক নেতারা স্বপ্নেও সেক্ষম শ্রম ও চিন্তা করিতে পারিবেন না। কোমল কুসুম শয্যায় শয়ান থাকিয়া, তাকিয়ায় চৈস দিয়া আলবোলার নলে চোঁট সংযোগ করিয়া তাম্রকুটের ধূস পান করিতে করিতে এবং আকাশ-কুসুমের তন্ত্রা দেখিতে দেখিতে কেহ কখনও দেশের দুঃবস্থা দূর করিতে পারে না।” রাসিয়ার বিপ্লবী দেশসেবকগণের জীবন যে কত কঠোর তপস্ক্রময় “আত্মনিবেদন” গ্রন্থে আমরা তাহার আভাস পাই। সোফিয়া একদিকে মেহম্মদী পরদুঃখে দ্রবীভূত-হৃদয়া সরলা বালিকার ছায় কোমলপ্রাণা। আবার অপর দিকে তিনি বজ্রের ছায় দৃঢ় ও মহাশক্তিময়ী। গ্রন্থকার তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—“সোফিয়ার হৃদয় কুসুম-সুকুমার ছিল, কুসুমের ছায়ই তাহার সেই কুসুম-কোমল দেহে ও কুসুম-কোমল হৃদয়ে লোহের ছায় দৃঢ়তা ও সিংহের ছায় ভীষণ পরাক্রম লুক্কায়িত থাকিত, প্রয়োজন হইলেই তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িত। দানব-যুদ্ধে ভগবতী দেবীর ছায় নিরস্তর দুর্দমনীয় প্রোদ্যমে তিনি কাঁধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। তিনি দশটি মুনীর ছায় দেশের চরণে নিজের দেহ, মন, প্রাণ—এমন কি নিজের আত্মা পর্যন্ত নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন। দেশহিত যজ্ঞের পবিত্র হোমানল কি প্রকারে নিরস্তর প্রজ্জ্বলিত রাখিতে হয় তাহা তিনি ভালরূপেই জানিতেন। তিনি সাম্রিক ব্রাহ্মণের ছায় এই রাষ্ট্রবিপ্লব যজ্ঞে দীক্ষিতা ছিলেন। তিনি কেবল কর্তব্যকর্ম মনে করিয়া উঠা করিতেন না, উঠাতে তাহার হৃদয়নিহিত অতুরাগময়ী সেবা নিষ্ঠা নিরস্তর নিমুক্ত ছিল।” (আত্মনিবেদন ১৭ পৃ) সোফিয়া এই আত্মত্যাগের মহাশক্তির প্রেরণা কোথা হইতে লাভ করিলেন? গ্রন্থকার সে সম্বন্ধে বলিতেছেন যে—ভাবে বিভাবিত করিয়া স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রিয়সখা অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে জ্ঞাতি ও আত্মীয় স্বজনদের বধ-

সাধনার্থ উত্তেজিত ও উদ্বীণ করিয়াছিলেন এ ক্ষেত্রেও যে সেই চক্রীর নীরব-প্রেরণা ও নীরব-শক্তিসংকারণ ছিল না—তাহা বলা যায় না। তাহার বিধান-রহস্য মানববুদ্ধির অগম্য। সোফিয়ার শক্তিসাধন অমাহুষিক ও অলৌকিক—তাই মনে হয়, উহা বুঝি চক্রধর পার্থ-সারথিরই প্রয়োজনীয় প্ররোচনা ও নিগূঢ় প্রেরণা।” (আত্মনিবেদন ১৮১ পৃষ্ঠা)

জগতে অপার্থিব ও আশ্চর্য ব্যাপার কখনও কখনও বাটতে দেখা যায়। অষ্টাদশবর্ষীয়া কুমারী জ্যোত্স্না অব্ আর্ক দিব্যদর্শন পাইয়া অদ্ভুতশক্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই শক্তিবলে তিনি নিমজ্জমান ত্রাশ-তরণীর কর্ণধারত্ব গ্রহণ করিয়া দেশের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন—ইহা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। খৃষ্টান সাধুগণের এবং আমাদের দেশের সাধকগণের এইরূপ দিব্যদর্শনের বহু কাহিনী আমরা শুনিয়াছি। এই আত্মনিবেদন গ্রন্থেও একস্থানে শ্রীকৃষ্ণ-সাধিকার দিব্যদর্শন লাভের বিষয় লিখিত হইয়াছে। এই সকল দিব্যদর্শনের ভিতর মনস্তত্ত্বের একটি বিশেষ ক্রিয়া নিহিত আছে। এই দিব্যদর্শন অনেক সময় জীবনের সত্যকে একেবারে পরিবর্তিত করিয়া দেয়। দারুণ উদ্যোগ পথগামী পলের জীবন একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গেল এবং তিনি সাধু-পল হইলেন,—ইহার ভিতরেও দিব্যদর্শনের প্রভাব ছিল বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের আলোচনার মধ্যে জ্যোতিঃদর্শন, ইষ্টমুর্ত্তি দর্শন প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ আছে। উইলিয়াম জেমস্ লিখিত ভেরাইটিস অব্ রিলিজিয়াস এক্সপিরিয়ান্স (Varieties of Religious experience) নামক বিখ্যাত পুস্তক হইতে এইরূপ একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি—(পৃ ২২০—২২৬)। অ্যালফনসো রটিসবরন (Alphonso Ratisborne) একজন ইহুদী। তাহার বড় ভাই ক্যাথলিক খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, একজন অ্যালফনসো ভ্রাতার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। নিজের ধর্মও তাহার বিশ্বাস ছিল না। উনত্রিশ বৎসর বয়সে রোম নগরে আসিয়া একজন দ্বারসী ভদ্রলোকের সহিত তাহার পরিচয় হয়। এই ব্যক্তি ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি অ্যালফনসোর মনেও ধর্মভাব জাগ্রত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে

লাগিলেন। তিনি পদকে অঙ্কিত যীশু-জননীর একটি মূর্তি আলফনসোকে উপহার দিলেন। এইরূপ মূর্তি ধার্মিকদের নিকট অতি পবিত্র পূজার বস্তুরূপে পরিগণিত হইত। কিন্তু আলফনসো যেন উপহাসের ভাবেই মূর্তি সম্বলিত পদকটি গ্রহণ করিলেন,—এবং হাসিয়া বলিলেন, “বেশ, আপনার প্রদত্ত এই পদক আমি গলায় ঝুলাইয়া রাখিব।” এই পদকের সঙ্গে ফরাসী ভদ্রলোক আলফনসোকে একটি ছোট পুস্তিকাও দিয়াছিলেন। এই পুস্তিকায় কুমারী দেবীর উপাসনার কয়েকটি স্তোত্র ও মন্ত্র লিখিত ছিল। আলফনসো নিজের সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে যদিও তিনি হাসি-ঠাট্টার ভাবেই এই পদক গ্রহণ করিয়া গলায় পরিয়াছিলেন, কিন্তু উপাসনার মন্ত্রগুলি যেন তাঁহার মধ্যে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া গেল, তিনি হাসিয়া উড়াইতে চাহিলেও মন্ত্রের উক্তিগুলি মন হইতে দূর করিতে পারিলেন না। ইহার পর তাহার জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটিল বাহাতে তাহার জীবনের ধারা একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গেল। এই ঘটনার পূর্বরাত্রে তিনি একটি কালরংয়ের ক্রুশ স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, ঐ ক্রুশে যীশুখৃষ্টের মূর্তি ছিল না। স্বপ্নে যেন তাহার মুখচাপার মত হইয়াছিল এবং তিনি জাগিয়া উঠিয়াছিলেন। পরদিন দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তিনি প্রতিদিনের মতই স্বচ্ছন্দ মনে ছিলেন, কোন ভাবনার লেশ মাত্রও তাঁহার মনে ছিল না। ইহার পরের ঘটনাটি সম্বন্ধে আলফনসো তাঁহার বন্ধুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, জেমস্ এ পত্রে বর্ণিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা অতি সংক্ষেপে সেই পত্রাংশের ভাবার্থ এখানে দিলাম। আলফনসো লিখিয়াছেন,—“ঐ দিন যদি কেহ আমাকে বলিত আলফনসো আর কিছুক্ষণ পরেই যীশুকে তুমি তোমার ঈশ্বর এবং ত্রাণকর্তা বলিয়া উপাসনা করিবে, কিছুক্ষণ পরেই একটি দরিত্রের ভজনালয়ে (মেথডিস্ট চার্চ) গিয়া মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িবে এবং একজন ধর্মব্রাজকের পদতলে পড়িয়া বুক চাপড়াইবে। তোমার জাঁক-জমক, সুখবিলাস তোমার পরিবারবর্গের ভালবাসা, আত্মীয় বন্ধুদের নিকট প্রাপ্য শ্রদ্ধা সম্মান, তোমার সকল ধনসম্পদ ও সর্বস্ব, ইহুদী জাতির প্রতি তোমার আকর্ষণ,—এমন কি যদি প্রয়োজন হয় তাহা

হইলে যাহার সহিত তোমার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে সেই প্রণয়িনীকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবে। যীশুখৃষ্টকে ভক্তি করা ও তাঁহার অনুবর্তী হইয়া এবং মরণকাল পর্য্যন্ত তাঁহার জন্ত ক্রশ বহন করা,—ইহা ভিন্ন তোমার জীবনে আর কোন উদ্দেশ্য থাকিবে না। এইরূপ ঘটনা যে আমার পক্ষে সম্ভব একথা যে ভাবিতে পারে তাহাকে আমি বন্ধু পাগল অপেক্ষাও নির্দোষ মনে করিতাম। কিন্তু বর্তমানে এই নির্দোষত্বই আমার পক্ষে একমাত্র জ্ঞান ও সুখ।

“দ্বিপ্রহবে যখন আমি ভোজনালয় হইতে আহার শেষ করিয়া বাহিরে আসিয়াছি তখন সেই ফরাসী ভদ্রলোক গাড়ী করিয়া আসিতে ছিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া গাড়ী থামাইয়া আমাকেও গাড়ীতে উঠিয়া তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতে যাইবার জন্ত আহ্বান করিলেন। এন্ড্রিয়া নামে একটি গির্জার কাছে গাড়ী পৌছিলে তিনি গাড়ী থামাইয়া বলিলেন,—‘এখানে আমার একটু কাজ আছে।’

তিনি গাড়ী হইতে নামিলে আমিও গাড়ীতে বসিয়া না থাকিয়া তাঁহার সঙ্গে গির্জায় প্রবেশ করিলাম। এই গির্জাটি একটি দীনদরিদ্রগণের ধর্মশালা। মনোবোগ আকর্ষণ করিবার যত তাহার ভিতর কিছুই নাই। আমার মনে কোন বিশেষ চিন্তাও ছিল না। কিন্তু হঠাৎ কি যে হইল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। একটি কাল রঙের কুকুর বেড়াইতেছিল দেখিয়াছিলাম। এই কথাটি মাত্র মনে পড়ে,—কুকুরটি যেন অদৃশ্য হইয়া গেল, গির্জাও যেন আমার চোখের সম্মুখ হইতে লুপ্ত হইয়া গেল, আমি আর কিছুই দেখিতে পাইতেছিলাম না। * * * * *

সত্য কথা বলিতে গেলে আমি কেবল একটিমাত্র বস্তুই দেখিতেছিলাম, কিন্তু হে ভগবান, আমি কেমন করিয়া আমার সেই দর্শনীয় বস্তুর বিষয় বলিতে পারি। কথা দিয়া তাহা ব্যক্ত করা যায় না। বর্ণনা—তাহা যতই উচ্চস্তরের হউক না কেন এই অব্যক্ত সত্যকে প্রকাশ করিতে পারিবে না।

“আমি মাটিতে লুটাইয়া পড়িলাম, আমার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গিয়াছে। আমার মন যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। আমি মুচ্ছিত হইয়া পড়িলাম। ভদ্রমহোদয় আমার

সংজ্ঞা কিরাইয়া আনিলেন। তাঁহার প্রশ্নের আমি কোন উত্তরই দিতে পারিলাম না, শেষে আমার বুকে যে ভারজিন (virgin) মূর্তি অঙ্কিত পদক বুলিতেছিল তাহাই টানিয়া বাহির করিলাম। এই মূর্তি হইতে কি আশা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। আহা, তুমিই! (অর্থাৎ এই ভাবে বীণা জননী কুমারী মেরী তাঁহাকে দিব্যমূর্তিতে দর্শন দিয়াছিলেন) এবং এই দর্শনই তাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হইয়া গেল।

মনের কোন গভীর স্তরে এই সকল দর্শনের মূল রহস্য সংগৃহ্য থাকে তাহা আমরা জানি না। কিন্তু দেখিতে পাই এই দর্শনের ভিতর দিয়া যেন একটি বিশেষ শক্তি সঞ্চারিত হয়। অনেক জটিল সমস্যা ইহার ভিতর দিয়াই সমাধান হইয়া যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বিমূঢ় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ বাণীতেও যখন প্রবুদ্ধ হইতে পারিতেছিলেন না, কেবল এই কথাটিই বার বার তাঁহার মনকে আহত করিতেছিল, “এই যে অতিপুণ্য পিতামহ ভীষ্ম, আর এই যে আমার পুজনীয় অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, যিনি সন্তানের জ্ঞান আমাদের অন্ধশিক্ষা দিয়াছেন কি করিয়া আমি ইহাদের উপর শরাঘাত করিব?” তখন সেই মহারণক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ রূপে দর্শন দিয়া তাঁহার মনের সহস্র দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূর করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মনকে ব্যক্তিগত ভাবের দুর্বলতা হইতে বিশ্বজনীন অমুভূতিতে শক্তিশালী করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই সকল দিব্যদর্শনের প্রভাব যখন আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বজগতের ভিতর দিয়া জগদ্ব্যবস্থার সাধনায় আত্মসমর্পণ করিবার সাহসও আকাঙ্ক্ষা উদ্বেগিত করে তখনই যে সে দর্শন সার্থকতা লাভ করে ইহাতে সন্দেহ নাই। আর যখন আমাদের সাধনা ব্যক্তিগত অমুভূতির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, যখন আমাদের ধর্মভাব কেবল ব্যক্তিগত চিন্তাবিনোদনজনিত ভাববিলাস অথবা নিজের একটা আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির উপায়স্বরূপ হয় তখন সে ধর্মভাবকে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মানসিক দুর্বলতা বলিয়া যদি অভিহিত করা হয় তাহাও অযথার্থ হয় না। “আত্মনিবেদন” গ্রন্থে আমরা গ্রন্থকারের গীতা ব্যাখ্যার ভিতর একটি কথা পাইয়াছি, “চক্রবর্তী শ্রীনারায়ণের সবিশেষ উপদেশে এবং শাসনে অর্জুনের হৃদয় হইতে তখন সেই ধর্মতীক্ষ্ণতা অপনোদিত হইয়াছিল।” বস্তুতঃ প্রকৃত ধর্মতীক্ষ্ণতা ধর্মভাবের ভিতর তীক্ষ্ণতা বা দুর্বলতা স্থান পাইতে পারে না। অলস স্বপ্নরচনার ভিতর দিয়া প্রকৃত ধর্মভাব কখনও বিকাশ হয় না।

সেইজন্য এই দর্শনাদিরও বিভিন্ন স্তর আছে। মানুষের ধর্মভাব বাহিরের জিনিষ নয়, তাহা তাহার অন্তরতম অমুভূতি। এই অমুভূতি কোন্ সাধক যে কিভাবে লাভ করেন তাহা জানি না। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সক্রেটিস (Socrates) যখন যুক্তির দ্বারা কোনও তথ্যের সমাধান করিতে পারিতেন

না তখন গভীর ধ্যানে মগ্ন হইতেন এবং সেই ধ্যানের মধ্য দিয়া তাঁহার সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজিয়া পাইতেন। এমন অনেক নিরীশ্বরবাদীর কথা শোনা যায় যাহারা ঈশ্বর ভক্তির অভিমানী তথাকথিত ধার্মিক হইতে অনেক উন্নত চরিত্র। ডেভিড হেরার ঈশ্বর ভক্তি লইয়া কখনও মাথা ঘামান নাই, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান প্রকৃত উন্নতমনা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইউরোপের ব্রুনোর (Bruno) জ্ঞান অনেক বৈজ্ঞানিক তথাকথিত ধর্মশুদ্ধগণের বসপূর্বক ঈশ্বরকে স্বীকার করাইবার শাসন দণ্ডের নিকট মাধানত না করিয়া অগ্নিদাহে মৃত্যুকেও হাসিমুখে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এই যে অসত্যকে স্বীকার না করিয়া সত্য বলিয়া যাহা তাঁহারা বুঝিয়াছেন তাহার জন্ত জীবন বিসর্জন ইহাই কি প্রকৃত পক্ষে সেই সত্য স্বরূপ ভগবানকে যথাযথভাবে স্বীকার করা নয়? আত্মনিবেদনের গ্রন্থকার এই ভাবটি প্রকাশের জন্তই ভেলেরিয়ানের প্রাণদণ্ডের কাহিনী বর্ণনার সময় এই কথাগুলি উল্লেখ করিয়াছেন, একজন খৃষ্ট পুরোহিত তাঁহার আত্মার সংকারের জন্ত অস্বাভাবিক ক্রিয়া করাইতে উৎসাহিত হইলেন। ভেলেরিয়ান সজ্ঞারে মাথা নাড়িয়া তাম্বুলের সহিত সগর্বে বলিলেন—“জীবনে যেমন আমি পৃথিবীর কোন শাসনকর্তার বশতা স্বীকার করি নাই, মরণকালেও তেমনি স্বর্গের রাজার প্রভু স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।”

প্রকৃত ধর্মভাবের যে কয়েকটি মূল কথা এই “আত্ম-নিবেদন” গ্রন্থে পাইয়াছি তাহার এটি একটি বিশেষ কথা যে, প্রকৃত ধর্মভাবে ভয়ের শাসন নাই আছে পরম অমুরাগে ক্ষেত্রায় আত্মবিসর্জন। আরও আমরা ইহাই দেখিতে পাইয়াছি আত্মস্বার্থ বিসর্জনই ধর্মভাবের উৎস। মহাপ্রভুর সাধনার ভিতর মোক্ষলাভের কোন প্রসঙ্গ নাই, আছে জগতকে উন্নত করিবার কথা, আছে আচরণ ব্রাহ্মণকে সমভাবে হরিনাম মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এক পরম ঐক্যমুদ্রে বাঁধিয়া এক করিবার কথা। বুদ্ধদেবের নির্বাণের অমুভূতি লাভ তাঁহার নিজের জন্ত নহে, জগতের জন্ত। যখন আমরা আপনাকে একেবারে ভুলিয়া জগতের মঙ্গল-সাধনার কার্যে ডুবিয়া যাই সেই সাধনাই আমাদের প্রকৃত সাধনা। দিব্য-দর্শন প্রভৃতি যখন জগতের মঙ্গল-সাধনে শক্তি-সঞ্চারক হয় তখন সেই দর্শনই সার্থক নতুবা তাহা কল্পনার স্বপ্নে নিরর্থক ভাব বিলাসিতা মাত্র। “আত্মনিবেদন” গ্রন্থকার যে রাবিয়ার দেশসাধকের কথা এত বিস্তৃত ও উচ্ছ্বাসিত ভাবে সমুজ্জ্বল লেখনী-চিত্রে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন তাহার একমাত্র কারণ এই যে এই মহা-বৈষ্ণবসাধক রাবিয়ার দেশ-সাধকগণকে সমধর্মী-সাধক বলিয়াই মনে প্রাণে অমুভব করিয়াছিলেন।

বার্তাবহ

নব নিবৃত্ত বড়লাট লর্ড ওয়াল্ডেন ভারতে পদার্পণ করিয়াই বাংলার অন্ন্যসমস্তার প্রতি তাঁহার সমস্ত মনোযোগ অর্পণ করিয়াছেন। এবং ইতিমধ্যেই তিনি বুকু নরনারীর মর্মান্তিক অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন। পল্লী অঞ্চলে খাদ্যশস্ত্র প্রেরণের জন্য সামরিক সাহায্যও পাওয়া যাইতেছে। সংবাদপত্রে অধুনাপ্রচারিত বিবৃতি ও খাদ্যশস্ত্র বন্টনের যে বিবরণ আমরা পাইতেছি তাহাতে মনে হয়, নিকট ভবিষ্যতে বাংলার বিশেষ করিয়া পল্লী অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ বহুলাংশে লাঘব হইবে। আগামী আমন ফসল উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার বাহাতে ফাটকাবাজ্জ খার্বাঘেঁসারদল তাণ্ডবতা সুরু করিতে না পারে সেই দিকে সকলের সম্ভাব্য দৃষ্টি থাকাও একান্ত আবশ্যক।

এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা স্বীয় পুঁজী ক্ষীণতর করিবার জন্য যেকোন পছন্দ অবলম্বন করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। এই শ্রেণীর লোক সব সময়ই থাকিবে। ইহাদিগকে দাবাইবার একমাত্র উপায় যদি কেহ একদানা খাদ্যশস্ত্রও কণ্টোলাদরের অতিরিক্ত দরে না কিনেন। তবেই ইহাদের সকল উৎসাহ নিশ্চেষ্ট হইয়া যাইবে।

দুর্দিন ও চাউল সংকট মধ্যেও কয়েকটা অষ্টপ্রহর কীৰ্ত্তনে বহুলোকসমাগম ও বহুলোককে মহাপ্রসাদ বিতরণের ধবর আমরা পাইয়াছি। কাউখালী (বরিশাল) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের বাটীতে গত আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদে অষ্ট-প্রহর নামকীৰ্ত্তনের দিন স্থানীয় লঙ্গরখানার শত শত অন্ন-প্রার্থীরা মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য লঙ্গরখানার খিচুরী

প্রত্যাশায় না বসিয়া চন্দ্রমহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হয়। চন্দ্রমহাশয়ও সকলকে পরিতোষের সহিত ভোজন করান। প্রায় ৫ মণ চাউলের অন্ন পরিবেশন করা হয়।

যাহারা অত্য়পি ‘শ্রীশ্রীমাদাদা’ শ্রীপত্রিকা বাবদ স্বীয় সাহায্য পাঠান নাই, কৃপা করিয়া পাঠাইয়া দিয়া শ্রীপত্রিকা-খানি বাঁচাইয়া রাখুন ইহা আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ।

শ্রীবিধুবংশ সরকার মহাশয় সম্পাদিত—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি কৃত ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতর’ গৌরভঙ্গনামগা টাকা বহু পূর্বে প্রকাশিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু যুদ্ধ-জনিত আভ্যন্তরিক পরিস্থিতির দরুন উহা পাঠক-বৃন্দ বরাবরে বাহির হইতে দেয়ী হইয়া গিয়াছে। আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে উক্ত শ্রীগ্রন্থের মুদ্রন কার্য শেষ হইয়াছে এবং শীঘ্রই বাহির হইবে। এই শ্রীগ্রন্থখানি বাহির হইতে বিলম্ব হওয়ায় আমরা গৌরভঙ্গনগণের নিকট হইতে বহু পত্র পাইয়াছি এবং অনেকে এই শ্রীগ্রন্থখানি শীঘ্র পাইবার জন্য প্রবল ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় শ্রীগ্রন্থখানি সুদী ও বৈষ্ণব পাঠকবৃন্দের নিকট সমাদৃত হইবে। শ্রীগ্রন্থখানির মূল্য প্রথমে ৫ টাকা ধার্য হইয়াছিল; কিন্তু মুদ্রণ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কাগজের মূল্য বহুগুণ বাড়িয়া যাওয়ায় ও অপরাপর অনিবার্য কারণে প্রতিখানি গ্রন্থ ৭ টাকার নিম্নে বিক্রয় করা সম্ভবপর হইবে না। আশাকরি অল্পগ্রাহকবৃন্দ অবস্থাটী উপলব্ধি করিয়া স্বীয় সংখ্যা গ্রহণ করিবেন ও সেই ক্ষুদ্রে আমাদিগকে মধ্য-খণ্ড যত্ন করিতে উৎসাহিত ও সাহায্য করিবেন।

শ্রীশ্রীমায়েরগণের তালিকা

খুলনা জেলা
বাগেরহাট মহকুমা

বোলপুর—

- ৪৯। শ্রীশরৎচন্দ্র দে
- ৫০। ঐ পত্নী
- ৫১। " ভোলানাথ দাস
- ৫২। ঐ পত্নী
- ৫৩। ঐ "
- ৫৪। " হরিপদ চক্রবর্তী
- ৫৫। " নগেন্দ্রনাথ সোমদ্যার
- ৫৬। ঐ মাতা

খস্তাকাটা—

- ৫৭। " রসিকচন্দ্র বালা
- ৫৮। " সারদাসুন্দরী বালা
- ৫৯। " যুক্তা জগৎতার বালা
- ৬০। " বিনোদবিহারী বালা
- ৬১। " বেলকসুন্দরী বালা
- ৬২। " দ্বিতেন্দ্রনাথ বালা
- ৬৩। " খগেন্দ্রনাথ বালা
- ৬৪। " নটবর সিংহ
- ৬৫। " মহেন্দ্রনাথ মিস্ত্রী
- ৬৬। ঐ পত্নী
- ৬৭। " সতীশচন্দ্র মিস্ত্রী
- ৬৮। " রাজেন্দ্রনাথ মিস্ত্রী
- ৬৯। " মনোহরভূষণ মিস্ত্রী
- ৭০। " প্যারীমোহন মিস্ত্রী
- ৭১। " নবলক্ষ্মী মিস্ত্রী
- ৭২। " বিনোদিনী মিস্ত্রী
- ৭৩। " মুকুন্দলাল মিস্ত্রী
- ৭৪। " উপেন্দ্রলাল মিস্ত্রী
- ৭৫। " সুরজিনী মিস্ত্রী
- ৭৬। " শ্রীমতী মিস্ত্রী

- ৭৭। " উমেশচন্দ্র মিস্ত্রী
- ৭৮। " শ্রীচরণ ডাকুয়া
- ৭৯। " রাইচরণ হালদার
- ৮০। " সখানাথ হালদার
- ৮১। " উপেন্দ্রনাথ বেপারী
- ৮২। " বিজয়কৃষ্ণ মিস্ত্রী
- ৮৩। " রাইমোহন মিস্ত্রী
- ৮৪। ঐ পত্নী
- ৮৫। " লোকনাথ মিস্ত্রী
- ৮৬। " ব্রজেন্দ্রনাথ মিস্ত্রী
- ৮৭। " কৈলাসচন্দ্র হালদার

খেজুরবাড়িয়া—

- ৮৮। " আনন্দমোহন হাওলাদার

পান্তরীবুনিয়া—

- ১৪৬। শ্রীশ্রীনাথ শীল
- ১৪৭। ঐ পত্নী
- ১৪৮। " যোগেশচন্দ্র মাঝি
- ১৪৯। " প্রেমানন্দ মাঝি
- ১৫০। " ষামিনীসুন্দরী মাঝি
- ১৫১। " সতীশচন্দ্র মণ্ডল
- ১৫২। ঐ পত্নী
- ১৫৩। " শ্রীনাথ মণ্ডল
- ১৫৪। ঐ পত্নী
- ১৫৫। " অনন্তকুমার মণ্ডল
- ১৫৬। " নরেন্দ্রনাথ মণ্ডল
- ১৫৭। " নগেন্দ্রনাথ হত্যার
- ১৫৮। " নরেন্দ্রনাথ হত্যার
- ১৫৯। " উপেন্দ্রনাথ হত্যার
- ১৬০। ঐ মাতা
- ১৬১। " মুকুন্দবিহারী হত্যার

বৈষ্ণব গ্রন্থের বিজয় বৈজয়ন্তী।

সাহিত্যভূষণ শ্রীবিধুভূষণ সরকার, বি, এ, বিত্তাবিনোদ সম্পাদিত

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

(আদিখণ্ড)

মহাপ্রভুর লীলামৃতের জীবন্ত আলেখ্য। ভাব ও ভাষার প্রাণবন্ত রূপ।

এই পাঠ করিতে করিতে নিতান্ত বহিষ্কৃতী শুদ্ধ হৃদয়ও নিগুঢ় রসের সন্ধান পাইবে।

আনন্দাশ্রম বর্ষে মনের মালিগা কাটিয়া যাইবে।

মূল্য—৭ টাকা (ডাক মাণ্ডল-স্বতন্ত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীশ্রীমা-দাদা কার্যালয়—ইলুহার, বরিশাল (বেঙ্গল)

শ্রীশ্রীমা-দাদা শাখা কার্যালয় :—২২১১২, ট্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা।



শ্রীশ্রীমা-দাদা মাসিক পত্রিকার নিয়মাবলী

১। পত্রিকার মূল্য অগ্রিম দেয়। ২। বাৎসরিক মূল্য—৪। ৩। বাৎসরিক ২১০ টাকা (স্বতন্ত্র)। ৪। বাৎসরিকের নিয়মিত পত্রিকার স্বতন্ত্র ডাক মাণ্ডল দেয়। ৫। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পত্রিকার ১৫ তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে। কোন মাসের কাগজ ১৫ তারিখের মধ্যে না পাওয়া গেলে নিজ এলাকার ডাকঘরে অফিসস্থান করিয়া তাহাদের উত্তর সহ সেই মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে আমাদের কলিকাতা অফিসে জানাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার—পূর্ণ পৃষ্ঠা প্রতিসংখ্যা—২০, অর্ধ পৃষ্ঠা প্রতিসংখ্যা—১২, চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা প্রতিসংখ্যা—৭, মলাট পৃষ্ঠার হার স্বতন্ত্র ও অফিসস্থানে জ্ঞাতব্য। ৭। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। ৮। পূর্ব-প্রকাশিত বিজ্ঞাপন যদি অপরিজনক বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে ভবিষ্যতে উহার কারণ না দেখাইয়াই প্রকাশ বন্ধ করা হইবে। ৯। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নহি। ১০। চিঠিপত্র মণিঅর্ডার ইত্যাদি কলিকাতা ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি ।

বিকশিতরাজ্য প্রাপনার সার্বভৌমত্ব ।

শ্রীশ্রীমা-দাদা

সার্বজনীন প্রেমপ্রচারক একমাত্র মাসিক পত্রিকা

—পৌষ—

৪৫৯ গৌরান্দ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ ।

প্রধান কার্যালয় :

ইলুহার, বরিশাল (বেঙ্গল) ।

কলিকাতা শাখা :

২২১-২, ট্যাগু ব্যাঙ্ক রোড ।

বার্ষিক—৪

প্রতি সংখ্যা—৮০

সূচীপত্র

১।	হিন্দুজাতির অধোগতির কারণ	...	৫০৩
২।	শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু	...	৫০৬
৩।	জগতে বৈষ্ণব-ধর্ম শ্রেষ্ঠ কেন ?	...	৫০৯
৪।	Free Translation	...	৫১০
৫।	পিপাসা (কবিতা)	...	৫১০
৬।	শ্রীগৌরান্দের পূর্বগ্রাগ	...	৫১১
৭।	স্মৃতি	...	৫১৪
৮।	মহাত্মা শিবিরকুমার ও পণ্ডিত কালিময় ঘটক	...	৫১৫
৯।	শ্রীমত মৃণালকান্তির প্রত্যুত্তর	...	৫১৭
১০।	স্বরূপে আরোপ	...	৫১৮
১১।	দুঃস্থ অভয়ান, বুদ্ধিতে যম, কপট প্রেমিক (কবিতা)	...	৫২০
১২।	প্রার্থনা (কবিতা)	...	৫২০
১৩।	বার্তাবহ	...	৫২১

P 36,166

মুদ্রাসম্পাদক—

গৌরপ্রেমমুখ্যসিদ্ধ শ্রীমৃণালকান্তি বোষ, ভক্তিভূষণ ।

সাহিত্যভূষণ শ্রীবিধুভূষণ সরকার, বি. এ., বিজ্ঞাবিনোদ ।

সংবাদপত্রের সমালোচনা ।

শ্রীশ্রী মা-দাদা— (মহাষ্টমী সংখ্যা) — যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, ভক্তিভূষণ, ও শ্রীবিধুভূষণ সরকার, বি-এ বিজ্ঞাবিনোদ ।

মহাষ্টমী সংখ্যাখানি বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এবং প্রেম ও ভক্তিমূলক রচনার সমৃদ্ধ হইয়া আশ্চর্যকর করিয়াছে । বৈষ্ণব সমাজে আলোচ্য সংখ্যাখানি বিশেষভাবে সমাদৃত হইবে । এই সংখ্যায় শ্রীমৃণালকান্তি-ঘোষ ভক্তিভূষণ, শ্রীশীল কুমার ভৌমিক, এম-এ, বি এল, শ্রীরসিক মোহন-বিজ্ঞাভূষণ, প্রমুখ সুদীক্ষণের রচনা পাঠকবর্গকে বহু তথ্যের সন্ধান দিবে ।—যুগান্তর ২৪।১০।৪৩

শ্রীশ্রী মা-দাদা— (মাসিক পত্রিকা) শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ ও শ্রীবিধুভূষণ সরকার বি-এ বিজ্ঞাবিনোদ সম্পাদিত । মূল্য প্রতি সংখ্যা ছয় আনা ।

অগ্রাহ্য সংখ্যাখানি আমরা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি । ভক্তজন ইহার মধ্যে বহু তত্ত্ব ও তথ্যের সন্ধান পাইবেন । শ্রীবিধুভূষণ সরকার, শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, ডাঃ সরসীলাল সরকার প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই সংখ্যায় লিখিয়াছেন ।—যুগান্তর ১২।১২।৪৩

কেনবার সময়

“ড্যাড কো”

ছাপ্টি দেখে নিলে আর ভয় থাকে না

রবার সেট সেভিংব্রাশ

হরেকরকম ডিজাইন

মনিব্যাগ—ভ্যানিটি ব্যাগ—পোর্টফোলিও শান্তিনিকেতন ও অজন্তা ফ্রেস্কো, ইত্যাদি
বহুপ্রকার নক্সা, বিভিন্ন আকার ও বিভিন্ন দামের,—সস্তা অথচ মজবুত

সোনার ছোপ দেওয়া

মেয়াদী গ্যারান্টিযুক্ত

হরেকনক্সার—বোতাম, হাতের বোতাম, হার, চুড়ি কানের অলঙ্কার, ইত্যাদি ।

মেয়াদী সময়ের মধ্যে বর্ণচ্ছটার পরিবর্তন হইলে বিনামূল্যে পরিবর্তন করা হয় ।

—ইহা ছাড়া—

মফঃস্বলের গ্রাহকবৃন্দের সুবিধার্থে—সর্বপ্রকার মাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় ।

দাদা এণ্ড কোং

অফিস :—২২১২, ষ্ট্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা ।

কারখানা :—৮৮বি, মেছুয়াবাজার, ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও যাদবপুর ।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা



অধ্যক্ষ—শ্রীমোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম্-এ, এফ্-সি-এস্ (লন্ডন),
এম্-সি-এস্ (আমেরিকা), আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, ভাগলপুর কলেজের রসায়ন-
শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক (প্রফেসর)

মকরধ্বজ ।

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণধটিত)

প্রতি তোলা—৫, টাকা, সপ্তাহ—১/০ আনা ।

সর্বরোগনাশক মহৌষধ । ইহা ত্রিদোষ নাশক ।

সকল রোগে মকরধ্বজের অল্পপান বিধির পুস্তিকা—১/০ আনা ।

সারিবাতি সালসা ।

(রেজিষ্টার্ড)

প্রতি শিশি—৮/১০ আনা ।

রক্ত পরিষ্কারক সর্বপ্রকার উপাদানে প্রস্তুত । এই সালসার গুণ অবর্ণনীয় । রক্তই আমাদের জীবন ।

রক্ত পরিষ্কার ও সতেজ থাকিলে কোন রোগের বীজাণুই সহজে আক্রমণ করিতে পারে না ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ ।

প্রতি সেব—৩/০ আনা ।

সর্বোৎকৃষ্ট আমলকী, বংশলোচন ও অন্যান্য উপাদানে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করিয়া চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত হয় ।

অবলাবান্ধব যোগ ।

(রেজিষ্টার্ড)

প্রতি ১৬ মাত্রা—২/০ আনা ।

স্ত্রীরোগসমূহের অব্যর্থ মহৌষধ । ইহা সেবনে প্রদর, বাধক, পৃষ্ঠে বা কোমরে বেদনা, মাথাধরা রক্তোদোষ,

মূত্রবৃন্দা, বন্ধ্যাত্ব বিদূরিত হয়, জরায়ু সুস্থ ও সবল হয় এবং দীর্ঘায়ু সন্তানধারণের ক্ষমতা জন্মে ।

মৃতসঞ্জীবনী ।

(রেজিষ্টার্ড)

বড়শিশি—৪/০ টাকা, ছোটশিশি—২/০ টাকা ।

দেহকে সুস্থ, সবল ও কর্মঠ করিতে হইলে এই মৃতসঞ্জীবনী একমাত্র অবলম্বনীয় । প্রহৃতির অবশ্য সেবনীয় ।

জ্বর, হৃৎকম্প, বাত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, রক্তাশ্রিত, রোগান্তে দৌর্জল্যাচিত সর্বদা প্রযোজ্য ।

অর্শবটী ।

(রেজিষ্টার্ড)

৩০ বটিকা পূর্ণ প্রতিশিশি—৫, টাকা ।

অসহনীয় কষ্টপ্রদ সকল প্রকার অর্শরোগ নিবারণের অধিতীয় মহৌষধ ।

সর্বজ্বর বটী ।

(রেজিষ্টার্ড)

প্রতি ১৬ বটী—২/০ আনা ।

যে কোনও জ্বররোগে অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া বহু পরীক্ষিত । জ্বরের এইরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ আত্মপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই ।

ৰূপ জনসেবায় :-



প্ৰণব ঔষধালয়-ডাক

দুৰ্গত ও বিপ্লৱতম আয়ুৰ্বেদীয় প্ৰতিষ্ঠান

হেড্, অফিস ও কাৰখানা—

নাৰায়ণগঞ্জ (বেঙ্গল)

অধ্যক্ষ :- কবিশেখৰ শচীন্দ্ৰমোহন পোদ্দাৰ, বি, এ,
আয়ুৰ্বেদশাস্ত্ৰী, সাহিত্যবিনোদ ।

প্ৰধান ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক :-

কবিরাজ মনোমোহন দাশ গুপ্ত, ব্যাকরণতীৰ্থ, বিদ্যারত্ন, কবিত্বষণ

মকরধ্বজ—	৫, তোলা	চ্যবনপ্ৰাশ—	৩, প্ৰতি সের
মহাদ্ৰাক্ষাৰিষ্ট—	১০ শিশি	বুঃ ছাগলাত ঘৃত—	১০, ”
বুঃ দশগূল্যৰিষ্ট—	১, ”	সপ্তপ্ৰস্থ মহামাষ তৈল	১৬, ”
পত্ৰাঙ্গাসব—	১০, ”	বসন্ত তিলক—	১, সপ্তাহ
সৰ্ববিধ ৰক্ত ছুষ্টিতে—		স্নায়ুপুষ্টি ও সবলতালাভে—	
সারিবাদি ৰসায়ন—	১৫০ বোতল	স্ত্ৰী সঞ্জীবন—	১৪, সের

তৈল, ঘৃত, আসব, অৰিষ্ট, জ্বাৰিত প্ৰভৃতি যাবতীয় আয়ুৰ্বেদীয় ঔষধ সৰ্বদা প্ৰস্তুত থাকে ।

ইনজেক্সন ব্যতীত
কালাজ্বৰ চিকিৎসায়—
হাৰবেকস্
দেশীয় ভেষজ—নব আৱিষ্কাৰ

সৰ্দি, কাশি ও হুপিং কফে

চুৰনী

আয়ুৰ্বেদেৰ অভিনব দান ।

স্কুলেৰ হেড্, মাষ্টাৰ, ইউনিয়ান বোৰ্ডেৰ প্ৰেসিডেণ্ট, মেম্বাৰ অথবা স্থানীয় বিশিষ্ট লোকেৰ পৰিচয় পত্ৰসহ অৰ্ডাৰ দিলে আমাদেৰ আৰ্ন্তবিভাগ হইতে দৰিদ্ৰ ৰোগীদিগকে বিশেষ কনসেসনে ঔষধ সরবৰাৱ কৰিয়া থাকি ।

সৰ্বব্ৰ শাখা ও এজেন্সী খোলা হইতেছে—আবেদন কৰুন ।

— শ্রীশ্রীমা-দাদা—

“মাতৃহের ভ্রাতৃহের উজ্জল আলোকে,
নদীয়ার প্রেমধারা বহুক ভুলোকে।”

২য় বর্ষ	৪৫৯ গৌরাক	পৌষ
৯ম সংখ্যা	ইং ডিসেম্বর, ১৯৪৩	১৩৫০ সাল।

হিন্দুজাতির অধোগতির কারণ

শ্রীমণালকান্তি ঘোষ ভক্তিতুষণ।

জগতে যে কয়েকটি প্রধান ধর্ম আছে, তন্মধ্যে হিন্দুধর্ম সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। আবার হিন্দুরা যেরূপ পারমার্থিক উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, অপর কোনও জাতি সেরূপ করিতে পারেন নাই। ফলতঃ হিন্দুধর্ম অস্ফাট ধর্মের মূল, আদর্শস্বরূপ ও শিক্ষাস্থল,—ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অস্ফাট ধর্মে বাহা আছে হিন্দুধর্মে তাহা সমস্তই আছে, কিন্তু হিন্দুধর্মে বাহা আছে তাহার অনেক বিষয় অপর কোন ধর্মে নাই। বাঁহারা এক সময় পারমার্থিক বিষয়ে এইরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন,—আজ সেই হিন্দুজাতির এইরূপ দুর্দশা ও অধোগতির কারণ কি?

ইহার কয়েকটি প্রধান কারণ বলিতেছি। সংসারের যিনি কর্তা, তাঁহার সদ্গুণাশ্রিত ও স্বার্থশূন্য হওয়া আবশ্যিক, এবং পরিবারস্থ সকলকেই তাঁহার সমান চক্ষে দেখা ও তাহাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হওয়া উচিত। যতদিন তিনি এইরূপ নুনির্মল ও নিঃস্বার্থ থাকিবেন, ততদিন সংসার অটুট থাকিবে,—সকলেই সুখে ও শান্তিতে কাটাইবে। কিন্তু যেইমাত্র তাঁহার স্বভাবে দোষ স্পর্শ করিবে—স্বার্থপরতা, তাঁহাকে ছুঁইয়া বাইবে, অমনি সোণার সংসার হইলেও তাহা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে—ছারেখারে যাইবে।

হিন্দু-সমাজের দশাও সেইরূপ। যতদিন হিন্দুসমাজপতি-গণ নিঃস্বার্থভাবে সকলকে সমান চক্ষে দেখিতেন, তাহাদের

সুখদুঃখ নিজের সুখদুঃখ বলিয়া গণিতেন, ততদিন হিন্দুরা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছিলেন, হিন্দু-সমাজ একটি সোণার সংসার বলিয়া পরিগণিত হইত,—হিন্দুজাতির ও হিন্দুধর্মের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছিল। কিন্তু যেইমাত্র স্বার্থের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল অমনি সকল বিষয়েই হিন্দুর অবনতির সূত্রপাত হইল।

পূর্বে যিনি সাধন-ভজন দ্বারা ভগবৎ জ্ঞানে অধিকারী হইতেন, তিনি সমাজে উচ্চপদ পাইতেন, সকলের নিকট সম্মানিত ও পূজনীয় হইতেন। কিন্তু সকলের সাধন-ভজন ও পারমার্থিক বিষয় লইয়া থাকিলে সংসার চলে না,—আর, সকলে সাধন-ভজন লইয়া থাকিতেও পারে না। সুতরাং রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিবার জন্ত রাজার, বাণিজ্য-ব্যবসায়ের জন্ত বণিকের, কৃষিকার্যের জন্ত কৃষকের, এবং এইরূপ বিভিন্ন কার্যের জন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের আবশ্যিক। এই সকল কার্য বাঁহারা করিতেন তাঁহারা পারমার্থিক বিষয়ে বড় একটা মন দিতে পারিতেন না। সুতরাং বাঁহারা পারমার্থিক বিষয় লইয়া থাকিতেন, সমাজের পারমার্থিক উন্নতির সমস্ত ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত থাকিত। আর ইহাদের সংসার-যাত্রা নির্বাহের ভার রাজা প্রজা প্রভৃতি অপর সকলে কুলাইয়া লইতেন। এইরূপে হিন্দুরা সমাজ-গঠন করিয়া এবং পরস্পরকে সাহায্য

করিয়া পরম সুখস্বচ্ছন্দে বসবাস করিতেন।

কিন্তু সমাজপতিগণ হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানে আসীন হইয়া এবং আপনাদিগকে অসীম ক্ষমতাশালী দেখিয়া, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ক্রমে, স্বার্থপরতা অলঙ্কিতভাবে তাঁহাদিগকে আপন আয়ত্তাধীনে আনিতে লাগিল। তখন নিজের ও নিজজনের পার্শ্ব মঙ্গলের দিকে তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি পড়িল,—পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এই কর্তৃত্ব ও সম্মান উপভোগ করিবার স্বেচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল।

তখন, তাঁহারা আপনাদিগের সুবিধামত বেদের ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রপাঠে তাঁহারা ভিন্ন অপর কাহারও অধিকার থাকিল না, এবং পারমাধিক কার্যে তাঁহারা হই পুত্রপৌত্রাদিক্রমে আধিপত্য করিতে লাগিলেন।

ইহাতেও তাঁহাদিগের তৃপ্তি হইল না। হিন্দু-সমাজে আপনাদিগের আধিপত্য প্রবল ও অখণ্ড রাখিবার জন্ত তাঁহারা সমাজে অতি কঠোর বিধিব্যবস্থা প্রচলিত করিতে লাগিলেন। অন্ত কোন ধর্মাবলম্বী যাহাতে হিন্দুসমাজের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশাধিকার না পায় সে পথ তরুণ করিলেনই, অধিকন্তু নিয়ম করিলেন,—কোন হিন্দু স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, কোন প্রকারে একবার যদি হিন্দুসমাজের কোন বিধিব্যবস্থা লঙ্ঘন করেন, কি হিন্দুসমাজ-বিরুদ্ধ কোন কাজ করেন, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ হিন্দুসমাজচ্যুত হইবেন, এবং কোন প্রকারেই হিন্দুসমাজে স্থান পাইবেন না।

সুতরাং মুসলমানেরা যখন একহাতে কোরান ও অপর হাতে তরবারি লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল, তখন তাঁহারা অতি সহজে অনেক হিন্দুকে মুসলমানধর্মে আনয়ন করিতে সমর্থ হইল। মনে করুন, তাহারা একজন হিন্দুকে ধরিল এবং জোর করিয়া তাহাকে জলপান করাইল, আর সে বেচারী অমনি চিরদিনের জন্ত হিন্দুসমাজচ্যুত ও জাতিভ্রষ্ট হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজন,—যাহারা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন না, তাহারাও হিন্দুসমাজ হইতে চিরকালের জন্ত বিতাড়িত হইলেন। কেহ কেহ আবার হিন্দুসমাজে আপনাদের হীনপদ দেখিয়া মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

যাহাদের সমাজে এইরূপ কঠোর নিয়ম, তাহাদের ধর্মে প্রচার-পদ্ধতি থাকিতে পারে না। সুতরাং হিন্দুধর্মেও প্রচার-পদ্ধতি ছিল না। ইহার ফলে হিন্দুর সংখ্যা ক্রমে কমিতে লাগিল, তাহারা হীনবল হইতে লাগিলেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসমাজের বন্ধন ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িল। খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও, তাহাদের মধ্যে প্রচার-পদ্ধতি থাকায় তাহাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। বৌদ্ধধর্ম যদিও হিন্দুধর্মের একটি শাখা মাত্র, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে জগতের প্রায় একতৃতীয়াংশ লোক আজ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। মুসলমানেরা ধর্ম-প্রচারার্থে কতবার ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে, কত অর্থ ব্যয় করিয়াছে, কত শত লোক অগ্নি-বদনে আপন জীবন দান করিয়াছে। খৃষ্টানেরাও ধর্ম-প্রচারের জন্ত কি না করিয়াছে!

হিন্দুজাতির অধোগতির যে কয়েকটি কারণ উপরে নির্দেশ করিলাম, তন্মিহ আরও একটি কারণ আছে, এবং সেইটি সর্বপ্রধান। খৃষ্টান, মুসলমান কি বৌদ্ধদিগের মধ্যে যেরূপ ঐক্য আছে, হিন্দুদিগের মধ্যে সেরূপ দেখা যায় না। ইহার একমাত্র কারণ, অন্তান্ত জাতির ন্যায় সমগ্র হিন্দুজাতি কোন এক বিশেষ লক্ষ্যবস্তুর অনুবর্তী নহে।

সমগ্র খৃষ্টানজাতির একমাত্র লক্ষ্যবস্তু যীশু, সমগ্র মুসলমানদিগের এইরূপ লক্ষ্যবস্তু মহম্মদ, আর বৌদ্ধদিগের লক্ষ্যবস্তু বুদ্ধ। যীশু আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র, আর মহম্মদ আপনাকে ঈশ্বরের দোস্ত বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। তবুও খৃষ্টানেরা যীশুকে এবং মুসলমানেরা মহম্মদকে তাহাদের সর্বস্বর্গ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাহারা কোন শাস্ত্র জানেন না, অবতারের বদননিঃসৃত বাক্যই তাহাদের বেদ-বাক্য। এই অবতারগণ শক্তিসঞ্চারপূর্বক যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, ভক্তগণ জীবন উৎসর্গ করিয়াও তাহা পালন করেন। জগতের মধ্যে যেখানে যত খৃষ্টান, যত মুসলমান বা যত বৌদ্ধ আছে, তাহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত হইলেও, সমস্ত খৃষ্টানের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু যীশু, সমস্ত মুসলমানের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু মহম্মদ এবং সমস্ত বৌদ্ধের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু বুদ্ধদেব। আর এই সমস্ত খৃষ্টান, মুসলমান ও বৌদ্ধ এক একটা সূত্রে গাঁথা।

ইহাদের ধর্ম আধুনিক ও তত্ত্বকথা স্থূল হইলেও, ইহারা আপনাপন সমুদ্রদ্বারা এইরূপ এক একজন মহাপুরুষ পাইয়াছিলেন বলিয়া, ইহাদের মধ্যে এইরূপ একাগ্রতা সম্ভবপর হইয়াছে। এইরূপ কোন লক্ষ্যবস্ত, আদর্শস্থল কি শক্তিধর মহাপুরুষ আপনাদিগের মধ্যে না পাইলে কখন কোন জাতি ধর্ম-জীবনের উন্নতি করিতে পারে না। আর ধর্মজীবনের উন্নতি ব্যতীত কোন জাতিই সর্ব-বিষয়ে উন্নতি-সাধন করিতে পারে না।

আমাদের এখন বেক্রপ শোচনীয় অবস্থা তাহাতে সমগ্র হিন্দুজাতির একজন আদর্শ মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে আমরা সর্বপ্রকারে পারমার্থিক ও ঐহিক উন্নতি লাভ করিতে পারিব না। এই মহাপুরুষের জন্ত আমাদের অস্ত্র বাইতে হইবে না। মাড়ে চারিশত বৎসর পূর্বে তিনি এই বঙ্গদেশে শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনিই আমাদের মহাপ্রভু শ্রীগৌরানন্দ।

বীশু আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র, মহম্মদ আপনাকে ঈশ্বরের দোস্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আর তাঁহাদের ভক্তেরা তাহাই বিশ্বাস করিয়া, তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া সেই ধর্ম প্রচারের জন্ত আত্মোৎসর্গ করিয়া আসিতেছেন। বীশু কি মহম্মদ তাহাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহারা অশিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরানন্দ যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন নবদ্বীপ-সর্ব-বিষয়ে উন্নতিলাভ করিয়াছিল। বিশেষতঃ বিজ্ঞা ও ধর্মচর্চায় ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। ভাবতবিস্মৃত বায়ুদেব সার্কভোম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর ত্রায় সর্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ শ্রীগৌরানন্দকে স্বয়ং “তিনি” বলিয়া স্বীকার ও তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার ধর্ম জাত্যাভিমান, সমাজশাসন, কি ছোট-বড় নাই। যেভক্ত সে চণ্ডাল হইলেও সর্বশ্রেষ্ঠ, সকলের পূজনীয়, এই তাঁহার শ্রীমুখের ব্যাখ্যা। মুসলমান হরিদাসকে

তিনি শ্রেষ্ঠ-ভক্তদিগের মধ্যে স্থান দিয়াছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ পর্যন্ত এই হরিদাসের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। হরিদাস যখন দেহত্যাগ করেন তখন উপস্থিত ভক্তমাঝেই তাঁহার পদরজ লইয়া মস্তকে দিয়াছিলেন। আর স্বয়ং মহাপ্রভু তাঁহার মৃতদেহ কোলে লইয়া প্রেমে উদ্ভূত হইয়া ভক্তগণসহ নৃত্য করিয়াছিলেন। রূপসনাতন মুসলমানদিগের সঙ্গে বাস করিতেন বলিয়া একরূপ জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরানন্দ তাঁহাদিগকে ‘গোস্বামীর’ পদ দিয়াছিলেন। নরোত্তম কাম্বু ও শ্রামদাস গোপ ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের অনেক ব্রাহ্মণ-শিষ্য ছিল। সুতরাং জাত্যাভিমান কিংবা সমাজের কঠোরতা তাঁহাদিগের মধ্যে ছিল না।

সুবুদ্ধি রায় বাঙ্গলার একজন প্রধান জমিদার ছিলেন। মুসলমানেরা তাঁহাকে জোর করিয়া জলপান করাইয়াছিল। সেইজন্য তিনি হিন্দুসমাজচ্যুত হন। সমাজে উঠিবার জন্ত তিনি বহু পণ্ডিতের মত গ্রহণ করেন। কিন্তু সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে ভুতানলে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিবার ব্যবস্থা দিলেন। কিন্তু পরে মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার বারান্দীতে সাক্ষাৎ হয়। দয়ালু প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, “তোমার ভুতানলে পুড়িয়া মরিবার কোন আবশ্যক নাই। তুমি সজ্জীক বৃন্দাবনে যাইয়া বাস কর এবং কৃষ্ণনাম জপ কর। তাহাতেই তোমার সমস্ত পাপ মোচন হইবে।” মহাপ্রভুর নির্দেশ মত তিনি সজ্জীক বৃন্দাবনে যাইয়া কৃষ্ণনাম জপ করিয়া মহানন্দে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

অতএব হে হিন্দু ভাই-সকল, তোমরা সকলে পরমদয়ালু প্রভু শ্রীগৌরানন্দের চরণপদ্ম আশ্রয় করিয়া তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম ও বিধিব্যবস্থা অহুসরণ কর। তাহা হইলে তোমাদের পরিবার ক্রমে বুদ্ধি পাইবে এবং তোমরা একমন একপ্রাণ হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিবে এবং অন্তিমকালে তাঁহার পাদপদ্মে স্থান পাইবে।

শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু

(পূর্বাহ্নসরণ)

শ্রীবিধুভূষণ সরকার, বি-এ. বিজ্ঞাবিনোদ ।

(৫)

শ্রীনিবাস নীলাচল হইতে গোড়ে আসিয়াই শ্রীখণ্ডে ঠাকুর নরহরির কাছে গেলেন। সরকারঠাকুর শ্রীনিবাসের গলা ধরিয়া প্রেম-নীরে ভাসিলেন। পরে যখন শ্রীনিবাস গৌর-বিরহে পণ্ডিত গদাধর কি ভাবে নয়ন-জলে দিনযামিনী ষাপন করিতেছেন তাহা সবিস্তার বর্ণনা করিতে করিতে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তখন নরহরি রঘুনন্দন-প্রভৃতি সকলেই অধীর হইলেন বটে, আবার নরহরি নিজেই ধৈর্যাবলম্বন করিয়া সকলকে স্থস্থ করিলেন।

গদাধরের কথা-কহিতে কহিতে শ্রীনিবাস এতই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, তিনি আর গোড়দেশে কাল বিলম্ব না করিয়া নীলাচলে পণ্ডিত গোস্থানীকে দর্শন করিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার আশঙ্কা—কখন আবার গদাধর গৌরবিরহ সহিতে না পারিয়া অদর্শন হন। ঠাকুর নরহরিও সম্মতি দিলেন। সেই রাত্রিতে শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডে থাকিয়া প্রাতঃকালে নীলাচলে চলিলেন।

শ্রীনিবাসের অল্প বয়স, বালক বলিলেও অত্যাক্তি হয় না, সুকুমার দেহ, পিতা মাতার একমাত্র সন্তান, মাতুলেরও বড় আদরের ঘন। সেই শ্রীনিবাস গৌর-দর্শনে নীলাচলে গেলেন, কিন্তু প্রভুকে পাইলেন না। পাইলেন পণ্ডিত গদাধরকে, এবং গদাধর কৃপা করিয়া নীলাচলের ভক্তগণকে দর্শন করাইলেন। তাহাতে তিনি অনেকটা শান্ত হইয়াছেন বটে, এবং ভাবিয়াছিলেন, প্রভুর এই নিতাসঙ্গী মন্মথী ভক্তগণের চরণান্তিকে থাকিয়া গৌর-কথা শুনিবেন ও প্রাণ জুড়াইবেন। কিন্তু গদাধর তাহা দিলেন না। তাঁহার আদেশ পাশনার্থ তিনি গোড়ে আসিলেন বটে, কিন্তু কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া পুনরায় নীলাচলে চলিলেন। কি গভীর তাঁহার গৌর-প্রেম! কে তাহার ইয়ত্তা করিবে।

এখানেও তাঁহার বিপদ। তিনি বৃষ্টি জগতে কাদিতেই আসিয়াছেন। নীলাচল যাইতে পথে সংবাদ পাইলেন, গদাধর অদর্শন হইয়াছেন। তখন শ্রীনিবাসের যে আশ্রিত তাহা সহজেই অল্পমেয়। গৌর-গদাধর বলিয়া তাঁহার প্রাণ যেন বাহিরিয়া যাইতে চায়; কিন্তু প্রভু তাহা দিবেন কেন! রজনীযোগে গৌর-গদাধর স্বপ্নে দর্শন দিয়া কহিলেন, “শ্রীনিবাস, অধীর হইও না। সত্বর গোড়দেশে যাও। সেখান হইতে বৃন্দাবন যাইও।”

শ্রীনিবাস আর কি করেন। গৌরের আদেশ। তিনি গোড়দেশে ফিরিলেন। কিন্তু ছুঃখের উপর ছুঃখ, জ্বালা উপর জ্বালা। আসিতে পথে শুনিলেন, শ্রীনিতাই ও শ্রীঅর্জুনের অগ্রকট হইয়াছেন। এই সংবাদ বখন শুনিলেন তখনো তিনি গোড়দেশে ফিরিবার পথে উড়িষ্কার সীমানা অতিক্রম করেন নাই। প্রভুর লীলাভঙ্গী কে বুঝিবে! তিনি স্বপ্নে দর্শন দিয়া আদেশ দিলেন গোড়ে প্রত্যাগমন করিতে, আর গোড়ের সীমানায় পদার্পণ করিবার পূর্বেই শ্রীনিবাসকে সংবাদ জানান হইল যে গৌর-আনা গোঁসাক্ষি শ্রীঅর্জুনের এবং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাণের জ্বাই শ্রীনিত্যানন্দ অদর্শন হইয়াছেন। তখন শ্রীনিবাসের কি অবস্থা হইল? না—

শুনিতেই অঙ্গ আছাড়িয়া ভূমে পড়ে।

নিশ্চয় করিল—প্রাণ না রাখিব ঘড়ে ॥

কেশ ছিঁড়ি করাঘাত করয়ে মাথায়।

কান্দে উচ্চৈঃস্বরে, শুনি পাষণ মিলায় ॥

এই যে বিরহের উপর বিরহ, ইহাতে সন্ত কেহ হইলে তাহার দেহ ভাঙ্গিয়া যাইত। কিন্তু শ্রীনিবাসকে প্রভু আনিয়াছেন গৌরধর্ম প্রচার করিতে,—গৌর বস্তুটি কি তাহা জীবকে জানাইতে।—বিরহ দ্বারা তাই তাঁহার চিত্ত সরস করা হইতেছে।

যাহা হউক শ্রীনিভ্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত স্বাভাবিক-সৌম্য-মুখিতে হাসিতে হাসিতে আসিয়া শ্রীনিবাসকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন, এবং পরম বাৎসল্যে তাঁহাকে কোলে করিয়া কহিলেন,—“শ্রীনিবাস, মরণের বাসনা করিও না। তোমার দেহ দ্বারা প্রভু বহু কার্য্য সাধন করিবেন। গোঁড়ে তোমাকে দেখিবার জন্ত বহু লোক উদ্বিগ্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহা-দিগকে দর্শন করিয়া তুমি শীঘ্র বৃন্দাবনে যাও।

শ্রীনিবাস প্রভুর পাদপদ্ম হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে উৎকলের সীমানা অতিক্রম করিয়া গোড়দেশে প্রবেশ করিলেন।

পথে কোথাও দেয়ী না করিয়া শ্রীনিবাস ব্যগ্র হইয়া নবদ্বীপপ্রান্তে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। নবদ্বীপের দিকে চাহিয়া তিনি শুধু কান্দিতে লাগিলেন। শূন্য নবদ্বীপে যাইয়া তিনি কি দেখিবেন! ইহাই ভাবিয়া তিনি আর চলিতে পারেন না। পা শিথিল হইয়া আসিল। তিনি গাছতলে বসিয়া পড়িলেন। নবদ্বীপে প্রভুর অপূর্ণ বিলাসের কথা ভাবিতেছেন, আর অঝোর নয়নে রুজিতেছেন। কান্দিতে কান্দিতে তিনি ভাবিলেন,—প্রভুব লীলা দর্শন করার ভাগ্য না হউক, সেই লীলাপুত্র স্থানসমূহ যাইয়া দর্শন করি এবং সেই পবিত্র স্থলিতে গড়াগড়ি দিয়া জীবন সার্থক করি। এইরূপ ভাবিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া শ্রীনবদ্বীপে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিতেই তাঁহার অপূর্ণ দর্শন হইল। দেখিলেন, ভক্ত-গোষ্ঠী-সহ প্রভু বিহার করিতেছেন, আর নবদ্বীপাঙ্গনাগণ প্রভুর গুণ গাহিয়া ধাওয়াধাই করিতেছেন,—গৃহে গৃহে ভুবনমঙ্গল সংকীর্ণনের ধ্বনি শুনা যাইতেছে; শ্রীনিবাস দেখিলেন, নন্দীমানগর, আনন্দনগর—সর্বত্র আনন্দের ধারা বহিয়া যাইতেছে। শ্রীনিবাসের তখন আনন্দ আর ধরে না, আনন্দে তিনি আত্মবিস্মৃত হইলেন। তখন তাঁহার বে উল্লাস হইল, কে তাহা বর্ণনা করিবে! গৌরলীলা তিনি প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন, পূর্বের বিরহ-দুঃখ তাঁহার কিছুই মনে নাই। প্রভু-সে তখন অপ্রকট, ইহা তাঁহার মনেই নাই, স্মরণ্য ইহা ভাবিবার আর তাঁহার অবসর কোথায় যে, প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহার লীলা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করাইতেছেন! কিছুকাল তিনি এইরূপ আত্মবিস্মৃত হইয়া সুখ-সায়রে ভাসিতে লাগিলেন।

সুখ ও দুঃখ দুই ভাই—সাথে সাথেই চলে! দুঃখ সুখেরই সোপান—সুখ উপভোগ্য করিবার জন্তই দুঃখের সৃজন। দুঃখকে উপেক্ষা করা চলে না। দুঃখ উপেক্ষণীয়ও নহে, বরণীয়ও নহে। স্বভাবে থাকিয়া যখন যে ভাই আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহাকেই আলিঙ্গন করিতে হয়। দুঃখ,—বিশেষতঃ ভগবদ্বিরহজ দুঃখ—হৃদয়কে সরস করে। আবার যখন সুখের অভ্যাস হয়, তখন সেই সরস প্রাণ লইয়া সুখ বড়ই উপভোগ্য, বড়ই আশ্বাস্ত হয়। গৌরবিরহে শ্রীনিবাস কত ছুটাছুটি করিয়াছেন, কলসীতে কলসীতে নয়নজল ঢালিয়াছেন, কত হা-হতাশ করিয়াছেন। সেই পিতার মুখে গৌর-লীলা শ্রবণ করিয়াছেন অবধি, নরহরি-প্রমুখ গৌর-ভক্তগণের নিকট গৌর-কথা শুনিয়া তাঁহাদের আদেশ লইয়া গৌর-দর্শনে নীলাচলে গমন; গৌরের অদর্শন, আবার গোঁড়ে প্রত্যাগমন করিয়াও কালবিলম্ব না করিয়া গদাধর প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ও গদাইএর গৌরান্দের লীলা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গদাধরের মুখে শুনিয়া হৃদয় জুড়াইবার জন্ত পুনরায় নীলাচলে গমন, কিন্তু সেই গদাধরের অদর্শন হওয়ায় তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইয়া গোঁড়ে প্রত্যাগমন, পশ্চিমধ্যে শ্রীনিবাস ও সীতানাথের অপ্রকট সংবাদ প্রাপ্তি প্রভৃতিতে তাঁহার হৃদয় যে কিরূপ ভঙ্গিয়া গিয়াছিল, ইহা সহজেই অল্পমেয়; সেই অবস্থায় এখন শ্রীনিবাস শ্রীনবদ্বীপে প্রবেশ করিয়াই যখন প্রভুর লীলা প্রত্যক্ষ করিলেন,—সেই নিতাই, সেই শ্রীঅদ্বৈত, সেই শ্রীবাস পণ্ডিত, সেই সকল ভক্তগোষ্ঠী, সেই নবদ্বীপাঙ্গনাগণ; তখন আর তাঁহার দেহ-স্বত্তি ছিল না, তিনি আর ইহলোকে ছিলেন না, নিত্য নবনবায়মান গৌর-লীলাসায়রে ডুবিয়া গেলেন। কিন্তু তাহা কতক্ষণ! আবার তাঁহাকে বিরহ-সাগরে ডুবাইতে হইবে। লোহকে পোড়াইয়া আবার তাহাকে জলে ডুবাইতে হয়, আবার পোড়াইতে হয়, তবে ত গড়ন ঠিক হয়। শ্রীনিবাসকেও এমনভাবে গড়িতে হইবে বেন তাঁহা দ্বারা মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, মায়াবাদ ও ভক্তিবিরোধী অত্যাচার মতবাদ খণ্ডন করিয়া বিশুদ্ধ গৌরধর্ম—বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম, সহজ হরিনাম প্রচারে জীবের জীবন ধন্য হইতে পারে। তাই, কিছুকাল পরে সেই মধু-নিস্যন্দী শ্রীগৌরলীলা শ্রীনিবাসের চক্ষুর অন্তরালে

লুকাইলেন। শ্রীনিবাস দেখিলেন, সেই সাধের নবদীপ নিরানন্দময়। তরুলতা, পশুপক্ষী, লোকজন সকলেই গৌরবিরহে ম্রিয়মান।

.. শ্রীনিবাস কি আর করিবেন! অশির জলে ভাসিতে ভাসিতে, পথের পরিচয় লইয়া এক-পা ছই-পা করিয়া ধীর গমনে প্রভুর বাড়ীর দিকে চলিলেন। শ্রীনিবাস এখন কোথায় যাইতেছেন? না—প্রভুর বাড়ী। যে তাঁহার হৃদয়ের দেবতা, যিনি তাঁহার প্রাণ-সর্বস্ব, সেই প্রভু যেখানে চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত ভুবনমঙ্গল সর্বলোকহরঞ্জন লীলা করিয়াছেন, সেইখানে তিনি যাইতেছেন। যাইয়া দেখিবেন কি? এমনিই তিনি গৌরবিরহে চতুর্দশ ভুবন অন্ধকার দেখিতেছেন, সব শূন্য দেখিতেছেন, তার উপর আবার সেই প্রভুর বাড়ী যাইয়া তিনি কি দেখিবেন? তবু তিনি যাইতেছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাঁহার শ্লোকষ্টকের সপ্তম শ্লোকে বলিয়াছেন—

যুগ্মায়িতং নিমেষেণ, চক্ষুশ্চ প্রাব্ধায়িতম্।

শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥

গোবিন্দ-বিরহ কি বিষমবস্তু, তাহা প্রভু এই শ্লোকে যেমন বলিলেন, কার্যতঃ তাহা দেখাইলেন। সেই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য আর বর্ণনার কাজ নাই। আর এখন তাঁহারই শক্ত্যবেশাবতার শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুদ্বারা দেখাইতেছেন—গৌরবিরহ আরো কি বিষম জ্বালাময় বস্তু। কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধে বলা হয় যে, তপ্ত ইক্ষু চর্চনে মুখ জ্বলে, তথাপি উহা এত মিষ্ট যে ছাড়া যায় না। কৃষ্ণপ্রেমও তদ্রূপ। আর এই গৌরপ্রেম-বস্তুটা যে ততোধিক, বালক শ্রীনিবাসকে দিয়া তাহা দেখাইতেছেন। বালক শ্রীনিবাস গৌরবিরহে বার বার ভুবন অন্ধকার দেখিতেছেন, তবু এমন নিষ্ঠুরকে তিনি ছাড়িয়া দিলেই ত পারেন! না—তাহা নয়, তথাপি তিনি প্রভুর আবাসভূমির দিকে যাইতেছেন।

শত সংস্কৃত শ্লোক প্রমাণে যা না হয়, শুদ্ধ প্রেমের অম্লশীলনে তাহা সহজে সম্ভবপর হয়। প্রেম বস্তুটা দেখা যায় না। প্রেমিককে দিয়াই প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রভু একদিকে যেমন কৃষ্ণলীলার সরসতা নিজে আনন্দান করিয়াও অপরকে আনন্দান করাইয়া বুঝাইয়াছেন, তেমনই অন্যদিকে আবার তৎসঙ্গেই বিরহ স্বজন করিয়া গৌরলীলা ও গৌরপ্রেমের ততোধিক সরসতা ও সর্বাতিশায়িতা শচীমা, বিষ্ণুপ্রিয়া ও পার্শদগণদ্বারা বুঝাইয়াছেন, এবং অপ্রকটকালে আবার গৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈতের অশক্ত্যাবেশাবতার শ্রীনিবাস নরোত্তম ও শ্রামানন্দকে দিয়া উহা আরো পরিষ্কৃত করিয়াছেন। প্রভু ইহা কিরূপে করিলেন, দেখা যাউক।

সনাতন-শিক্ষায় প্রভু বলিয়াছেন—

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।

শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ২২ পরিচ্ছেদ ৫৬ পয়ার।
অর্থাৎ, কৃষ্ণপ্রেম বস্তুটা নিত্যই সিদ্ধ, বাহির হইতে সাধন করিয়া আনিতে হইবে না, লীলাশু শ্রবণকীর্তনাদি দ্বারা আপনা হইতে উদ্ভিত হয়। শ্রীনিবাসকে দিয়া প্রভু দেখাইলেন যে, শ্রীনিবাস গৌরলীলা শুনিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার গৌরাঙ্গে অম্লরাগ জন্মিয়াছে; তাই তিনি গৌরপ্রেমে পাগলের মত ছুটীছুটি করিয়াছেন। শ্লোক আওড়াইয়া গৌরপ্রেম পান নাই। শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও লীলা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার অনেক পরে,—যখন তিনি গোড়দেশ ভ্রমণ করিয়া পরে শ্রীরূপাবন গিয়াছিলেন তখন। এই প্রবন্ধেরই শেষে তাহা বর্ণনা করিবার ইচ্ছা রহিল। প্রভুর এই লীলা-দ্বারা ইহাই শিক্ষার বিষয় যে, তর্কের কচকচি ছাড়িয়া দিয়া সর্বচিত্তাকর্ষী শ্রীগৌর-লীলা কাহিনী জগতের সম্মুখে উপস্থিত কবিলে, তাহাতে জগতের যেকোন উপকার হয়, শত সংস্কৃত শ্লোক প্রমাণ দ্বারা তাহা হইবে না। বাঁহারা গোষ্ঠামিগণের পরিবার বলিয়া পরিচিত,—বাঁহাদের উপর গৌরধর্ম প্রচারের ভার রহিয়াছে, শুধু তাঁহারা কেন, বাংলার গৌরব বাদ্বালীর গৌরব শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর লীলামুখা বিস্তরণ করিয়া বিশ্বের কল্যাণসাধন করা প্রত্যেক বাদ্বালী মাজেরই কর্তব্য,—শুধু বাদ্বালী কেন, প্রত্যেক ভারতবাসীর; আর শুধু তাহাই বা কেন,—যিনিই এই লীলামুখী আনন্দান করিয়াছেন তাঁহারই ইহা জগতের গোচর করা কর্তব্য।

জগতে বৈষ্ণব-ধর্ম শ্রেষ্ঠ কেন ?

(মহাত্মা শিশিরকুমার)

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট। গোপীগণ সেখানে যাইয়া দেখেন যে, ষাঁহাকে তাঁহার প্রাণ-বন্ধু বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহার ঐশ্বর্যের সীমা নাই। কারণ তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বাভাবিক বেশ ত্যাগ করিয়া মণিমুক্তার বিভূষিত হইয়াছেন, এবং মরকত-তুর্কাদল আসন ত্যাগ করিয়া বহুমূল্য সিংহাসনে উপবেশন করিয়া আছেন। চারিদিকে প্রহরীরা তাঁহার দেহ রক্ষা করিতেছে। মন্ত্রী, সভাসদ ও প্রজাগণ চতুর্দিকে দাঁড়াইয়া তাঁহার তুষ্টির জন্ত স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিতেছে। ইহা দেখিয়া গোপীগণ বিজ্ঞপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, যথা গীত—

“সেত আমাদের, ব্রজের চূড়া দে,
সেত গরব করে বলি, সেত আমাদের,
(চূড়া ত মথুরার নয়,)
চূড়া দে, মুরলী দে,
মা যশোদার পীতধরা দে,
মাধায় বহা নন্দের বাধা দে,
শ্রীদামের পাচনী দে,
(ওহে নিষ্ঠুর বধু হে)
আর আমার রাইয়ের গাঁথা বনমালা দে,
দিগে পীরিতি ফিরায়ে দে।”

এই গীতের তাৎপর্য এই যে, মথুরার রাজা শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকে জগতের লোকে ভজনা করিয়া থাকে। সে শ্রীকৃষ্ণ ক্রীকৃষ্ণ, না বরদাতা ও দণ্ডদাতা। প্রজার সহিত দোষিও প্রতাপাশ্রিত মহারাজের যেরূপ সম্বন্ধ, জীবের সহিত তাঁহার সেইরূপ সম্বন্ধ। গোপীরা বলিতেছেন, তুমি এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ছিলে, লোকে তোমাকে কেবল ভয় করিত, আর স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত তোমার ভজনা করিত। কিন্তু আমরা জানিলাম যে, তুমি প্রকৃতপক্ষে মধুর প্রকৃতি, সরল, নিঃস্বার্থ-প্রেমের কান্দাল। তাই আমরা তোমার মাধায় পাগের স্থানে ময়ূরপুচ্ছ পরাইলাম, গলায় গুঞ্জাহার দিলাম, তোমার নৃত্যের শোভার নিমিত্ত তোমার পায়ে হুপূর দিলাম, আর

গীতে জগৎ যুদ্ধ করিতে পারো ইহা দেখাইবার জন্ত তোমার হস্তে মুরলী দিলাম। এইরূপে পরম সুন্দর চিত্তরঞ্জনরূপে সাজাইয়া তোমাকে আমাদের সমুদায় চিত্তখানি দিলাম। আর তাহার পরিবর্তে তোমার মুখে বেণুবাদন শুনিলাম, আর তোমার নৃত্য দর্শন করিলাম। এখন দেখিতেছি যে, তুমি আবার সেই ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করিয়াছ। অতএব আমাদের দস্তা যে চূড়া, মুরলী ও পীরিতি তাহা আমাদের কাছে ফিরাইয়া দাও। যেহেতু এ সব দ্রব্যের মূল্য মথুরার লোকে অসম্ভব করিতে পারিবে না।”

তারপর গোপীরা বলিতেছেন, যথা গীত—

“রাজসেবা বাস ভাল, ব্রজ ভাল লাগে না।
অবোধিনী গোয়ালিনী, আমরা শ্লোক-শাস্ত্র জানি না।
পিরীতি সর্বস্বধন, স্তব-স্তুতি জানি না।
সরলা অবলা বালা, আমরা কপটতা শিখি না।
রতনে ভূষিত তুমি কি দিব তার ভুলনা।
কান্দালিনী বনে থাকি, হীরা মতি চিনি না।”

“তুমি এই রাজ্যের রাজা হইয়াছ। আমাদেরও হৃদয়-রাজ্যে একজন রাজা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সাজ-সজ্জা ব্রূপ ছিল না, যথা গীত—

“আমাদের রাজপাট কদম্বতলা।
(যা’র ডালে বসি বাজু’ও বাঁশী)
ব্রজের রাজা চিকন-কালা,
তা’র সজ্জা-ভূষণ বনমালা,
(বনফুলে তারে সাজাতাম,)
আর, হৃদসিংহাসনে রসের বালিসে—শোয়াতাম
তাকি জান না ?
আদরে-পীরিতে রাখিতাম যতনে,
আমরা লোকিকতা জানি না।”

গোপীগণের এই উক্তি দ্বারা শ্রীবৈষ্ণবের ধর্ম কি তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়। জগতের ধর্ম একরূপ, আর বৈষ্ণব-ধর্ম অপরূপ। আর একটু চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, যদি ধর্ম বলিয়া প্রকৃত কোন-পদার্থ থাকে, তবে তাহা বৈষ্ণব-ধর্ম। এই নিমিত্ত ব্রহ্মাও গোপীদের পদরক্ষ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

Free Translation

By Bidhu Bhusan Sircar

নাচত ধীরি ধীরি গৌরবর রতনা ।	The highest end of human life it gives,
ভকতকলপতরু কলিমদমথনা ॥	Evokes the love Devout that never leaves.
গরগরভাবে তরু পুলকিত সঘনা ।	Emotion makes His Body shiver oft
নিজ শুণে নিগূঢ় প্রেমরসে মগনা ॥	That lifts the human heart so high aloft.
ভাবে বিভোর পোর ঝরু নয়না ।	Absorb'd is He in Blissful Love Supreme
নিরবধি হরি হরি বোলত বয়না ॥	While tears are trickling down His cheeks
গড়ি গড়ি ভূমে করত কত করুণা ।	in stream
শ্রীপদকুসুম সুকোমল অরুণা ॥	His lips are ever utt'ring Haribol
অঙ্ক-ভব-আদি সতত করু ভাবনা ।	Connoting simple ways to human goal.
করু কবি শেখর সো পদ সেবনা ॥	At times He rolls on the ground with
My Gour doth dance divine how gentle sweet !	piteous cry
With Love and Bliss and Beauty all replete !	That rends the heart of all the people by.
The dance dispels the crude and wicked sway	His tender feet of reddish primrose hue,
Of Present Age—corruption flees away	Devoutly sought, with purest love imbue.

পিপাসা

শ্রীচুলাল চন্দ্র মিত্র

ভুবন ছুড়িয়া হেরি গো তোমার
রয়েছ, হে স্বন্দর ।
গগনে পবনে তোমারই বারতা
শুনি আমি মনোহর ॥
নদী বহে যায় কুলু কুলু গাহি
তোমারই মহিমা-গীতি ।
তোমারই হাসিটী ফুটানে তোলে গো
এমনই ফুলের রীতি ॥
পিপাসা আমার ঘোচে না তো তবু
যত হেরি, যত শুনি ।
পিপাসিত চিত তবু খোঁজে তোমা
কোথা সখা ! কোথা শুণী !

শ্রীগৌরাজের পূর্ববরাগ

স্থান—প্রভুর শয়নকক্ষের সংলগ্ন মাধবীকুঞ্জ
শ্রীগৌরাজ একাকী—

সেই আনন্দের কাছে কমলকানন
মানে পরাভব, সে প্রসঙ্গ শতদল
ভাসিছে সতত মানস-সরসে মোর,
কি নিম্ন জ্যোতিঃ উজ্জিরায দশদিক,
দশেন্দ্রিয় মোর চাহে মানসে পশিতে
এককালে, যেন সেই মাধুর্যের ধূম্য
পারে আশ্বাদিতে পূর্ণরূপে, মনে হয়,
সে মাধুর্যের কণা নিয়ে বিশ্বের মাধবী;
কিবা লাভ্যের ধারা বহে শতধারে।
লাভ্যের সে আভাষ লাভ্য বিশ্বের।
পঙ্কবিছাধরে কিবা সমধুর হাসি।
লহরে তাহার উল্লসিত আনন্দের
স্থির-সিদ্ধ। নয়নের ভঙ্গী কি মধুর!
নিম্ন চাহনিতে বিচ্ছুরিত প্রেমরশ্মি।
প্রেমানন্দঘনমুষ্টি সেই ছবিখানি।
কিবা সে সুন্দর চিকণ চিকুরদাম।
সুচিকণ গণ্ডস্থল। কিবা দিব্য ভূষণ!
অপ্রাকৃত তুলিকায় চিত্রিত সে ছবি।
মনোহর অঙ্গকাস্তি। সুবর্ণের দ্যুতি
লাজ পায় সে দ্যুতির কাছে। চন্দ্রমার
সুশীতল নিম্ন দ্যুতি নহে তার এক কণ।
সব (ই) অভুলন, সব (ই) প্রাণ-মনোহারী!
অনন্ত সৌন্দর্য আর মাধুর্যের দ্বার
বুঝি সে মূর্তিখানি। প্রতি পলে পলে
আকর্ষিছে মোরে নিত্য নব নব ভাবে।
করিছে সদাই জুসে সে রূপ বিলাস।
যে দিকে নিরখি, দেখি সে রূপ ঝলক।
নূতন জগতে আমি করিহু প্রবেশ
দেখি প্রেম দিয়ে গড়া সারা বিশ্বখানি।
বিহগ বিহগী হেরি যবে, প্রেমধারা

বহে দু'নয়নে। শ্রীমায়ের স্নেহ আরো
লাগে মধুময়। ছাত্রদের অধ্যাপনা
করি যবে, মনে হয়,—তারা ব্রাহ্মসম,
তারা মোর খেলার সহায়। তাহাদের
শ্রীতি-ব্যবহার বড় মধুময় লাগে।
মধু, মধু, অতিমধু, মধু হ'তে আরো
মধুময় হেরি সব। দর্শন প্রভাবে
বার হেন মধুময় করিল আমারে,
না জানি মিলনে আরো কত মধু আছে।
(গদাধরের প্রবেশ)

গদাধর—কি হে! আজ বুঝি অনধ্যায় তিথি!
অধ্যাপনা নেই; তাই বুঝি একাকী ব'সে নীরবে অধ্যয়ন
হচ্ছে

শ্রীগৌরাজ—হাঁ, অধ্যয়নই বটে। (স্বগত) অধ্যয়নই ত
হচ্ছে। অধ্যয়ন—অধি—অধিক্যেন অয়নং গমনং
অথবা অধি—অধিকৃত্য সর্বাণি ইন্দ্রিয়াণি অয়নং
গমনং তাইত। সখা ত আমার মিথ্যা বলেনি! সব
ইন্দ্রিয়কে নিয়েই ত আমার মন সেখানে যাচ্ছে। না—
তা-ই বা কই! আমি ত যাইনা। সে যে আমার নিয়ে
যাচ্ছে। সেই ত আমার শেখাচ্ছে, জগতের প্রতিবস্তুতে
একটী নতুন ভাব দিচ্ছে—জগৎখানা আমার কাছে নতুন
ক'রে ধরিয়ে দিচ্ছে। তাই মনে হয় সে চিরনবীন। আমিও
যে তারই জুড়ে নবীন হ'য়ে যাচ্ছি। সে-ই ত আমার কত
ভাবের তরঙ্গের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং অধ্যয়ন
না হ'য়ে অধ্যাপনাই হচ্ছে। না—সখা ত বলেছে অধ্যয়ন।
হাঁ তাইত। আমার পক্ষে অধ্যয়নই হচ্ছে, আর সে অধ্যাপনা
কচ্ছে। এ হেন অধ্যাপক কি আমার চিরসাথী হবে!
এ হেন অধ্যয়ন-রসে কি আমি চিরনিমগ্ন থাকতে পারব।
জাঁ। অধ্যয়ন। হাঁ অধ্যয়নই বটে। অয়নং গমনং
অধিকৃত্য অবস্থানং। আমি ত ঠিক পথ ধ'রেই দাঁড়িয়েছি।
এবে বিশুদ্ধ ভাবের পথ—সাধুর প্রেমের পথ। সেই পথেরই

ত পথিক হয়েছি। এ পথের পরিচালক হচ্ছে—সেই স্থির
প্রোজ্ঞ প্রশান্ত সৌম্য প্রেমমুগ্ধিতানি। আহা!

সে নয়ন-ভঙ্গী দেখাইল মোরে এই

সহজ সুন্দর পথ—বড় সুখময়।

আমি তার হ'য়ে পারিব কি চিরকাল

এ পথে চলিতে! সে কি হবে চিরসঙ্গী;

জীবনের ঞ্জবতারা পারিব করিতে!

গদাধর—কি সখে! চুপ্ ক'রে রইলে যে?

শ্রীগোরাঙ্গ—হাঁ চুপ্ করবার কথাই ত বটে! বতো বাচো

নিবর্ত্তে। (স্বগত) যতো বাচো নিবর্ত্তে—

যেখানে থেকে কথা নিবৃত্ত হয়—সব কথা ফুরিয়ে

যায়। কই! আমার ত এখনো কথা ফুরাল

না! এখনো ত আমি বাইরের কথা নিয়ে

আছি। পড়ুয়াদের নিয়ে কত বাইরের কথা

কই! সে ত কোনো কথা কইলনা। নীরব

ভাষায় ভাবের লহরী তুলে চকিতের মত চ'লে

গেল। সেই নীরবতার মধ্যে কত অনন্ত ভাব

নিহিত রয়েছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে সে আমার ভিতরে

কত অনন্তভাব সঞ্চার ক'রে দিয়ে গেল।

তখন থেকে প্রাণে কত শত ভাবের স্পন্দন অহুত

হচ্ছে। ভাবের আলোড়ন নহে—মৃদুমধুর স্পন্দন।

এ স্পন্দনে অনাবিল সুখ—

সে যে ভাবের অধুধি—ভাবঘনমুগ্ধি

পরিপূর্ণ ভাবময়ী, তারই ভাব নিয়ে

বিশ্ব ভাবময়। কবিতাব, স্থিরচর

জীবজন্তু সবই ভাব, তার কেন্দ্রে সেই

মহাভাব। ধীর তরঙ্গ সে-ভাবের

স্পন্দিত করেছে মোরে। একান্ত আশ্রয়

কছু পারিব করিতে সেই মহাভাব।

গদাধর—কিহে! কতদূর ব'লে যে আর বন্ধে না।

শ্রীগোরাঙ্গ—আমার আর বলবার পালা নেই।

গদাধর—তোমার বুদ্ধি ভাববার পালা।

শ্রীগোরাঙ্গ—হাঁ তা-ও ত বটে।

(গুন্ গুন্ করিয়া গান)

(স্বগত) ভাবিই বা কই! সে ভাব সমাধি কই।

ভাব'তাম যদি সে ভাবিনী তবে কি আর কথা কই।

সে যে মোর হৃদয়ের বাণী

কেড়ে নিল প্রাণখানি

তবু আমি তারে ছেড়ে দূরে দূরে রই।

আমার সেভাব সমাধি কই

ভাবনার নির্বি বটে

আঁকা মোর চিত্তপটে

মাঝে মাঝে তবু কেন তারে ভুলে রই

আমি তারে ভাবি কই।

সে ভাব সমাধি কই।

ভাবিনীর ভাব নেব

তারি ভাবে ডুবে রব

কত ভাব'না কচ্ছি মনে, আশা সফল হ'ল কই।

তারে আমি ভাবি কই?

(ভাবস্থ)

(নরহরির প্রবেশ)

নরহরি—(গদাধরের প্রতি) আজ অনধ্যায় তিথি পেয়ে
ঈশ্বকে নিয়ে একলাটি ব'সে রসাস্বাদন হচ্ছে।

গদাধর—তোমাদের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তোমরা এই
ক'রো যেন সখাকে নিয়ে চিরজীবনটা রসাস্বাদন ক'রেই
কাটাতে পারি।

নরহরি—তা ভাই কাটাও, তবে আমাদের একটু ভাগ
দিতে—ভাগ না দাও—অবশেষ দিতে দোষ কি?

গদাধর—হাঁ তা নাও, খুব নাও। আমাদের অবশেষ
ভাল ক'রেই লও আমি ত আর পাচ্ছি নে।

নরহরি—কেন, কি হয়েছে?

গদাধর—আমি এসে দেখি একা একা কি যেন
বলছেন, আমি কোন কথা কইতেই সামান্ত একটু উত্তর
দিগেই আবার আপন মনে কি যেন বলেন। পরে আমি
জিজ্ঞাসা করলেম চুপ্ ক'রে রইলে কেন? তার উত্তরে তিনি
বললেন চুপ্ করবার কথাই বটে, এই ব'লে শ্রুতির বচন
বল্লেন—যতো বাচো নিবর্ত্তে।

নরহরি—তারপর—

গদাধর—এই ব'লেই আনমনে কি যেন ভাব্তে
লাগলেন ।

নরহরি—তারপর তুমি কিছু করলেনা ?

গদাধর—আমি বললাম এতদূর ব'লে আর বল্লে না যে ?
আবার তিনি ভাবস্থ হলেন এর পূর্বে কি যেন শুন্ শুন্ করে
গাইলেনও ।

নরহরি—গদাধর, তুমি স্থিরানুকূল । আমি একটু
প্রতিকূল হ'য়ে দেখি, তাঁকে প্রকৃতিস্থ ক'রতে পারি কিনা ।

(প্রভুর নিকটে যাইয়া) প্রভু, ভাব্লে কি হবে ?

অপ্রাপ্য মনসা সহ

শ্রীগোরাঙ্গ—তবে কি সে প্রাপ্য ? মন কি তবে ছেড়ে
দিতে হবে ?

নরহরি—না ছেড়ে দিতেও হবে না, ধরতেও হবে না ।
স্বভাবে থাকতে হবে ।

শ্রীগোরাঙ্গ—তবে কি আমি অভাবে আছি । হ'
তাইত ! আমি অভাবেই ত আছি । তাই ত নরহরি ।

সব শূণ্যময় হেরি সকলি অভাব,
সে ভাবমুরতি বিনে সকলি অভাব ।
ক্ষণপূর্বে ভাবময় হেরিহু সকল
তুমি ভাই এসে মোর ভাঙ্গিলে চমক
ভাব যদি সিদ্ধ হয় বাহির অন্তর
একভাবে বিভাবিত রবে নিরন্তর
অন্তরে নেহারি যারে বারিারে হেরিনা
ভাবনিষ্ঠা নাই, শুধু ভাবের ছলনা ।

নরহরি—আমি তা বলিনি । আমি বলেছি স্বভাবে
আপনা হ'তে সব মিলে ।

শ্রীগোরাঙ্গ—বলহে কেমনে স্বভাবে রই !

ওহে নরহরি সে প্রেমকাণ্ডারী
বিনে কেমনে স্বভাবে রই !
সে-ই ত আমার স্বভাব স্তম্ভর
তাহারি মিলনে পূর্ণ হই !

সে ছাড়া আমার সকলি আমার
শূণ্য পরাণে কেমনে রই !

সে চারু নয়ান হরি নিল প্রাণ
আমি ত এখন আমার নই ।

বলনা কেমনে স্বভাবে রই ।
কহিতে না পারি না কহিলে মরি

আপন জানিয়া তোমারে কই
শুন নরহরি সে রূপ-মাধুরী

ত্রিভুবনে তার তুলনা নাই ।
বড় সাধ করে সে রূপ-সাগরে

নিশিদিন সদা ডুবিয়া রই
শ্রীঅঙ্গ তাহার রসের আধার

সাধ হয় তার আশ্রয়ে রই
তারি প্রেমে ভাসি তারি প্রেমে মিশি

তাহারে সঙ্গিনী করিয়া লই
তার প্রেমবিহনে কি কাজ জীবনে

দেহভার মাত্র বৃথা বই
মুদিলে নয়ন হেরি সে বয়ান

আনন্দ উথলে পাইনা থই
মেলি যদি অঁখি আর না নিরখি

নিমেবেতে তারে হারা হই
রমণী রঞ্জন নাহি বুঝে মন

শুধু যে প্রেমের সাগর বই
বলহে কেমনে হেন প্রেম বিনে

এ শূণ্য পরাণে বাঁচিয়া রই !
নরহরি— বিরহ মিলন দৈবের ঘটন

স্থির হও বঁধু মোর ।
সে হয় তোমার তুমি হও তার

সম্বর অঁখির লোর ।
গদাধর—চল, আমরা একটু বেড়িয়ে আসি

নরহরি—চল

শ্রীগোরাঙ্গ—হঁ চল ।

স্মৃতি

(পূর্বস্মরণ)

শ্রীজ্ঞানীকান্ত ভৌমিক

(৯) গোকুল বাবু চাঁদপুরের নিকটে পাইকপাড়া হাই-স্কুলের মাস্টার ছিলেন। একবার তিনি ত্রিশ হইতে বাড়ী রওনা হইবার সময় শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া আর উঠিতে পারেন না। হাত পা যেন ভাঙ্গিয়া আসিল। শ্রীমার মুখের দিকে চাহিয়াই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “মা, যাই কোথায়?” সে কি করুণ ক্রন্দন! কি আশ্চর্য! উপস্থিত সকলেই নয়নজলে ভাসিতে লাগিলেন। অল্প বয়স্কা বালিকা শ্রীমার নিকট হইতে ঋণুরালয়ে যাইবার সময়ও এরূপ করুণ ক্রন্দন করেন। মধ্যে মধ্যে গোকুলবাবু উদাস নয়নে ক্যাল ক্যাল করিয়া চাহিয়া থাকেন, আর মাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে এই ভাবিয়া যেন জিজ্ঞাসু শূন্য দেখিতে লাগিলেন। আবার করুণ চীৎকার, আবার বৃশ্চিকদংশন ব্যক্তির শ্রায় ধূল্য ছটফট করিয়া গড়াগড়ি। এ দৃশ্য ভাবায় ব্যস্ত করা অসম্ভব। সকলেই ন যবো ন তন্তো—স্তব্ধ, স্থির, নয়নজলে সিক্ত।

(১০) একবার কলিকাতায় শ্রীদাদার বাসায় বিধুবাবু গঙ্গাশ্রান করিয়া আসিয়াছেন। দাদাও এক সঙ্গেই শ্রান করিয়া আসিয়াছেন। তিনি পা ধুইয়া ঘর হইতে জল আনিয়া বিধুবাবুকে পা ধুইতে দিলেন। বিধুবাবু সঙ্কুচিত হইলেন। দাদা জল দিবেন তা দিয়া তিনি পা ধুইবেন।

সাহস হইল না। শ্রীদাদা কহিলেন “গঙ্গাজল দিয়ে পা ধুইতে পারিবে। আর আমি ছুইলেই দোষ।” শ্রীদাদার গভীর রেহে বিধুবাবুর সকল সঙ্কোচ সকল ভয় মুহূর্তে দূর হইল। তিনি ঐ জল দিয়া পা ধুইলেন। ভারী দিয়ে ঘরে গঙ্গাজল তুলিয়া রাখি হইত।

(১১) কান্দালিনী একবার শ্রীদাদাকে একখানি করুণ চিঠি লেখেন। ইহার নাম ইন্দুমতী দত্ত। মা তাঁহার নাম রাখেন কান্দালিনী। হেতু—তিনি বালবিধবা। তাঁহার স্বামী বি-এ পরীক্ষা দিয়া, পাশের খবর না জানিয়াই মারা যান। ইনি পিরোজপুরের খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুত কালীবর দত্তের ব্রাতৃপুত্রবধু। ইনি ও ইহার শাশুড়ী নদীয়ায়ুগল সেবায় শ্রিয়াজীর প্রত্যক্ষ কৃপা বহু উপলব্ধি করিয়াছেন। তাহা যিনি জানেন, তিনি কৃপা করিয়া জানাইলে জীবের কল্যাণ হইতে পারে। * বা হোক, কান্দালিনী দুঃখ করিয়া দাদাকে লিখিয়াছেন যে, ঐ একবার পিরোজপুরে তাঁহাদের দর্শন পাইয়াছেন। তাঁহার অবলা, শ্রীশ্রীমাদাদা কৃপা করিয়া আবার পিরোজপুরে গিয়া দর্শন না দিলে তাঁহার বাচেন কিরূপে? ইত্যাদি অনেক করুণ-কাহিনী। বিধুবাবু চিঠিখানি পড়িয়া দাদা-মাকে শুনাইলেন, এবং তিনি এতই মুগ্ধ হইলেন যে শ্রীদাদাকে কহিলেন, “সত্যই ত

* কালীবর বাবুর পত্নী আমাদের কাছে লিখিতেছেন—“একদিন বেলা দুইটার সময় আমি ও কান্দালিনী এক ঘরে শুইয়া আছি। বাসায় আর কেহ ছিল না। আমার একটা এক বছরের মেয়েকে ঘুম পাড়াইয়া অস্ত্র একঘরে খাটের উপর শোয়াইয়া রাখিয়াছিলাম। সে ভাল করিয়া হাটিতে পারে না। ঐ সময় জোয়ারেব জলে উঠান উবিয়া গিয়াছিল। আমি ঘুমাইতেছিলাম, কান্দালিনী বই পড়িতেছিল। মেয়েটী কাঁদিয়া উঠিল—আমার ঘুম ভাঙ্গিল, কিন্তু ঘুমের আবেশ যায় নাই। শুনিলাম কে যেন মেয়েটীকে গায়ে ধান্ড়াইয়া ওঁ ওঁ শব্দে ঘুম পাড়াইতেছে। কিন্তু মেয়ে যখন আর ধান্দি না, তখন কে যেন মেয়েটীকে, আমরা যে ঘরে শুইয়াছিলাম, সেই ঘরের বারান্দায় ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। সেই ঘর হইতে আমাদের ঘরে উঠানের জল ভাঙ্গিয়া আসিতে হয়। তাহার আসিবার শব্দও কিছু শুনিলামনা বটে, কিন্তু মেয়েটীকে দেখিয়া তাকে উঠাইয়া লইলাম। ভাবিলাম, মেয়েরা বুঝি টিফিনের ছুটিতে বাসায় আসিয়াছিল, এবং তাদের কেহ ঐ ছোটমেয়েটীকে রাখিয়া স্কুলের সময় হইয়াছে বলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গিয়াছে; তাই মেয়েদের কাঠকেও দেখিলাম না। পরে ৪টা ঘরের ছুটি হইলে মেয়েরা বাসায় আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম তাহারা কেহ বাসায় ইহার পূর্বে আসিয়াছিল কিনা। তাহারা বলিল, “না ত।” আমাদের আর বুঝিতে বাকী রহিলনা যে, শ্রিয়াজীই আমাদের স্নেহের লাগিয়া স্বয়ং এই কার্য করিয়াছেন।” —সম্পাদক।

লিখেছেন! তাঁরা ত অবলা। তোমাদের আবার পিবোজ-পূর একবার যাওয়া উচিত।” শ্রীদাদা কহিলেন, “কেন! তুমিই ত মাকে সস্তা করেছ। তিন আনার পরসায়ই ত মাকে পাওয়া যায়।” সেই সময় শ্রীশ্রীমাদাদার ঐপট তিন আনা মূল্যে বিক্রী হইত। ঐচিহ্নবিগ্রহের মধ্য দিয়া বস্তুর প্রকাশ যে সহজ, ইহাই সম্ভবতঃ শ্রীদাদার কথার অভিপ্রায়।

(১২) বিধুবাবুর সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আশুবাবুর দ্বিতীয় বারের পক্ষী মারা গেলেন। শ্রীদাদা তাঁকে দাদা ডাকিতেন। বিধুবাবুকে শ্রীদাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, “দাদা

কি আবার বিবাহ করেছেন?” উত্তর পাইলেন “হাঁ”। শ্রীদাদা একটু বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, “আবার বিয়ে কল্লেন!” বিধুবাবু কহিলেন, দাদা স্বপ্নে দেখিলেন, কোন এক শুহের মেয়ে তিনি বিবাহ করিতেছেন। আর সত্য সত্যই সেই শুহ আসিয়া সখন্ধ লইয়া উপস্থিত। বিবাহ হইয়া গেল। সম্ভবতঃ ইহা বিধাতারই পূর্বনিরূপিত বিধান।” শ্রীদাদা কহিলেন, “বিধির লিখন যায় দূরে।” ইহা কহিয়াই নীরব রহিলেন। অল্প-কথায়ই তিনি পুরুষকার ও দৈব বুঝাইয়া দিলেন।

মহাত্মা শিশিরকুমার ও পণ্ডিত কালীময় ঘটক

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা (মাসিক) ৬ষ্ঠ বর্ষে রাণাবাট নিবাসী খ্যাতনাগা সাহিত্যিক (বর্তমানে পরলোকগত) পণ্ডিত কালীময় ঘটক মহাশয় “শ্রীশিশিরকুমার ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা” শীর্ষক প্রবন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকার কথা উল্লেখ করিয়া শেষে লেখেন :—

যে সকল গুণে শিশিরকুমার সংসারে এতাদৃশ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, সে সকল গুণের মুকুটমণি স্বরূপ তাঁহার আর একটা গুণ আছে, এখন সেই গুণের কথা বলিব। সেই গুণ—তাঁহার প্রতি শ্রীভগবানের কৃপা। এই কৃপাবলেই তাঁহার জীবনে নানা প্রকাব পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। তিনি নাস্তিক্য, নির্বিশেষবাদ, প্রেততত্ত্ব, পৌত্তলিকতা, প্রভৃতি নানাবিধ মতবাদের আলোচনা করিয়া পরিশেষে নিমানন্দ, অর্থাৎ অমিয়নিমাই চরিতার্থবে নিমগ্ন হইয়াছেন। শ্রীভগবান কৃপা করিয়া তাঁহাকে সকল দিক দেখাইয়া এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, মানব-জীবন কৃতার্থ হইবার জন্য জগতের আর কোথাও কিছু নাই, বাহা থাকিবার তাহা আছে ‘শ্রীঅমিয় নিমাই চরিতে’।

উচপদ অণুবীক্ষণ-স্বরূপ,—তাঁহাতে ক্ষুদ্রবস্তুর বৃহৎ দেখায়। শিশিরবাবুর গৌরপ্রেমের আয়তনকে বৃহৎ করিবার জন্য তাঁহার উচপদকে অণুবীক্ষণ হইতে হয়

নাই, তাঁহার উচপদ সোনার সোহাগা হইয়াছে। যেহেতু তদ্বারা অনেক বহিষ্কৃত জীব কৃতার্থ হইয়াছে। ঘটকলায় চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত চিরকালই ছিল এবং অনেক দীন-দুঃখী বৈষ্ণব-বৈরাগীও নিতাই-গৌরকে চিনিতেন। কিন্তু শিশিরবাবুর গৌরভক্তি হওয়ার পূর্বে নিতাই-গৌরের নামে এমন জোর ডঙ্কা বাজিয়াছিল কি? তাই বলিতেছি শিশিরবাবুর উচপদ ও গৌরপ্রেম, যেন মণিকাঞ্চনের যোগ হইয়াছে।

শিশিরবাবুর দ্বারা যে অনেক বহিষ্কৃত, গৌরদাসের পদাশ্রয় পাইয়া জন্ম সকল করিয়াছেন, আমি নিজে তাহার একটি ক্ষুদ্র গাঙ্গী! শিশিরবাবুরা যখন কলিকাতায় আসেন, তাহার পূর্বে হইতে তাঁহাদিগের সহিত আমাদের পরিচয়, এবং আমাদের প্রতি তাঁহার প্রথম হইতেই অহৈতুকী কৃপা ছিল। এজন্য তিনি আমাদের শুভাস্ততের সন্ধান লইতেন।

একদিন শিশিরকুমার আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তুমি শ্রীগৌরাদকে পূর্বব্রজ বলিয়া বিশ্বাস কর কি?” তখন তিনি গৌরপ্রেমের পাথারে ভাসমান।

আমি উত্তর করিলাম,—“আমি গৌরাদ্দের বিষয় কিছুই

ভাবি নাই। সুতরাং তোমার এ কথার উত্তর এখন দিতে পারি না।”

তাহাতে শিশিরকুমার বলিলেন,—“তবে তুমি এখানে বসিবার যোগ্য নহ, আমি তোমার মুখ দেখিব না।”

এই কথাটা তখন আমার বড়ই বাজিয়াছিল; কিন্তু কালে বুঝিলাম, শিশিরকুমার আমাকে বড় ভালবাসিতেন, এবং মাদৃশ দীনহীন ব্রাহ্মণের প্রতি বড়ই কৃপা ছিল, তাই তিনি আমাকে ঐ দণ্ড দিয়াছিলেন। ঐ দণ্ডই আমার মঙ্গল ঘট, কেন না ঐ দণ্ড হইতেই আমার গৌরাজ্জ অমূল্যলন আরম্ভ হয়। ভাগ্যদোষে আমি গৌরতন্ত্র বুঝিলাম না, গৌরপ্রেম পাইলাম না বটে, কিন্তু আমার অমূল্যলন দেখিয়া আমার অনেক সহচর ও বন্ধু-বান্ধব গৌরভক্ত হইয়াছেন,—অনেকে গৌরপ্রেম তরঙ্গে ডগমগ হইয়াছেন। তন্মধ্যে একটীর কথা উল্লেখযোগ্য। তাঁহাকে একটা ক্ষুদ্র প্রকাশানন্দ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কেন না, তিনিও ধর্ম্মরাষ্ট্রে বহুদর্শী, শঙ্কর মঠের শিষ্য, ব্রহ্মমন্ত্রী ও ২০১২৫টি শিষ্যের গুরু। তিনি আজ গৌরদাসের পদরেণু। এ সকলই শিশিরকুমারের কীর্তি!

পণ্ডিত কালীময় তাঁহার নিজের সম্বন্ধে যে আশ্চর্য্য কাহিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করেন তৎসম্বন্ধে সবিশেষ তথ্য জানিবার জন্য আমি পূজ্যপাদ শ্রীলশির কুমার বোম মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি কৃপা করিয়া যাহা যাহা বলিয়াছিলেন ভক্তপাঠকগণের গোচরার্থে তাহা শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। মহাত্মা শিশিবকুমারের সেই কথাগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছিঃ—

“তুমি যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সে বহুদিনের কথা, আমার ভাল করিয়া স্মরণ হয় না। সেই সময় কিছুকালের জন্য আমি রাণাঘাটে বাস করিতেছিলাম। আমি সেখানে গেলে পণ্ডিতপ্রবর কালীময় আমাকে অভ্যর্থনা করিতে আসেন। ইহার কারণ এই যে, তিনি প্রাচীন বন্ধু, অতি বিনয়ী, স্নিগ্ধ, বুদ্ধিমান ও মহাপণ্ডিত। তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতাম। কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস কিরূপ ছিল তাহা ইহাই বলিলে

যথেষ্ট হইবে যে, তিনি কিছুই জানিতেন না। পরকাল ও ভগবান ইত্যাদি তাঁহার নিকট উপহাসের বস্তু ছিল। আমি তখন আমার চিত্ত শ্রীগৌরাজ্জপ্রভুর পাদপদ্মে সমর্পণ করিব বলিয়া প্রাণপনে চেষ্টা করিতেছিলাম। সেই কথাই তখন আমার মনপ্রাণ অধিকার করিয়াছিল। অন্ত কোন কথা শুনিতে ভাল লাগিত না, অনেক সময় বিরক্তজনকও হইত।

আমি ভাবিলাম, আমার প্রিয়বন্ধু ঘটক মহাশয় আমার বুকের উপর বসিয়া দিবানিশি তাঁহার নাস্তিকতারূপ অশ্লীল কথা আমাকে দস্ত করিবেন। মনে মনে ভাবিলাম যে, তিনি যখন আসিবেন তখন গৌরকথা ভিন্ন তাঁহার সঙ্গে আর কোন আলাপ করিব না। সুতরাং তাঁহার নাস্তিকতারূপ বাণ প্রয়োগের অবকাশ দিব না।

ইহাই ভাবিয়া প্রথম দেখা হইলেই কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বলিলাম,—“তুমি শ্রীগৌরাজ্জপ্রভুকে কিরূপ চক্ষে দেখিয়া থাক?”

আমার তখনকার মনের কিরূপ অবস্থা তাহা তিনি কিছুই জানিতেন না, জানিলে হয়ত সতর্ক হইয়া উত্তর দিতেন। তাহা না জানিয়া যে উত্তর দিলেন তাহা শুনিয়া আমার ক্রোধ হইল। তখন আমি বলিলাম,—“গৌরকথা ব্যতীত আর কোন কথায় আমার রুচি নাই। তুমি শ্রীগৌরাজ্জকে অবজ্ঞা কর, অতএব তুমি আমার বন্ধু নও, আমি তোমার মুখ দেখিব না।” ইহা বলিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিলাম।

এই যে আমি রুচ ও দুর্ভাক্য বলিলাম, ইহা আমার পক্ষে বড় গর্হিত কার্য্য হইয়াছিল। তবে আমার পক্ষে এইটুকু বলিতে পারি যে, তাঁহার সহিত গাঢ় প্রণয় না থাকিলে আমি ঐরূপ ব্যবহার করিতাম না। আমি রাণাঘাটে বাস করিব, আর পণ্ডিতপ্রবরের বাড়ি রাণাঘাটে। আমার সহিত দিবানিশি সুখে কাটাইবেন, এই আশ্বাসে পণ্ডিতমহাশয় আসিয়াছিলেন, কিন্তু সে সুখ কিছু পাইলেন না, অপিত মন্দাহত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু বাড়ীতে অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলেন না, অল্পক্ষণ পরেই আবার আপনি আপনি আসিলেন। দেখিলাম

আমার উপর কোন ক্রোধ নাই; বরং তাঁহার অতি নম্রতাব, যেন কত অপরাধী। আমার তখন সহজ জ্ঞান, স্মরণঃ কিছু পূর্বে তাঁহাকে দুর্ভাগ্য বলিয়াছি, এই জ্ঞান বিনীতভাবে ক্ষমা চাহিলাম।

পণ্ডিতমহাশয় তখন রোদন করিতে লাগিলেন। সেই নয়নজলের সহিত তাঁহার নাস্তিকতা বিন্দু বিন্দু বহির্গত হইতে লাগিল। শেষে কাজেই গৌরকথা আরম্ভ হইল। তখন গৌরকথার আর বিরাম রহিল না, দিবানিশি বিভোর হইয়া

এই গৌরকথা চলিতে লাগিল।

সপ্তাহকাল মধ্যেই কালীময় গৌরময় হইয়া গৌরপ্রেমে জরজর হইলেন। তাহার পরে ভুবনবিখ্যাত শ্রীপাদ মদন-গোপাল গোস্বামীর নিকট দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। এখন তিনি গৌরপ্রেম-পাথারে ভাসিতেছেন।

আমার বোধ হয়, আমি যে তাঁহাকে দুর্ভাগ্য বলিয়াছিলাম, সে প্রভুর ইচ্ছাক্রমে; কারণ সেই দুর্ভাগ্য তাঁহার সৌভাগ্যের বীজরূপে পরিণত হইল।”

শ্রী—

শ্রীযুত মৃণালকান্তির প্রত্যুত্তর*

‘উলার’ উজাড় বঁার চরণের তলে,
মলিন ‘মানস’ ভাসে নয়ন সলিলে;
সে পদ-পঙ্কজ রক্ত বাসনা আমার;
সেই তো সম্পদ আমি যাচি অনিবার।

মাননীয় সভাপতিমহাশয় ও সমাগত সজ্জনমণ্ডলি,—
আপনারা আমার অভিধান গ্রহণ করুন।

“আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন—” এখনও সকল দুঃখের প্রদীপ কি জানি কেনবা জলে ওঠেনি—আমার আরতির বিলম্ব আছে। শঙ্ক বাজে—অহরহ বাজে—আমি ব্যস্ত থাকি কাষে, ‘বাজারের’ কাষে, সংসারের কাষে, বাজে কাষে। আমার পূজার বেলা ব’য়ে যায়, পূজা হয় না। তাই বর্ষণেই আশীর্বাদে আশায় আপনাদের ছদ্মবেশে এসেছি—আশীর্বাদ করুন—বিশ্বের পূজাশেষ ক’রে, বিশ্বনাথের পূজায় মন দিতে পারি। বিশ্ব আর বিশ্বনাথ অভিন্ন মনে হ’ত—এখন ভিন্ন ব’লে মনে হচ্ছে।

যা সত্য ছিল তাই স্বপ্ন হ’য়েছে—কল্পনার অতীত যা তাই বাস্তবে পরিণত হ’য়েছে। ‘সুজলা-সুফলা মলয়জ শীতলা শম্ভু শ্রামলা’ বাসন্তী কুমুম-সুখমা-ভূবিভা বঙ্গ-কুঞ্জ মহাশ্রমশান! অন্নপূর্ণার পুত্রের অন্নের ভিখারী!! যুগান্তে নম্র—চোখের নিমেষে!!!

আলোর মালা অন্ধকারের আবর্জনারূপে আচ্ছাদিত—আলো দিতে পারে না; খাচ্ছ স্বাস্থ্য নাশ করে—সুখা

নিবারণ করে না; পেম শক্তিহীন ও অপরিমিত—নাগরিক-দিগের পিপাসা নিবারণ করিতে পারে না; জগৎপ্রাণ-বায়ু প্রাণনাশক রোগবীজহর আশ্রয়। বিশ্ব বিশ্বনাথের না বিশ্বামিত্রের—ভোগ্য না ত্যজ্য?

আকাশে বাতাসে মরণের হাহাকার, লাতুহস্তার জয়-গান। মরণে জয়, মরণে উল্লাস; মাহুয়ের হাতে মরণের অস্ত্র, মাহুয়ের গানে মরণের তাল, মাহুয়ের চোখে মরণের আলো; জীবনের অস্তিত্ব কোথায়?

মৃত্যুই সত্য আর জীবন বা স্মরণাতীত-কাল হ’তে জীব ভোগ করিয়া আসিতেছে, ভোগ করিতে চাহে, সে কি অলীক? আত্মরক্ষা কাপুরুষতা, আত্মহত্যা বীরত্ব? বিশ্ব উদ্ধার নয়? বিশ্ব শ্রমশান?

সংঘর্ষ অতীতে ও বর্তমানে, বিশ্বাসে ও ব্যাপারে; যুদ্ধ সত্য ও অসত্যে। এ যুদ্ধ বালী ও স্ত্রীবেদ; নির্ণয় করিবার সাধ্য নাই—কে বালীকে স্ত্রীব; লক্ষণের মালা তো নাই। মীমাংসা অসম্ভব—কি সত্য কি মিথ্যা। সত্য জীবন, না সত্য মৃত্যু?

দ্রুতোচ্চ প্রহেলিকার অন্তরাল হ’তে আপনাদের নিকট প্রার্থনা,—আশীর্বাদ করুন আজ জনমের দিনে জীবনের জয়-ধ্বনি ক’রে যেন আমার ছড়ান মন কুড়িয়ে নিতে পারি, বিশ্বের পূজা ভুলে যেয়ে যেন বিশ্বনাথের পূজায় আত্মনিয়োগ কর্তে পারি।

নমস্কার।

*গত ১৬ই নভেম্বর সম্পাদক শ্রীমৃণালকান্তি খোষ ভক্তিবৃন্দ মহাশয়ের ৮৪তম জন্ম দিবসে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনার্থে বাগবাজারে জনসাধারণের সভায় শ্রীযুত মৃণালকান্তির প্রত্যুত্তর।

স্বরূপে আরোপ

অমুপ

শ্রীগৌরান্দ্র কহিলেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। এই স্বরূপ-জ্ঞান হইলে আর জীবের দুঃখ থাকে না। সে শ্রীভগবানের দাস, সুতরাং সে অপরের দাসত্ব করিবে কেন? এখন প্রশ্ন এই—এতাদৃশ দাস-বুদ্ধিতে কি, মায়াবের জন্মগত স্ব স্ব স্বাধীনতা, তাহা বিলুপ্ত হয়? ভগবদাসবুদ্ধিতে কি শৌর্য, বীর্য, তেজস্বিতা নষ্ট হয়? না আরো বুদ্ধি পায়? শ্রীগৌরান্দ্রের কথায়ই আমরা ইহার উত্তর পাইব।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-কার বলেন বটে—

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভূত।

যারে ধৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥

এই মত চৈতন্য গোসাঁঞি একলে ঈশ্বর।

আর সব পরিষদ কেহ বা কিস্কর ॥

অর্থাৎ, শ্রীগৌরান্দ্রই সর্ব-প্রভু; তাঁহার উপর কেহ কর্তা নাই; তিনিই পরন্ততসীমা। ব্রহ্মসংহিতাও বলেন যে, শ্রীভগবান্ অনাদি ও আদি, তিনি সর্ব কারণের কারণ। তবে কি জীবের কিছুই করণীয় নাই? জীবের কি কিছুক্ষিৎস্বাত্ম স্বতন্ত্র বা স্বাধীনতা নাই?

শ্রীগৌরান্দ্রের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব এক দিকে যেমন বলা হইয়াছে, যে, শ্রীভগবান্ পূর্ণ, জীব তাঁহার অংশ, শ্রীভগবান্ মায়াধীশ, জীব মায়াধীন, এইখানে ভগবানে ও জীবে ভেদ; আবার অভেদ কোথায়? না—শ্রীভগবান্ চিৎস্ব, জীবও চিৎস্ব, শ্রীভগবান্ আনন্দময় জীবও আনন্দময়। সুতরাং জীবে ও ভগবানে পূর্ণ-ও-অংশ-বিচারে ভেদ হইলেও মূলতঃ ও তত্ত্বতঃ বা বস্তুগতভাবে অভেদ, কেননা, জীব অণু চৈতন্য। ইহা হইতেই বুঝা গেল যে, সেই অণুচৈতন্য হিসাবে জীবের স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা। অবশ্য সেই স্বতন্ত্রতা বিরাট চৈতন্যেরই পরতন্ত্র থাকিয়া ক্রিমালীল। জীবের এই স্বতন্ত্রতা সম্বন্ধে মহাপ্রভু আরো সহজ মীমাংসা করিয়াছেন। সনাতন-শিক্ষায় শ্রীমদ্মহাপ্রভু তারত্বের বলিতেছেন—

কৃষ্ণ-ভুলি সেই জীব অনাদি-বহিস্মুখ।

অতএব মায়া তাবে দেয় সংসার দুঃখ ॥

তাহা হইলে দেখা যায়, জীব ভগবান্কে ভুলিয়া গিয়া বহিস্মুখ হয়। এ বিষয়ে জীবের স্বতন্ত্রতা আছে, সে ইচ্ছা করিলে না ভুলিতেও পারে।

জীবকে বলা হয় তটস্থা শক্তি, অর্থাৎ, তটে বা মধ্যবর্ত্তী স্থলে অবস্থিত শক্তি। এই শক্তি চিৎ-শক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যবর্ত্তী। জীব মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া উভয় শক্তিই নিরীক্ষণ করে, এবং ইচ্ছা করিলে চিৎশক্তিতেও প্রবেশ করিতে পারে, তখন তাহার ভগবদাস বলিয়া বোধ হয় এবং সেই জ্ঞান-বশতঃ অণুচৈতন্য বলিয়া অল্পপরিমাণে তাহার তেজঃ, বীর্য, সৌর্য জাগ্রত হইয়া উঠে, সে অপরের দাসত্ব করিতে বা পর-মুখাপেক্ষী হইতে কিছুতেই চায়না; আর সে ইচ্ছা করিলে মায়াশক্তিতে প্রবেশ করিতে পারে, তখন সে মায়ার দাসত্ব করিতে বাইয়া মায়িক সুখভোগের নিমিত্ত জড় ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য পরমুখাপেক্ষী হয়, পরের দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হয়, পরপদ-লেহনরূপ হীন প্রবৃত্তি দ্বারা জীবনযাপন করে ও অশেষ দুঃখ ভোগ করে।

এই যে “অনাদি বহিস্মুখ” বলা হইয়াছে, সেখানে অনাদি অর্থ এই—কখন যে জীব শ্রীভগবান্কে ভুলিয়া গিয়া বহিস্মুখ হইয়াছে, সেই কাল নির্ণয় করা যায়না, জীবের সেই বহিস্মুখ হওয়ার কাল স্মরণ নাই। ভগবান্কে যে অর্থে অনাদি বলা হয়, এখানে সে অর্থে অনাদি শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই—অর্থাৎ, অনাদিকাল হইতেই যে জীব বহিস্মুখ তাহা নহে। ইহাই যদি হইত তাহা হইলে চিরকালই সে বহিস্মুখ থাকিয়া যাইত। যেকোন মুহূর্ত্তে জীব এই ভ্রান্তি দূর করিয়া দাস বুদ্ধিতে জাগ্রত হইতে পারে। সুতরাং শ্রীভগবান্ জীবকে স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতা দিয়াছেন। ইহা তাহার জন্মগত স্ব স্ব, জন্মগত দাবী। শিক্ষার অভাবে, অল্পশীলনের অভাবে উহা ভুলিয়া বাওয়ায় তাহার যত দুর্গতি। অপরের

দাসত্বে পরিণতি ! তাই আজ চতুর্দিকে দেখা যায় অত্যাচার উৎপীড়ন,—কেহ কাহারো মুখের গ্রাস কাড়িয়া নেয়, কেহ সচ্ছলতায় দিনতিপাত করে, কেহ তুমুঠা অঙ্গের জন্ত অপরের দ্বারস্থ। তাই দেখা যায় সর্বত্র ভীষণ সংগ্রাম—মাঝে মাঝে, জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে পশুর মত বিরোধ।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

অধিষ্ঠানং তথা কৰ্ত্তা করণং চ পৃথগ্‌বিধম্ ।

বিবিধাশ্চ পৃথক্‌চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥

অর্থাৎ, প্রত্যেক কৰ্ম্ম সকল হওয়ার কারণ পাঁচটি, যথা—
অধিষ্ঠান (এই দেহ), কৰ্ত্তৃত্ববোধ, পৃথক্ পৃথক্ করণ বা ইঞ্জিনিচয়, বিবিধ চেষ্টা, এবং দৈব বা ভগবৎ কৃপা। এই পাঁচটির সমবায়ে প্রত্যেক কার্য ফলপ্রসূ হয়। কেবল মাত্র দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকার কথা হিন্দুশাস্ত্রে কখনও বলে নাই। উহা কাপুরুষতা, জড়তা, অলসতা, ভেজো-হীনতা মাত্র।

গীতা, ভাগবত, বেদ, পুরাণাদি সকল শাস্ত্রই সর্বশেষ অবতার শ্রীগৌরাজ মহাপ্রভুতে মূর্ত দেখা যায়। যাহারা শ্রীগৌরাজ মহাপ্রভুর দাস বলিয়া পরিচয় দেন, যাহারা শ্রীগৌরধর্ম্ম বাঞ্ছন করেন,—তাহারা কাপুরুষ, নিস্তেজ, হীনবীর্য্য নহেন। মহাপ্রভুর সময়ে দেখা যায়, একনিষ্ঠ গৌরভক্ত দোক্ষিওপ্রতাপ মহারাজ প্রতাপরুদ্র বীর্য্যবলে পাঠানদিগের আক্রমণ হইতে উড়িয়ার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। যিনি শ্রীভগবানের দাস, তিনি অপরের দাসত্ব করিবেন না বটে এবং স্বীয় স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াই চলিবেন বটে,—কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কখন অপরকে দাসত্বশুলে বদ্ধ করিতে, অপরের উপর প্রভুত্ব করিতে বাহা করিবেন না। তিনি জানেন, তিনি নিজে যেমন শ্রীভগবানের দাস, অপরেও সেইরূপ শ্রীভগবানেরই দাস; তিনি নিজে কখন প্রভু নহেন—একমাত্র প্রভু সর্বোচ্চ শ্রীভগবান। মহারাজ প্রতাপরুদ্র ভগবদ্ধাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন নাই, তিনি সংগ্রাম করিয়াছেন অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে এবং সকল সংগ্রামেই তিনি জয়ী হইয়াছেন, কেননা তিনি ভগবদ্ধাস

বুদ্ধিতে ভগবৎকার্য্য করিতেই রণে প্রবৃত্ত হইতেন; তাই তাঁহার ক্ষুদ্র অশুচৈতন্যের মধ্যে অসীম চৈতন্যশক্তি ক্রিয়া করিয়াছে। রাজ্যবিস্তার লালসা বা আত্মগ্রাসিতা মহারাজ প্রতাপরুদ্রের মধ্যে বিন্দুমাত্র ছিল না। তাই আমরা তাঁহাকে কেবলমাত্র বীর ভক্তরূপেই দেখিতেছি না, তাঁহার ভগবৎপ্রেমও অনন্তসাধারণ এবং এই প্রেমবশতঃ তিনি বিশ্ববাসী-জনগণকেও ভালবাসিতেন।

শ্রীগৌরধর্ম্ম অর্থপ্রেম-ভক্তি ধর্ম্ম। ভগবান্ প্রেমের অধীন, ভক্তির অধীন। তিনি জ্ঞানের অতীত, যাগযজ্ঞাদি কৰ্ম্মের অতীত, অষ্টাঙ্গযোগের অতীত। এই প্রেম-ভক্তি-ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া জীবকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করার জন্ত, জীবকে তাহার স্বাভাবিক স্বাধীনতা দান করিবার জন্ত শ্রীগৌরাজ মহাপ্রভু আসিলেন। মহাপ্রভুর বাণী এই—‘হে জীব! তোমরা শ্রীভগবানের দাস। তোমরা আর কাহারো দাস নও। তোমরা স্বাধীন। তোমরা মুক্ত। তোমরা কাহারো পদানত নও। তোমরা কেহই যখন অপরের দাসত্ব করিবে না, তেমনই আবার অপরকে দাস করিবার স্পৃহাও রাখিও না। একমাত্র প্রভু—শ্রীভগবান্। সুতরাং তোমরা সকলে ভাই ভাই। তোমরা সকলেই এই বিশালপরিবারস্থ লোক,—এই পরিবারের একমাত্র কৰ্ত্তা শ্রীভগবান্। এই দাস-বুদ্ধি তোমাদের জাগ্রত হইলে, কে তোমাদিগকে পদানত করিতে সাহস করিবে? তোমরা জাগ্রত হও, তোমাদের পশ্চাতে শ্রীভগবানের অশেষ বীর্য্য ক্রিয়া করিবে—মায়ায় জ্রুটুটু, আত্মরশ্মি তোমাদের নিকট ব্যাহত হইয়া দূরে-অতি দূরে পলায়ন করিবে। তোমরা বিশ্বপ্রেম লাভ করিবে—তোমাদের প্রেমে তপ্ত-জগৎ সুশীতল হইবে।

স্বরূপে আরোপ	হয়ছে যার,
পরের দাসত্ব	কোথায় তার।
বিশ্ব-পরিবার	দেখিতে চাও,
প্রেমের নিশান	উড়ানে দাও।
গৌরাজ-সুন্দর	সবার রাজা,
বিশ্ববাসী সব	তাঁহারি প্রজা।

দুঃস্থ অভিযান

আবছর রহমান, ইলুছার।

স্বর্গে এক ফেরেশতার বড় ছিল নাম—
বন্দেগীতে কেহ নহে তাঁহার সমান।
ঈশার আদেশে সেই সবারে প্রদমে,
নমিল না মাথা শুধু দেখিয়া আদমে।
দেবতাবা নমে তারে দেখেও না শেখে,
স্বর্গচ্যুত হ'ল তাই, শাস্ত্রকার লেখে।

বুদ্ধিতে যম—চোখে দেখে কম
ফেরাউল জানিলেন জ্যোতিষের মতে—
জন্মিবে বালক রাজ্যে তাঁহারে বধিতে।

রাজ্যময় সাবধান—সাদা প'ড়ে গেল,

তাঁরি গৃহে মুখা জন্মি' তাঁহারে বধিল।

কপট প্রেমিক

সাক্ষি পালি কহে—“শোন, ওহে দুঃস্থ ভায়া,
এস মোরা মিশে যাই—হই এক কায়া!
পরিমাণে বেড়ে যাবে, দানে হবে বেশী,
দ্বিকৃতি ক'রোনা আর। এসো ছুয়ে মিশি।”
দুঃস্থ কহে—“কাজ নেই, যদি ধরা পড়ি,
ছুয়ে ভুমে ফেলে দেবে, যাব গড়াগড়ি।”

প্রার্থনা

প্রভুহে আমার! বিষ্ণুপ্রিয়া নাথ!
ডুবাও যুগল রসে,
দেহ-মন-প্রাণ রাখিওনা আর
স্থগিত-মায়া'র বশে।
শয়নে স্বপনে ভোজন-গমনে
থাকহে হৃদয় জুড়ি',
যেদিকে নেহারি, সদা যেন হেরি
দৌহারে নয়ন ভরি'।
নতুবা জীবন রেখে কিবা লাভ!
সাক্ষ কর মোর খেলা!
কহিছে অস্থপ—সময় থাকিতে
নিয়ে যাও এই বেলা

বার্তাবহ

চাউলের অভাবে সমগ্র বাংলা দেশ জুড়িয়া যে দুর্ভিক্ষের তাণ্ডব হইয়া গেল তাহা ধীরে ধীরে হইলেও প্রাথমিক হইতে চলিয়াছে। ইদানীং শাসকগণও বেন সচকিত হইয়াছেন; বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানীর ব্যবস্থা, মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ে তৎপরতা দেখা যাইতেছে। অসামরিক সরবরাহ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে ধান ও চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া বলা হইয়াছে,— যেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, বগুড়া, রাজশাহী, জলপাইগুড়ী, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, মালদহ, বাধরগঞ্জ, খুলনা, যশোহর ও পার্শ্বত্যা চট্টগ্রামে ১লা ডিসেম্বর হইতে ১৪ই জানুয়ারী পর্যন্ত ব্যবসায়ীরা পাইকারী সর্বোচ্চ ১৬ মণ দরে চাউল বিক্রয় করিতে পারিবেন এবং কৃষকগণ ও চাউলের কলসমূহ সর্বোচ্চ ১৫।০ আনা মণ দরে চাউল বিক্রয় করিতে পারিবেন। ব্যবসায়ীগণ সর্বোচ্চ ৯।০ টাকা মণ দরে এবং কৃষকগণ ৯ মণ দরে ধান বিক্রয় করিতে পারিবেন। ১৫ই জানুয়ারী হইতে আর কোন বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত ব্যবসায়ীগণ পাইকারী সর্বোচ্চ ১৪/০ আনা মণ দরে এবং কৃষকগণ ও চাউলের কলগুলি সর্বোচ্চ ১৩।০ আনা মণ দরে চাউল বিক্রয় করিতে পারিবেন। ব্যবসায়ীগণ পাইকারী সর্বোচ্চ ৮।০ মণ দরে এবং কৃষকগণ ৮ মণ দরে ধান বিক্রয় করিতে পারিবেন। কলিকাতার এবং অবশিষ্ট জিলা সমূহে ব্যবসায়ীগণ ১লা ডিসেম্বর হইতে ১৪ই জানুয়ারী পর্যন্ত পাইকারী সর্বোচ্চ ১৭ মণ দরে এবং কৃষকগণ ও চাউলের কলগুলি ১৬।০ আনা মণ দরে চাউল বিক্রয় করিতে পারিবেন। ব্যবসায়ীগণ পাইকারী সর্বোচ্চ ১০ মণ দরে এবং কৃষকগণ ৯।০ মণ দরে ধান বিক্রয় করিতে পারিবেন। ১৫ই জানুয়ারী হইতে পুনরায় বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত ব্যবসায়ীগণ পাইকারী সর্বোচ্চ ১৫ মণ দরে এবং কৃষকগণ ও চাউলের কল সমূহ ১৪।০ আনা মণ দরে চাউল বিক্রয় করিতে পারিবেন। ব্যবসায়ীগণ ৯ মণ দরে এবং কৃষকেরা ৮।০ টাকা মণ দরে ধান বিক্রয় করিতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত দরে কোন অগ্রিম চুক্তি থাকিলে তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। সরকারী ঘোষণা কার্যকরী

রূপ পাইলে মাছবের দুঃখ হাস পাইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

এতদ্বির আরও কতকগুলি দ্রব্যের মূল্য গবর্ণমেন্ট ঋষিয়া দিয়াছেন। গম, আটা ময়দা, চিনি, মিছরি, লবণ, কেরোসিন কয়লা ও দেশলাই ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইহা ব্যতীত কাপড়ের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

অসামরিক সরবরাহ বিভাগের অপর একটা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে ১লা ডিসেম্বর হইতে কলিকাতায় ছত্রিশটি স্ট্যান্ডার্ড কাপড়ের দোকান হইতে প্রত্যেক এ আর পি পরচায় ছয়খানি করিয়া কাপড় দিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। উহার মধ্যে অন্ততঃ চারিখানি বালকবালিকাদের ব্যবহারোপযোগী অথবা সাটিংএর কাপড় হইবে। এইখানেই কর্তৃপক্ষের বিবেচনার ক্রটি দেখা যায়। স্ট্যান্ডার্ড কাপড় গরীবদের কাপড়। দরিদ্রদের মধ্যে বালকবালিকা অপেক্ষা বয়স্কদের বস্ত্রের প্রয়োজন অনেক বেশী।

দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে দেশ জুড়িয়া ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি রোগের প্রকোপ ভয়াবহরূপে দেখা দিয়াছে। পুষ্টির খাতি ও ঔষধের অভাবে এক শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। একমাত্র ফরিদপুর জিলাতে কেবল সেপ্টেম্বর মাসেই ম্যালেরিয়ার আক্রমণে ত্রিশ সহস্রাধিক লোক মারা গিয়াছে। অক্টোবর মাসের হিসাব সঠিক নির্ণীত ন্না হইলেও বিশ সহস্রাধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। পাবনার পল্লী অঞ্চলে চাষী ও দিন মজুরদের মধ্যে ম্যালেরিয়া ব্যাপক আকারে দেখা দিয়াছে। ফলে আমন খাদ্য কাটিবার মজুরের অভাব ঘটতেছে। মুর্শিদাবাদ জিলার গত দুই মাসে কলেরা ও ম্যালেরিয়ায় হাজার হাজার লোক মারা গিয়াছে। মজুরের অভাবে ধান কাটার অসুবিধা হইতেছে। শিশুমৃত্যু আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছে। গত ২৩শে নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে এই সপ্তাহে সরকারী বিবরণ অনুযায়ী নোয়াখালী জিলায় ১৩১ জন কলেরায় আক্রান্ত হয় এবং ৭৬ জন মারা যায়। ঐ সপ্তাহে বসন্তে

আক্রান্ত হয় ১৩ জন এবং তাহার মধ্যে ৩৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। প্রতি জেলাতেই দুঃখ দৈন্ত মৃত্যু, হাটাকার নিত্যকার হইয়া দাড়াইয়াছে।

বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ মুমূর্ষু লোককে সাহায্যদান কার্যে বেঙ্গল রিলিফ কমিটি ভারতবর্ষের কি দূরবর্তী, কি নিকটবর্তী সমস্ত স্থানের সহায় ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছেন এবং যে সমস্ত সংবাদপত্র এই কমিটির জন্য উন্মোচনী হইবার অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদের সৌজন্যে গত ২৪শে নভেম্বর পর্যন্ত নগদে এবং জিনিষপত্রে মোটের উপর ২৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের বেঙ্গল রিলিফ ফাণ্ড নগদ ৫,৬০,০০০ এবং ৬৮ গাইট বক্স প্রেরণ করিয়া কমিটিকে সর্বাধিক সাহায্য করিয়াছেন। এইরূপ সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করিয়া এই কমিটি বাঙ্গলা দেশে প্রত্যহ চারিলক্ষ কুড়ি হাজারেরও অধিক লোকের সেবা করিতেছেন এবং বাঙ্গলার মোট ২৮টি জেলার মধ্যে ২৫টি জেলায় ৪৭৫টি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া এই সাহায্য দানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

গৌরপ্রেমসুধানিধি শ্রীমণীলকান্তি ঘোষ ভক্তিবিশ্বনাথ মহোদয়ের জন্মদিবসে বর্ষে বর্ষে তাহার গুণগ্রাহীর দল একটি উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া থাকেন। গত ৩০শে কার্তিক তাহার চতুর্দশীতিম জন্মদিবস গিয়াছে। ১২৬৭ সালের ৩০শে কার্তিক বুধবার ইং ১৮৬০ সাল ১৪ই নবেম্বর তিনি ভূমিষ্ঠ হন। তাহার জন্ম তারিখ লইয়া কাহারও মনে কোন সংশয় থাকিলে অতঃপর তাহা অনিশ্চিত বিদূরিত হইবে।

গত ২৮শে নভেম্বর শ্রদ্ধানন্দ পার্কের এক বিরাট জনসভায় ডাঃ বি এস মুঞ্জি বক্তৃতা প্রসঙ্গে হুভিন্স, মহামাতি, অনাহার এবং মৃত্যুর যে করাল ছায়া বাংলার নগর এবং পল্লীকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে তাহার একটি চিত্র প্রদান করেন। বাংলাদেশে অকস্মাৎ হুভিন্সের হেতু সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এখানে গবর্ণমেন্ট দুইটা অংশে বিভক্ত—এক অংশে স্থায়ী সরকারী কর্মচারীর দল এবং অপর অংশে মন্ত্রীগণ। খাণ্ডসচিব ও অপর মন্ত্রীগণ এই স্থায়ী কর্মচারীদের মুখে ঝাল খাইয়া বাঙ্গলার খাণ্ড পরিষ্কৃত

সম্পর্কে কোনরূপ খোঁজ খবর লওয়া প্রয়োজন মনে করিতেন না। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী না থাকিলে এই উদ্যানক বিপদের কথা জগতের অজ্ঞাত থাকিয়া বাইত বলিয়া তাহার বিশ্বাস। উপসংহারে ডাঃ মুঞ্জি বলেন দুর্গত বাঙ্গালার পুনর্গঠনের পরিকল্পনা সর্বাঙ্গতঃ সঙ্কল্পপূর্ণ বিষয়। সেবাকার্য এখন সমরোপযোগী হইলেও গোটা দেশকে ভিকার অগ্নির উপর নির্ভরশীল করিলে চলিবে না। দুর্গতদের জন্য আবাস-ভবন নির্মাণ করিয়া সেখানে তাহাদের জন্য কার্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাঙ্গালার প্রায় দেড় কোটি লোক এই দুর্ভিক্ষে ক্লিষ্ট। কেবলমাত্র সরকারই এতগুলি লোকের সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি করিতে পারেন।

গত ৩০শে নভেম্বর ডাঃ মুঞ্জি এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন :—“বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ আমাদের রাজনীতির একটি মাত্র শিক্ষা দেয়। তাহা হইতেছে এই যে, ভারতবর্ষ একটি অখণ্ড দেশ—উপযুক্ত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের অধীনে একজাতি হিসাবে সম্বন্ধ ভাবে যে কোন অবস্থায় স্বশৃঙ্খলার সহিত কাজ চালাইতে পারে।” তিনি আরও বলেন “এই দুর্ভিক্ষই প্রমাণিত করিয়াছে যে মত বিরোধ ও বিভেদ থাকিলে মুক্তির কোনই আশা নাই।” কথাগুলি জাতীয় জীবনের বর্তমান পর্যায়ে অখণ্ড সত্যরূপে প্রতিভাত হইবে। হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল ধর্মাত্মীর পক্ষেই ডাঃ মুঞ্জির বাণী প্রশিধানযোগ্য।

গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে জাপানী বোমার যথেষ্ট উৎপাত আমাদের সহ করিতে হইয়াছিল। এবার নভেম্বর মাস হইতেই ছিটে কেঁটা শুরু হইয়াছে। ডিসেম্বর মাসও আসিয়া পড়িয়াছে, উৎপাতও যেন বর্ধিত হইতেছে। ইতিমধ্যে ফেনী, অঞ্চল ও কলিকাতার বোমার, বিমান হানা দিয়াছিল। পূর্ববঙ্গের কোন বিমান ঘাঁটিতেও ইতিমধ্যে বিমান আক্রমণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত আক্রমণ অবশ্য ব্যাপক আকারে হয় নাই। ব্যাপক আক্রমণ যদি সত্যই শুরু হয় তাহাতেও ঘাবড়াইয়া গেলে চলিবে না। সাহস ও ধৈর্যের সহিত প্রতিটি মুহূর্ত পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে। জীবনযাত্রার স্বাভাবিকতা রক্ষার জন্য সকলের বদ্ধপরিকর হইতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার তারিখ পিছাইয়া দেওয়ার অল্পরোধ জানাইবার জন্ত গত ৩০শে নভেম্বর ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ ডে কে চৌধুরীর পৌরহিত্যে এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষার্থীদের আবেদন সহায়ত্বের সঙ্গে বিবেচনা করিয়া দেখিবার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে। দেশের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্ত যে ছাত্র-সমাজকে কম নাজেহাল হইতে হয় নাই, পরীক্ষার্থীদের পক্ষে গভীরভাবে অধ্যয়ন নিরত থাকিও সম্ভব হয় নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই একথা ভাবিয়া দেখিবেন।

১৯২৩ সালের খনি আইন অনুসারে খনিগর্ভে নারী শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এই জাতীয় নিষেধাজ্ঞা কেবল মাত্র ভারতবর্ষেই নহে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রচলিত আছে। কিন্তু ভারত গবর্নমেন্ট বর্তমানে কয়লার খনিতে মজুরের অভাব দেখা দিয়াছে অজুহাতে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বাঙ্গলা ও বিহারের খনিগুলির উপর এই নিষেধাজ্ঞা প্রযুক্ত হইবে না এবং মধ্য প্রদেশ ও বেরারেও এই আইনের প্রয়োগ শিথিল করা হইবে। কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্টের এই সিদ্ধান্তকে সানন্দে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। স্ত্রীলোকদিগকে খনিগর্ভের কার্যে নিযুক্ত করিয়া শ্রমিক সমাজ নিবারণের চেষ্টা কল্যাণকর নহে।

সম্প্রতি রাজ্যে মস্তপান নিবারণী আইন প্রত্যাহত হইয়াছে। সরকার পক্ষ হইতে ইহার সমর্থনে বলা হইয়াছে যে মস্তপান নিষিদ্ধ হওয়ার যে আর্থিক অর্থাৎ রাজস্বের ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ করা অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্ব্যতীত তালের রসের মধ্যে নাকি যথেষ্ট স্বাস্থ্যপ্রদায়িনী শক্তি আছে, তাই তাড়িপান স্বাস্থ্যের পক্ষে নাকি অমুকূল হইবে। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে বিক্রয়-কর আইন প্রবর্তনের দ্বারা রাজস্বের ক্ষতি পূরণ হইয়াছে। রাজস্বের ক্ষতির দোহাই দিয়া মস্তপানে উৎসাহ দান নীতি ও আদর্শের দিক্ দিয়া অত্যন্ত আপত্তিজনক। জনমত সংগঠন ভিন্ন ইহার প্রতিকার কোথায়?

বহু কারণে লঙ্গরখানার ব্যাপকতা আমরা সমর্থন

করিতে পারি নাই এবং উহার বহুগুণায়িত খাজগুলি দিনের পর দিন বৃদ্ধি কৃষিকীর্ষীদের উদরে প্রবেশ করিবার ফলে যে আমন ফসলের সময় কৃষিকর্মজীবীর নিতান্ত অভাব ঘটিবে সে কথা আমরা বহুপূর্বে বলিয়াছি। ঢাকার এক সংবাদে প্রকাশ যে আমন ফসল কাটিবার জন্ত লোকের অভাব ঘটিয়াছে। আর একটা সংবাদে প্রকাশ যে একমাত্র মুন্সিগঞ্জ মহকুমায় তিন লক্ষাধিক নরনারী, শয্যাশায়ী। খাত্তের অভাব, ঔষধের অভাব, অর্থের অভাব। একমাত্র গভর্নমেন্টই ইহার প্রতিকার করিতে সমর্থ।

আগামী ১৫ই মার্চ প্রিন্সজী-উৎসব। প্রতি বৎসর বাংলার নানাস্থানে এই তিথিতে অষ্টগ্রহর নাম যজ্ঞ মহা প্রসাদ বিতরণ পাঠ কীর্তন ইত্যাদি চলে। আমরা শুনিতে পাইলাম শ্রীগৌরাজ ইন্সগমেনশন্স এসোসিয়েন বাংলার নানা স্থানে কয়েকদিন ব্যাপী দীর্ঘ উৎসব তালিকার ব্যবস্থা করিতেছেন। সঠিক খবর জানিবার জন্ত আমরা উৎসুক রহিলাম।

গত কার্তিক মাসে রাস পূর্ণিমা দিবস চরমলক্ষা (বরিশাল) শ্রীনিবার দাস মহাশয়ের বাটীতে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া রায় সাহেব জগৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাটীতে, মেডা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) শ্রীবিনোদবিহারী দেব মহাশয়ের বাটীতে ও কাশীপুর (ত্রিপুরা) শ্রীরজনীকান্ত ভৌমিক মহাশয়ের বাটীতে অষ্টগ্রহর নাম-যজ্ঞ চলে ও মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ১লা অগ্রহায়ণ কালকাঠি (বরিশাল) শ্রীমাধবচন্দ্র মণ্ডলের বাটীতে নদীয়াবৃগল সেবা (শ্রীবিগ্রহ) স্থাপন ও অষ্ট গ্রহর নাম কীর্তন হয়।

বাহারা শ্রীপত্রিকা গ্রহণ করিতেছেন কিন্তু আজ পর্যন্ত স্বীয় বাৎসরিক সাহায্য পাঠান নাই, তাহারা কৃপা করিয়া স্বীয় সাহায্য পাঠাইয়া শ্রীপত্রিকাখানি বাচাইয়া রাখুন—এ অল্পরোধ বহুবার জানাইয়াছি। ইহাতে অনেকে বিরক্ত হইয়াছেন; কিন্তু তাহারা যদি কৃপা করিয়া এই শ্রীপত্রিকাখানি স্বীয় পত্রিকা মনে করেন ও ইহাকে বাচাইয়া রাখিবার কথা স্মরণ রাখেন তবে শ্রীশ্রীমাদাদা চিরস্থায়ী হন।

দেশে পয়সার-মুখ দেখা যখন স্বপ্ন মনে হইত তখনও ইমার কোম্পানীর টিকিটের মাশুল আনার ভগনাংশ পর্য্যন্ত আদায় করিত। তাহাতে ব্যক্তিসাধারণের ক্রেশের অবধি ছিল

না, উহার প্রতি। শ্রীমার কোম্পানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার সওয়া বা পোণে ইত্যাদি আনার মাশুল তুলিয়া দেওয়া হয়। কিছুদিন হইতে আমাদের নিকট একটা অভিযোগ আসিতেছে। বৎসরাধিক হইল বরিশাল জিলায় ছলারহাট বানরিপাড়া ফেরী সার্ভিসটা তুলিয়া দেওয়া হয়। এই সার্ভিসটা বন্ধ হওয়ার ছলারহাট বানরিপাড়ার মধ্যবর্তী বহু গ্রামের সহস্রাধিক লোকের চলাচলে, বিদ্যুৎ ও অসুবিধা ঘটাইয়াছে তাহা নহে বানরিপাড়ার নিকটবর্তী বহু গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা এই পথে যাতায়াত করিত। ইহার উপর আবার বরিশাল-খুলনা একস্প্রেস শ্রীমার বরিশাল যাইবার পথে কাউথালি ষ্টেশনে ধরে না। কলিকাতা হইতে বানরিপাড়া অঞ্চলে গমনোচ্ছুক শত শত যাত্রি এই শ্রীমার যান এবং একে সার্ভিসটা বন্ধ হওয়ার তত্পরি এক্সপ্রেস শ্রীমার কাউথালি না ধরায় যাত্রি সাধারণের কষ্টের আর সীমা থাকে না। আমরা শ্রীমার কোম্পানীর দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি।

* * *
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া জন্মোৎসব ও

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত জয়ন্তী।

সর্বশেষ অবতার শ্রীগৌরাজ মহাপ্রভু এই বাংলাদেশে আসিলেন। তাঁহার ছায়াদীনী শক্তি নবদ্বীপময়ী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াই রূপায় অপামর সর্বসাধারণে শ্রী গৌরাজ-সুন্দরকে পরমাত্মবান রূপে পাঠাইয়াছেন। মহাপ্রভু আসিয়া জীবকে জানাইলে, সর্বসিদ্ধি ও সর্বকল্যাণপ্রদ।

“নামসংকীর্তন কলৌ পরম উপায়।” এবং এক সময় সমগ্র বাংলাদেশ, তথা সমগ্র ভারতবর্ষ কীর্তন তরঙ্গে সুখের নায়ক ভাসিতেছিল। আজ সেই ভারত, বিশেষতঃ এই বাংলাদেশ বিপদের ছায়াপাতে জীবমুত। হরিনাম সংকীর্তনই মৃত সজীবনী সুখ। তাই, শ্রীগৌরাজ যুগল সমিতি “প্রস্তাব করিতছেন যে বর্ধাসম্ভব ব্যাপক ভাবে বিভিন্ন কেন্দ্রে দুই, তিন, বা ততোধিক গ্রাম একত্র হইয়া সকলে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অবতরণ তিথি উপলক্ষে দেবীর জন্মোৎসব ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত জয়ন্তী উৎসবের অনুষ্ঠান করুন। এতৎসঙ্গে কার্যক্রমে বলা হইল বটে; কিন্তু বিভিন্ন কেন্দ্রে তদ্রূপ অনুষ্ঠাতৃপণ পারিপাশ্বিক অবস্থানসমূহ ইহার পরিবর্তন ও পরিবর্তন করিতে পারেন। কার্যক্রমে

(১) ১লা মাঘ হইতে শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া পঞ্চমী (শ্রীপঞ্চমী তিথির পূর্বদিন পর্যন্ত প্রত্যহ উষাকীর্তন। এক এক দিন এক এক পল্লীতে দ্বারে দ্বারে কীর্তন।

(২) শ্রী কয়দন প্রত্যহ বিকালে শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ সময় স্থানে ও পাঠক কেন্দ্রীয় কমিটি স্থিতি করিবেন। ব্যবসায়ী পাঠক আবশ্যক।

(৩) ২রা মাঘ রবিবার পাঠান্তে প্রমোদরঞ্জে গৌর কথা আলাপন। সম্ভব হইলে শ্রী চৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ কালীন পাঠ।

(৪) ৯ই মাঘ রবিবার পাঠের পূর্বে বা পরে অথবা পাঠের পরিবর্তে শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃতের বৈভব মধুরিয়া “সম্বন্ধ আলোচনা বা বক্তৃতা।

(৫) শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া পঞ্চমীর দিন অষ্টপ্রহর শ্রী নিমাই সংকীর্তন; পূর্বদিন সন্ধ্যার পর অধিবাস, কীর্তন, ইত্যাদি।

গুরুবন্দনা বৈষ্ণব বন্দনা মহাজনগণের স্মরণ, মহাজননী কীর্তন সম্ভবমত প্রত্যহই আনুষ্ঠানিকভাবে অমৃতের বিভিন্ন কেন্দ্রের স্থানে নির্দেশ কেন্দ্রীয় কমিটাই করিবেন। যেখানে নিত্য সেবা আছে, সেই স্থান শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়।

উষা কীর্তন, পাঠ ও আলোচনায় ব্যয় নাই। অষ্টপ্রহর কীর্তনের দিন কীর্তনকারিগণ স্বল্প আহার্য—চাল, ডাল ইত্যাদি ও দুয়ার আলো পয়সা একত্র সংগ্রহ করিলেই ব্যয় সংকুলনের প্রশ্ন সহজে মীমাংসিত হয়। ব্যক্তিবিশেষে সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে ইচ্ছা হইলেও অপরের দত্ত-বস্ত্র গ্রহণ করা বিধেয়, যেন, সকলেই নিজের উৎসব মনে করিতে পারেন।

স্থান বিশেষে প্রয়োজন ও আগ্রহ অনুসূত্রে মহিলাগণ ও অষ্টপ্রহর কীর্তন করিতে পারেন। কিন্তু, পারিবারিক কীর্তন ব্যতীত সর্বসাধারণের কীর্তনে নারী পুরুষ মিলিত হইয়া কীর্তন করা শোভন নহে। মহিলাদের কীর্তনে ৮৯ বছরের বালক মার্জনিয় হইতে পারে।

ইতোমধ্যেই আমরা কয়েক স্থান হইতে উত্তর পাইয়াছি, তাহা বা উপরি উক্ত কার্য ক্রম অনুযায়ী উৎসবের অনুষ্ঠানের উদ্যোগী হইতেছেন।

শুভাস্ত! শুভস্ত! শুভাস্ত!!!

নিবেদক

শ্রী বিনোদবিহারী চৌধুরী

শ্রীগৌরাজ যুবক সমিতির প্রতিনিধি।

৩৭১ রজনী চৌধুরী বাগিচা

গ্যাণ্ডারিয়া, ঢাকা।

শ্রীশ্রীমায়েরগণের তালিকা

খুলনা ও ঢাকা জেলা

পশুপী বুনিয়া পূর্বাঙ্গসরগ

- ১৬২। „ শ্রীকৃষ্ণপেতর পত্নী
১৬৩। „ রাজেন্দ্র শ্রীতারের পত্নী
১৬৪। „ বলরাম মণ্ডল
১৬৫। „ ঐ পত্নী
১৬৬। „ সুখদাসন্দরী মণ্ডল
১৬৭। „ যোগেন্দ্রনাথ মিত্রী
১৬৮। „ রজনীকান্ত বাড়ই
১৬৯। „ দেবেন্দ্রনাথ কীর্তনিয়া
১৭০। „ ঐ পত্নী
১৭১। „ কামিনীকুমার কীর্তনিয়া
১৭২। „ ঐ পত্নী
১৭৩। „ বসন্ত কুমার শীকদার
১৭৪। „ ঐ মাতা
১৭৫। „ ঐ পত্নী
১৭৬। „ হেমন্ত কুমার সিকদার
১৭৭। „ ঐ পত্নী
১৭৮। „ রাজেন্দ্রনাথ শ্রীতার
১৭৯। „ বসন্ত কুমার কৈবর্তদাস

নদমুলা—

- ১৮০। „ হরিচরণ নাথ
১৮১। „ ঐ পত্নী
১৮২। „ চুড়াশি নাথ
১৮৩। „ ঐ পত্নী

সদাসদি—

- ১৮৪। „ শ্রীক্ষেত্রমোহন সাহা হেডমাষ্টার বি-এ,
১৮৫। „ মহানন্দ আচার্য, মাষ্টার
১৮৬। „ দীননাথ সাহা
১৮৭। „ শশীমোহন সাহা

১৮৮। „ শ্রীচরণ মণ্ডল

- ১৮৯। „ মোহনবাসী মণ্ডল
১৯০। „ শ্রীনাথ সাহা
১৯১। „ বাধানাথ সাহা

কলাগাছিয়া—

- ১৯২। „ ক্ষীরোদাসন্দরী সাহা
১৯৩। „ মহেন্দ্রচন্দ্র সাহা

কামরাণীচর—

- ১৯৪। „ রাসবিহারী পোদ্দার
১৯৫। „ গৌরাঙ্গচন্দ্র পাল
১৯৬। „ রসিকমোহন পাল
১৯৭। „ মতিলাল পাল

খৈর—

- ১৯৮। „ মণীন্দ্রচন্দ্র দে সরকার

বারদি—

- ১৯৯। „ সুখেন্দ্রচন্দ্র সাহা

নোয়াইল—

- ২০০। „ নন্দলাল সাহা

উলুকাশি—

- ২০১। „ কৃষ্ণধন সাহা
২০২। „ ছদ্মধন সাহা

ভগীরথপুর—

- ২০৩। „ বিহারীলাল সাহা

সাঠীরপাড়—

- ২০৪। „ লালমোহন মোদক

সোনাইল—

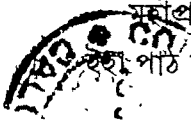
- ২০৫। „ ডাক্তার রাজকুমার দত্ত-বণিক

বৈষ্ণব গ্রন্থের বিজয় বৈজয়ন্তী।

সাহিত্যভূষণ শ্রীবিধুভূষণ সরকার, বি, এ, বিজ্ঞাবিনোদ সম্পাদিত

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

(আদিখণ্ড)



মহাপ্রভুর লীলামৃতের জীবন্ত আলোক্য। ভাব ও ভাষার প্রাণবন্ত রূপ।

এই পাঠ করিতে করিতে নিতান্ত বহিষ্কৃত হৃদয়ও নিপুট রসের সন্ধান পাইবে।

আনন্দাশ্রম বর্ষণে মনের মালিখা কাটিয়া যাইবে।

মূল্য—৭ টাকা (ডাক মাণ্ডল স্বতন্ত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীশ্রীমা-দাদা কার্যালয়—ইলুহার, বরিশাল (বেঙ্গল)

শ্রীশ্রীমা-দাদা শাখা কার্যালয় :—২২১১২, ট্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা।



শ্রীশ্রীমা-দাদা মাসিক পত্রিকার নিয়মাবলী

১। পত্রিকার মূল্য অগ্রিম দেয়। ২। বাৎসরিক মূল্য—৪। ৩। বার্ষাসিক ২৥০ টাকা (স্বডাক)। ৪। বার্ষাসিকের নিম্ন গ্রাহকদিগের স্বতন্ত্র ডাকমাণ্ডল দেয়। ৫। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্বমাসের ১৫ তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে। কোন মাসের কাগজ ১৫ তারিখের মধ্যে না পাওয়া গেলে নিজ এলাকার ডাকঘরে অঙ্গসন্ধান করিয়া তাহাদের উত্তর সহ সেই মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে আমাদের কলিকাতা অফিসে জানাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার—পূর্ণ পৃষ্ঠা প্রতিসংখ্যা—২০, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা প্রতিসংখ্যা—১২, চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা প্রতিসংখ্যা—৭, মলাট পৃষ্ঠার হার স্বতন্ত্র ও অঙ্গসন্ধানের ক্ষাতব্য। ৭। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। ৮। পূর্ব-প্রকাশিত বিজ্ঞাপন যদি আপত্তিক্রমক বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে ভবিষ্যতে উহার কারণ না দেখাইয়াই প্রকাশ বন্ধ করা হইবে। ৯। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নহি। ১০। চিঠিপত্র মণিঅর্ডার ইত্যাদি কলিকাতা ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

জয় শচীন্দ্রময় জয় গৌরহরি ।

বিকুপ্রিয়ায় প্রণম্য শ্রীমদ্বিহারী ॥

শ্রীশ্রীমা-দাদা

সার্বজনীন প্রেমপ্রচারক একমাত্র মাসিক পত্রিকা

—মাঘ—

৪৫৯ গৌরাক্ষ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ ।

প্রধান কার্যালয় :

ইলুহার, বরিশাল (বেঙ্গল) ।

কলিকাতা শাখা :

২২১-২, ষ্ট্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড ।

বার্ষিক—৪/-

প্রতি সংখ্যা—১০/-

সূচীপত্র

- | | | |
|---|-----|-----|
| ১। সর্গশক্তিময়ী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া | ... | ৫২৫ |
| ২। শ্রীগৌরাক্ষের দিব্যোন্মাদ অবস্থায়
উদ্ভাবনবিহার | ... | ৫২৮ |
| ৩। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া | ... | ৫৩৩ |
| ৪। পত্র-সংগ্রহ | ... | ৫৩৫ |
| ৫। শ্রীখণ্ডে শ্রীশ্রীবসন্ত-পঞ্চমী | ... | ৫৩৮ |
| ৬। পূর্ণিমা (কবিতা) | ... | ৫৪১ |
| ৭। বার্তাবহ | ... | ৫৪২ |
| ৮। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার নবানুসঙ্গ (কবিতা) | ... | ৫৪৬ |



যুগ্মসম্পাদক—

গৌরপ্রেমসুধাসিদ্ধ শ্রীমণ্ডলকান্তি বোস, ভক্তিতত্ত্বজ্ঞ ।

সাহিত্যতত্ত্বজ্ঞ শ্রীবিধুভূষণ সরকার, বি. এ., বিজ্ঞাবিনোদ ।

কেনবার সময়

“ড্যাডকে”

ছাপ্টি দেখে নিলে আর ভয় থাকে না

রবার নেট সেভিংব্রাশ

হরেকরকম ডিজাইন

মণিবাগ—ভ্যানিটি ব্যাগ—পোর্টফোলিও শাস্তিনিকেতন ও অজস্র ফ্রেস্কো, ইত্যাদি
বহুপ্রকার নক্সা, বিভিন্ন আকার ও বিভিন্ন দামের,—সস্তা অথচ মজবুত

সোনার ছোপ দেওয়া

মেয়াদী গ্যারান্টিযুক্ত

হরেকনক্সার—বোতাম, হাতের বোতাম, হার, চুড়ি কানের অলঙ্কার, ইত্যাদি।

মেয়াদী সময়ের মধ্যে বর্নচ্ছটার পরিবর্তন হইলে বিনামূল্যে পরিবর্তন করা হয়।

—ইহা ছাড়া—

মফঃস্বলের গ্রাহকবৃন্দের সুবিধার্থে—সর্বপ্রকার মাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়।

দাদা এন্ড কোং

অফিস :—২২১২, ষ্ট্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা।

কারখানা :—৮৮বি, মেছুয়াবাজার, ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও যাদবপুর।

শ্রীশঙ্কর ইলেকট্রোপ্লেটিং ফাউন্ড্রি

২২নং বাহাজুরপুর লেন।

ফরিদাবাদ, ঢাকা।

ছুরী, কাঁটা, চামচ ইত্যাদির বিশ্বস্ত প্রস্তুত কারক।

যাবতীয় ইলেকট্রোপ্লেটিংএর কাজ করা হয়।

যুদ্ধের দরুণ অধিক মূল্য ধরা হয় নাই।

মফঃস্বলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য

প্রতিষ্ঠান। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা



অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম্-এ, এফ্-সি-এস্ (লন্ডন),
এম্-সি-এস্ (আমেরিকা), আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, ভাঙ্গলপুৰ কলেজের রসায়ন-
শাস্ত্রের ভূতপূৰ্ব অধ্যাপক (প্ৰফেসর)

মকরধ্বজ।

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত)

প্ৰতি তোলা—৫ টাকা, সপ্তাহ—১/০ আনা।

সৰ্করোগনাশক মহৌষধ। ইহা ত্ৰিদোষ নাশক।

সকল রোগে মকরধ্বজের অমুপান বিধির পুস্তিকা—১/০ আনা।

সারিবাতি সালসা।

(রেজিষ্টার্ড)

প্ৰতি শিশি—৮/১০ আনা।

রক্ত পৰিষ্কারক সৰ্কৰপ্ৰকাৰ উপাদানে প্ৰস্তুত। এই সালসার ঔষধ অবৰ্ণনীয়। রক্তই আমাদের জীবন।

রক্ত পৰিষ্কার ও সতেজ থাকিলে কোন রোগের বীজাণুই সহজে আক্রমণ করিতে পারে না।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্ৰাশ।

প্ৰতি সেৱ—৩/০ আনা।

সৰ্কোংকুষ্ট আমলকী, বংশলোচন ও অন্যান্য উপাদানে পূৰ্ণমাত্রায় ব্যবহার করিয়া চ্যবনপ্ৰাশ প্ৰস্তুত হয়।

অবলাবান্ধব যোগ।

(রেজিষ্টার্ড)

প্ৰতি ১৬ মাত্রা—২/০ আনা।

স্ত্ৰীৰোগসমূহের অব্যর্থ মহৌষধ। ইহা সেবনে প্ৰদর, বাধক, পৃষ্ঠে বা কোমরে বেদনা, মাথাধরা রক্তোদোষ,

মূতবৎসাদ, বন্ধ্যাত্ব বিদূরিত হয়, জরায়ু সুস্থ ও সৰল হয় এবং দীৰ্ঘায়ু সন্তানধারণের ক্ষমতা জন্মে।

মৃতসঞ্জীবনী।

(রেজিষ্টার্ড)

বড়শিশি—৪/০ টাকা, ছোটশিশি—২/০ টাকা।

দেহকে সুস্থ, সৰল ও কশ্ঠ করিতে ইহলে এই মৃতসঞ্জীবনী একমাত্র অবলম্বনীয়। প্ৰযুক্তির অবশ্য সেবনীয়।

জ্বর, হৃৎক, বাত, অগ্নিমান্দ্য, অজীৰ্ণ, রক্তাক্ততা, রোগান্তে দৌৰ্ভাগ্যাদিতে সৰ্কদা গুণোজ্য।

অৰ্শবটী।

(রেজিষ্টার্ড)

৩০ বটিকা পূৰ্ণ প্ৰতি শিশি—৫ টাকা।

অসহনীয় কষ্টপ্ৰদ সকল প্ৰকাৰ অৰ্শ-রোগ নিবারণের অধিতীয় মহৌষধ।

সৰ্কজ্বর বটী।

(রেজিষ্টার্ড)

প্ৰতি ১৬ বটী—২/০ আনা।

যে কোনও জ্বররোগে অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া বহু পৰীক্ষিত। জ্বরের এইরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ আজপৰ্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।



আর ম্যালেরিয়া হয় না !!

“ম্যালেরিন”

ম্যালেরিয়া ও সর্বপ্রকার জ্বরের পরীক্ষিত অমোঘ ঔষধ।

উন্-আ-রিও

(অশোক কম্পাউণ্ড্, ঘটিত)

যাবতীয় প্রীরোগে অব্যর্থ

বাত

সকল প্রকার বাত বেদনায় একমাত্র প্রতিশোধক।

(প্রেটি ক্যামিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ্, কলিকাতা)।

সোল্ এজেন্ট :- দাদা এণ্ড কোং

২২১-২ ষ্ট্রাণ্ড্, ব্যাঙ্ক রোড্, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীমা-দাদা

“মাতৃশ্বের ভ্রাতৃশ্বের উজ্জল আলোকে,
নদীয়ার প্রেমধারঃ বহুক ভুলোকে।”

২য় বর্ষ ১০ম সংখ্যা	৪৫৯ গোরাব্দ জ্যৈষ্ঠয়ারী, ১৯৪৪	মাব ১৩৫০ সাল।
------------------------	-----------------------------------	------------------

সর্বশক্তিময়ী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া।

শ্রীবিষ্ণুভূষণ সরকার, বি-এ. বিত্তাবিনোদ।

কয়েক বছর আগে বরিশালের খাতনামা বীরভক্ত শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত কাশীধামে বসিয়া শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সঙ্গীয় লোকদিগকে বলিয়াছিলেন, “আজ এই পুত তিথিতে এই পুণ্যধামে বসিয়া কি আলোচনা করা যায়! এস আমরা দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার কাহিনী আলোচনা করিয়া পবিত্র হই। এই তিথিতেই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া প্রথম খণ্ড গ্রন্থখানি লও—উহাই পাঠ করি।”

আমরাও আজ এই শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পঞ্চমোতিথির শুভাঙ্গমনে আত্মপবিত্রতার ক্রম তাঁহার মহামহিমময়ী কাহিনী কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তুর ত্রিবিধ প্রকাশ—ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্। নিরাকার জ্ঞানবাদিগণ বলেন—ব্রহ্ম; যোগমার্গী-বলয়িগণ বলেন—পরমাত্মা, ভক্তিবাদিগণ বলেন—ভগবান্। ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নিঃশক্তিক, নিরাকার, নিষ্ক্রিয়—ব্রহ্মবাদিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। যিনি নিজে বৃহৎ ও অপরকে বৃহৎ করেন তিনিই ব্রহ্ম, —‘ব্রহ্ম’ শব্দ হইতে ইহাই পাওয়া যায়। এই ‘অপর’ অবশ্য তাঁহারই সৃষ্ট। নিজে যেমন বৃহৎ অপরকে বৃহৎ করার শক্তিও তাঁহাতে আছে, সুতরাং তাঁহাকে নিঃশক্তিক বলা চলে না। এই ব্রহ্মই ভক্তগণ বলেন,—তিনি নির্বিশেষ ও সর্বিশেষ, নিঃশক্তিক ও সশক্তিক, এবং নিরাকার ও সাকার, নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয়। এই বস্তুটাই ভগবান্—অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীৰ্য, সমগ্র বশঃ, সমগ্র সৌন্দর্য ও মাধুর্য, সমগ্র

বৈরাগ্য ও সমগ্র জ্ঞানময়; এই ষড়ৈশ্বর্যবৃত্ত তিনি। এই শক্তি যখন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, তখন তিনি নিঃশক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান হন। তিনি প্রকৃত জড়ীয় আকার বিশিষ্ট নহেন, তাই তিনি নিরাকার; তিনি সচ্চিদানন্দবনবিগ্রহ, তাই তিনি সাকার। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবৎ-স্বরূপ এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, যথা—

অহমেবাসমেবাগ্রে নাত্মং যৎ সদসংপয়ন্।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্ঠেত সোহশ্ম্যহম্ ॥

অর্থাৎ, আমি সৃষ্টির পূর্বে ছিলাম, আর অস্ত্র স্থল হস্ত এবং স্থলহস্তের কারণ প্রকৃতি, কিছুই ছিল না—সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতি-অস্ত্রস্থ-রূপে আমাতে লীন অবস্থায় ছিল। সৃষ্টির পূর্বে আমি ছিলাম, কিন্তু তখন আমি নিষ্ক্রিয় ছিলাম। সৃষ্টির পরও আমি আছি; এই যে বর্তমান বিশ্ব, তাহাও আমি, আর প্রলয়কালে বাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাও আমি।

শ্রীশ্রীব গোস্বামী বলেন, এই শ্লোকের বক্তা শ্রীভগবান্। ‘অহং’ শব্দ দ্বারা ইহার বক্তা যে মূর্ত, তাহা বুঝা যাইতেছে—তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্ম নহেন।

মহাপ্রভু সনাতন-শিক্ষায় বলিতেছেন,—ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই তিন শক্তি মিলিত হইয়াই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে—

ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।

তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চরচন ॥

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও willing, knowing, ও doing এই তিন শক্তি স্বীকার করেন। তবে তাঁহারা কেহ কেহ knowingএর পর willing বলেন। সকল দর্শনের উদ্ভবকর্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরান্ মহাপ্রভু ইচ্ছাশক্তির স্থান প্রথম দিয়াছেন। আর, বস্তুতঃ প্রত্যেক জীবের মধ্যে এই তিনটি শক্তি দেখা যায় যদ্বারা কার্যাদি হইতেছে। ইহারই পরিপূর্ণতা স্বয়ং ভগবানে,—তিনি এই তিন শক্তির কেন, এইরূপ অনন্তশক্তির অধীশ্বর। ইহাকেই ভক্তগণ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া থাকেন—নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলেন না। ইনি কৃষ্ণ—সর্বস্বেচ্ছাকর্ষক প্রেমবনবিগ্রহ। বর্তমানে ইনিই সেই ঋতিবর্ণিত “বিশ্বম্ভর”, “মহাপ্রভু”, “হিরণ্যঃ পুরুষ”, “কৃষ্ণবর্ণ পরমপুরুষ” শ্রীগৌরান্দ্রসুন্দর।

শাস্ত্রকারগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, ভগবান্ জ্ঞানাতীত, যোগাতীত, শাস্ত্রাতীত। তবে কি জীব তাঁহাকে পাইবে না? না—তাহা নহে। তিনি ভক্তির অধীন। ভক্তিরূপা শক্তিদ্বারা যখন শ্রীভগবান্কে বশ করা যায়, আর তিনি নিজেই যখন বলিয়াছেন ‘ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ’—একমাত্র ভক্তির আমি বশ, তখন ভক্তিই সর্বশক্তি-শ্রেষ্ঠ, সকল শক্তিই ভক্তির অঙ্গগত। মহাপ্রভু এই ভক্তি-ধর্ম প্রবর্তন করিতে আসিলেন,—এক কথায়, তিনি ভক্তাধীন হইতে আসিলেন। এই ভক্তি দুই প্রকার—বৈদী ও রাগামুগা। অমুরাগবিহীন অবস্থায়, কেবলমাত্র শাস্ত্রের আজ্ঞায় বিধি আচরণ করাকে বলে বৈদীভক্তি,—ইহা শুদ্ধ। আর, ভগবান্কে নিজজনবোধে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অমুরাগের সহিত ভজন করাকে বলে রাগামুগা ভক্তি—ইহা বড়ই রসাল। যিনি অনন্তব্রহ্মাণ্ডের নাথ, তিনি আমার অতি নিজজন—প্রভু বা সখা বা পতি ইত্যাদি, ইহা অপেক্ষা জীবের সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে। এই রাগামুগা ভক্তি দিতেই প্রভু অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াই এই পরাভক্তি-স্বরূপিণী—মুষ্টিমতী ভক্তি; ইহা শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বাক্য এবং শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত।

মহাপ্রভু শাস্ত্র মুষ্টিমান্ করিতে আসিলেন,—সমস্ত শাস্ত্র মুষ্টি হইয়া শ্রীগৌরান্ ও বিষ্ণুপ্রিয়া এই দুইটি বস্তুতে প্রকাশিত হইল। শাস্ত্রে শ্রীরাধাকে পরমদেবতা বলা হয়। শ্রীপাদ

কবিরাজ গোস্বামী ‘পরমদেবতা’ অর্থ করিয়াছেন “সর্ব-পালিকা সর্ব-ঈশ্বরতের মাতা।” মাতার কার্য আশ্রয়স্থ না চাহিয়া সকলকে পালন করা। পিতা বস্তু সংগ্রহ করিয়া আনেন, মাতা তাহা সকলের প্রয়োজনানুসারে পরিমাণ করিয়া বণ্টন করিয়া দেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার এই শক্তি পূর্বপ্রকাশমান। তিনি বিশ্বপরিবার পালনের দ্রষ্টা ভক্তিরত্ন বিতরণ করিতে, নির্বিচারে সকল জীবকে বণ্টন করিয়া দিতে স্বীয় প্রাণবল্লভকে নদীয়ার বাহিরে পাঠাইলেন—আশ্রয়-স্থান বিস্মৃত চাহিলেন না। ভক্তিই জীবের প্রধান অবলম্বন, ভক্তিদ্বারাই জীবের প্রকৃত পালন হয়।

“ভক্তিবিলা জগতের কৈছে অবস্থিতি!”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

বস্তুতঃ রাধিকা বস্তুটা হইলেন আরাধিকা, অর্থাৎ যিনি শ্রীভগবানের পরিপূর্ণ-আরাধনা বা সন্তুষ্টিবিধান করেন। ভক্তিরত্ন বিতরণে জীবের প্রকৃত-কল্যাণ সাধন করিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরান্দের পূর্ণ সন্তুষ্টিবিধান করিয়াছেন—স্বীয় বিরহদাহনের দিকে লক্ষ্যপাত করেন নাই। তাঁহাতেই রাধিকা-বস্তুটা পরিপূর্ণ প্রকাশিত। তাই তিনি পূর্বে ব্রজধামে যখন যুবভাষ্মনন্দিনীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তিনি ছিলেন—

“কৃষ্ণলীলাব্রজের বসতি নগরী।”

অর্থাৎ কৃষ্ণলীলাসমূহের বসতিস্থল নগরী সদৃশ, আর এখন তিনি হইলেন “গৌরলীলাধামা” অর্থাৎ সমগ্র গৌরলীলার পরিপূর্ণ আশ্রয়স্থল বা নিবাসভূমি। তখন তিনি ছিলেন কৃষ্ণময়ী, এখন তিনি গৌরময়ী। তখন তিনি ছিলেন “দ্যোতমানা পরম সুন্দরী,” এখন তিনি ততোধিক দ্যোতমানা ও ততোধিক সুন্দরী, কারণ অশেষ করুণায় জীবকে প্রেমভক্তি দান করিতে, ত্রিয়মান জীবকে আনন্দোৎসবে নাচাইতে, নাচিয়া গাহিয়া ভববারিষি পার হইয়া বাহিতে জীবকে সুযোগ দেওয়ার তাঁহার অশেষ সৌন্দর্য্য সমধিক প্রকাশিত হইয়াছে। তাই শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া শুধু দেবী নহেন—তিনি পরমাদেবী।

ভক্তির পূর্ণ পরিপক্ববস্থা পূর্ণ আত্মসমর্পণ, তাহারই পূর্ণ পরিণতি প্রেম ও আত্মবিশ্বাস, প্রিয়বস্তুতে একবারে

ডুবিয়া যাওয়া—অভেদে মিশিয়া যাওয়া, অথচ তাহারই মধ্যে ভেদসত্তা; ইহাই শ্রীগোরাঙ্গমুন্দের প্রবর্তিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব। ইহা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ায় পূর্ণ প্রকাশিত। জীব ও ভগবানে যে ভেদাভেদ, শ্রীগোরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়াকে দিয়া তাহার পূর্ণ আদর্শ দেখাইলেন। প্রিয়াজীব আত্মসমর্পণের গভীরতা কে ইয়াত্তা করিবে। বিবাহের পূর্বেই তিনি শ্রীগোরাঙ্গের পাদপদ্মে চিরতরে বিকাইলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি শ্রীরাধার মত দুই পাঠাইলেন না, বা শ্রীকৃষ্ণীর মত ব্রাহ্মণকে দিয়া পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন না। স্থির, ধীর, অটল হইয়া বসিয়া রহিলেন, এতই তাঁহার ভাবের গভীরতা, বিশ্বাসের দৃঢ়তা! এইভাবে তিনি অপরকেও অভিভূত করিলেন। পণ্ডিত সনাতনমিশ্রও তাঁহার বিবাহের জন্ত নিশ্চেষ্ট, নিরুৎসাহ। শচীমা'র বাড়ী হইতেই প্রস্তাব আসিল। শুধু তাহাই নহে। জ্যোতিষীর নিকট মহাপ্রভু যে কিঞ্চিৎ ওদাস্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তাহাই যখন সেই জ্যোতিষী রাজপণ্ডিত সনাতনমিশ্রের নিকট একটু গভীরভাবে বলিয়াছিলেন যে, এ বিবাহে শ্রীগোরাঙ্গের সম্পূর্ণ মত আছে কিনা সন্দেহ, দিন স্থির করার পূর্বে তাঁহার মত জানিয়া লওয়া ভাল। তখনও শ্রীমতীর বিশ্বাস কিঞ্চিৎ তলিল না এবং তাঁহারই ভাবের প্রাবল্যে ভাবের পূর্ণতায় সনাতনমিশ্রও কোন লোক পাঠাইলেন না। সেই ভাব যাইয়া শ্রীগোরাঙ্গের মধ্যে একরূপ ক্রিয়া করিল যে, প্রভুই স্বয়ং অনতিবিলম্বে লোক পাঠাইয়া আগ্রহাতিশয্য জানাইলেন। শ্রীমতীর এ ভাবের তুলনা নাই—এ ভাবের সমান দ্বিতীয় নাই। তারপর বাসর রজনীতে শ্রীমতী প্রভুর নিকট যে নিবেদন করিলেন, তাহাও জগতে অতুলনীয়। তিনি বলিলেন,—নাথ! তোমাকে দেখিয়া অবশি তোমার রূপসায়রে আমি এমনই ডুবিয়া গিয়াছি যে, এই দুই আঁখিতে পান করিয়া রূপভূষণ আর মিটে না; মনে হইল, কোটি কোটি জীব কোটি কোটি আঁখিতে যদি এই রূপসুধা পান করিতে পারে, তবেই আমার সাধ মেটে। আবার আজ এই শ্রীঅঙ্গপরণে আমার সারাটা দেহে এমনই সুধা ঢালিয়া দিল যে, তখনই সাধ হইল, সকলেই এই তত্ত্বানির পরশ পাইয়া ধন্ত হয়।” এতাদৃশ মহান্ভাব,

সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ জগতের ইতিহাসে আর হয় নাই। আর একটা কি অপূর্ণ রহন্ত।

প্রভু পূর্ববঙ্গে তপন মিশ্রকে কানী যাইতে আদেশ দিয়া বলিয়া আসিয়াছেন যে, সেখানে প্রভুব সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে। সূত্রাং প্রভু যে সন্মাস করিবেন, তাহা স্থির। তথাপি তিনি শ্রীমতীকে বিবাহ করিলেন। কেন?—জীবোদ্ধার লীলায়, জীবকে প্রেমভক্তি বিতরণ কার্যে বিষ্ণু-প্রিয়াকে তাঁহারই তুল্য সহচর করিলেন। সনাতন মিশ্র যখন কষ্টা সম্প্রদান করিতে বসিলেন, তখন শ্রীগোরাঙ্গমুন্দের এই পরম রূপসী, এই লাখবাণ সোনা নবীনা-বালাকে দেখিয়া অতিকষ্টে নয়নজল স্ফরণ করিয়াছিলেন; কেন না, ক’দিন পরে ই’হাকে কাঁদাইতে হইবে,—জীবোদ্ধার প্রভুর এতই প্রিয়। জীবকে প্রেমভক্তি দেওয়া তাঁর এতই শ্রেষ্ঠ কার্য। প্রভু গভীর হইলেন। কষ্টা সম্প্রদান হইয়া গেল। প্রভুর ভাব ধরা পড়িল না। কিন্তু যখন বাসরমন্ডরে যাইতে শ্রীমতী হুঁচোট খাইলেন, তখন প্রভু একটু ভয় পাইলেন,—পাছে বা শ্রীমতী ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা করেন, পাছে বা প্রভুর গভীর ভাব দেখিয়া শ্রীমতী মনোবেদনা পান। প্রভু তখন স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শ্রীমতীর পায়ের কিঞ্চিৎ স্থান চাপিয়া ধরিলেন,—চরণে চরণ মিলন হইল। শ্রীমতী প্রভুর চরণ-স্পর্শ পাইয়া আনন্দ পাইলেন, মুখে হাঁসি ফুটিয়া উঠিল। প্রভু রক্ষা পাইলেন। তিনি যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহার কিছুই হইল না।

আবার, শ্রীমতীর মুখে বাসর-গৃহে বসিয়া যখন ঐরূপ নিবেদন শুনিলেন, তখন প্রভু দেখিলেন,—তাঁহার অভীপ্সিত কার্য সিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার উপযুক্ত সহচরই তিনি পাইরাছেন।

এই যে দুইটা বস্তুর মিলন হইল, ইহাদের ভাব-সম্মেলনে যে জগতের একটা ভাবী মহাকল্যাণ সাধিত হইবে, তাহার সূচনা এই প্রথম হইল। জীবের কল্যাণের জন্ত এই বস্তু দুইটা যে অভূতপূর্ব মহান্ আত্মোৎসর্গ করিবেন, তাহা এই বিবাহ-রজনীতে উভয়ের ভাবের বিনিময়ে এই প্রথম ব্যক্ত হইল। রসাভাস ভয়ে উভয়েই চাপিয়া গেলেন।

শ্রীরূপ-শিক্ষাই হউক বা সনাতন-শিক্ষাই হউক, সর্বত্রই

প্রভুভক্তির প্রাধাত্য স্থাপন করিয়াছেন, কেননা ভগবান
ভক্তের অধীন। তিনি নিজকে বিলাইতে আসিয়াছেন।
তাহারও একটা ক্ষত্র চাই, সেই ক্ষত্র হইল ভক্তি। তিনিই
ভক্তিদাতা ও ভক্তাধীন। সেই অপার্থিব অমূল্য বস্তুটাই হইল
প্রেমভক্তি। বিষ্ণুপ্রিয়াই সেই মুক্তিগতী প্রেমভক্তি। সুতরাং
প্রভুর সকল শিক্ষার সারমর্ম গ্রহণ করিলে, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার
আলুগতাই একান্ত কর্তব্য। ‘আমুন, আমরা আজ সকলে
এই পুত তিথিতে যুক্তকরে দেবীর নিকট প্রার্থনা করি—

হে সর্বপালিকে করুণাময়ি বিশ্বজননি, হে সর্বশক্তিময়ি

সর্বলক্ষ্মীময়ি গৌরময়ি দেবি বিষ্ণুপ্রিয়ে! বিশ্বপরিবার
পালনে, প্রেমভক্তির বীজ বিতরণে তুমি শ্রীগৌরানন্দ মহাপ্রভুর যে
পূর্ণ সহায়তা করিয়াছিলে, সেই ভরসায় তোমার শ্রীচরণে
আমরা ভক্তির বীজ চাওয়া করিতেছি,—আমার জগৎ বাঁচিয়া
উঠুক, আবার জগৎ নাচিয়া উঠুক, তাপদম্ব, কামকলুষিত,
সমরবিক্ষিপ্ত বিশ্বচিত্ত শান্ত হোক ॥

নোমি বিষ্ণুপ্রিয়াং দেবীং প্রেমভক্তিপ্রদায়িনীম্।

গৌরানন্দাদিনীং নোমি জগদ্ধাকারকারিণীম্ ॥

শ্রীগৌরানন্দের দিব্যোন্মাদ অবস্থায় উত্তানবিহার

শ্রীমণ্ডলকান্তি বোধ, ভক্তিতত্ত্ব।

প্রভুর শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিবার পর কয়েক
বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। গোড়ের ভক্তগণ নিয়মিত রথযাত্রা
উপলক্ষে নীলাচলে আসিয়া, চারিমাস প্রভুর সঙ্গলাভে সুখের
পাথারে ভাসিয়া, শ্রীবিষ্ণুর দিন ছুঃখভরা হৃদয়ে গৃহান্তি-
মুখে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া অবধি
প্রভুর ভাবের পরিবর্তন ঘটয়াছে। আর তাঁহার সে হাস্য-
কৌতুক, সে আনন্দোচ্ছালিত ভাব নাই,—সে স্তম্ভুর
সংকীর্ণন ও মন-মাতান মনোহর নৃত্য নাই,—সে জলকেলি
ও পুলিন-ভোজনাদি নাই। প্রভু এখন প্রায় সারাদিন গৃহে
থাকেন—কচিং কখনও বাহিরে গমন করেন, কাহারও
সহিত কথা কহেন না, দিবানিশি আপনভাবে বিভোর হইয়া
থাকেন। কাজেই তাঁহার সে মনোহর শ্রীমূর্তির দর্শনলাভ
নীলাচলবাসীর ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। স্বরূপ, রামরায় প্রভৃতি
কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত অনেক সময় তাঁহার কাছে থাকেন।
আর গোবিন্দ সর্বদা তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহাকে
স্নানাহার করান, ও সর্বদা চোখে চোখে রাখেন,—পাছে
প্রভু বিভোরভাবে কোনদিকে চলিয়া যান।

দিনমান এইভাবে একরূপ কাটিয়া যায়। কিন্তু বেলা
বতই অবসান হয়, ততই প্রভুর বিরহজনিত উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি
পাইতে থাকে। শেষে, উদ্ধবকে দেখিয়া শ্রীমতীর যে দশা

হইয়াছিল, প্রভু আমার সেইরূপ অধীর ও কাতর হইয়া
পড়েন এবং আপনাকে স্ববশে রাখিতে না পারিয়া ঘোর
বিরহ-সাগরে হাবুডুবু খাইতে খাইতে, হৃদয় উঘাড়িয়া একরূপ
কল্পকণ্ঠে কান্দিতে থাকেন, যাহা শুনিয়া অতি-বড়
পাষাণের কঠিন হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া যায়। তখন স্বরূপ ও
রামরায়-তাঁহাকে সুস্থির করিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা
করিতে থাকেন;—কখন তাঁহার ভাবোপযোগী দুই
চারিটা পদ গান কবেন, আবার কখনওবা শ্লোক পড়েন।
এই ভাবে নানাবিধ চেষ্টা করিবার পর প্রভু কিছু সুস্থির
হইলে, তাঁহারা প্রভু সহ বসিয়া গীত-গোবিন্দ, বিজ্ঞাপতি,
চণ্ডীদাস প্রভৃতির শ্রীগ্রন্থগুলি আশ্বাদন করেন। এই ভাবে
কয়েক মাস কাটিয়া গেল।

শীতের শেষে এক দিন অতি প্রত্যুষে প্রভু সমুদ্র-স্নানে
চলিলেন। হটাৎ অসুস্থভাবে বাটির বাহির হওয়ায় সঙ্গীরা কিছু
পশ্চাতে পড়িলেন। প্রভু ভাবে বিভোর হইয়া চলিয়াছেন।
কোনদিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই। মুখখানি মলিন। মধ্যে
মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন, আর মনের বেগ অনেক
কষ্টে ধারণ করিতেছেন। সমুদ্রের সমুখীন হইয়া হটাৎ প্রভু
দাঁড়াইলেন ও বদন তুলিয়া চাহিলেন। দেখেন; সমুখে
একটা উপবন।

বসন্তের আগমনে উপবন অতি মনোহর শোভা-ধারণ করিয়াছে,—মৃদু-গন্ধ মধুর বাতাস বহিতেছে, নানা জাতীয় ফুলে ও আমেব মুকুলে বন আলোকিত ও আমোদিত করিয়াছে, চঞ্চল ভ্রমরকুল গুণ্গুণ্ রবে নানা ফুলের মধু পান করিতেছে, নানা রকম পাখী মনের আনন্দে পঞ্চম-সুরে গান ধরিয়াছে, আর তাহাদের মধ্যে বসন্তের সেনা কোকিল কুহববে সকলের উপর তান চড়াইয়াছে। স্থানে স্থানে গাভী ও হরিণ চরিতেছে। আব গাছের ভিতর দিয়া স্নদুরে সমুদ্রের নীলজল দেখা যাইতেছে। এই মনোহর সময়ে এই মনোহর দৃশ্য দেখিয়া কাহার মন আনন্দে উল্লাসিত না হয়? কিন্তু বিধাতা বিরহিনীর হৃদয় অন্তভাবে গড়িয়াছেন,—এ দৃশ্য বিরহিনীর বিরহ শতগুণ বৃদ্ধি করে। প্রভুরও সেই দশা ঘটিল।

প্রভুর তখন মনে হইতেছে, রাসের রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে লইয়া কোথায় লুকাইয়াছেন। তাই আজ শ্রীবৃন্দাবন আধার হইয়াছে, পুষ্প সকল বিষাদে মলিন হইয়া পড়িয়াছে, পক্ষীরা হৃদবিদারক স্বরে গীত গাহিতেছে, গাভী ও হরিণ সকল উৎকণ্ঠিত চিন্তে সজল নয়নে ইতি উতি চাহিতেছে। প্রভু ভাবিতেছেন,—ইহাদিগকে যখন উৎকণ্ঠিত ও ম্লান দেখিতেছি, তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে লইয়া নিশ্চয় এই পথে গিয়াছেন। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে অবশ্যই তাহাদিগের সংবাদ পাইব।

ইহাই ভাবিতে ভাবিতে প্রভু উপবনে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখে দেখিলেন, কতকগুলি বৃক্ষ-শাখা পল্লব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। অতি কাতর ভাবে তাহাদিগকে বলিলেন,—‘হে বৃক্ষগণ! তোমরা তীর্থবাসী, যমুনা-কূলে বাস কর, পরের হিতসাধনই তোমাদের ব্রত। আমরা কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল হইয়াছি। বলিতে পার, তিনি শ্রীমতীকে লইয়া কোন পথে গিয়াছেন?’ ইহাই বলিয়া উদ্ভরের আশায় প্রভু তাহাদিগের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া ভাবিলেন,—ইহারা পুরুষ-জাতি, কৃষ্ণের সখার সমান, ইহারা আমাদিগের দুঃখ কেন বুঝিবে?

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রভু আবার চলিলেন। একটু অবসর হইয়া তুলসী ও পুষ্পলতা তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া তাঁহার আশার সঞ্চার হইল।

তখন ভাবিলেন,—সরলা অবলা না হইলে কি বমণীর মর্দকথা বুঝিতে পারে? ইহাদের নিকটেই সঠিক সংবাদ পাইব, মনে এই ভাবের উদয় হওয়ায় প্রভুর চন্দ্রবদন প্রফুল্ল হইল। তখন তুলসীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন,—“ভাই গোবিন্দ-চরণ প্রিয়ে, আমাদের প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ তোমার বড় প্রিয়। তিনিও তোমাকে মুহূর্তকাল ছাড়িয়া থাকিতে পাবেন না। তোমার সৌরভেই ভ্রমর সর্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে। তিনি আমাদিগকে ফেলিয়া শ্রীমতীসহ কোথায় লুকাইয়াছেন। তাহাদিগকে হারাইয়া আমরা পাগলিনী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। তুমি অবলা-জাতি, তোমার নিকট সাহসভূতি ও সাহায্য পাইব বলিয়াই তোমার কাছে আসিয়াছি। তাহাদিগের সন্ধান দিয়া আমাদিগকে প্রাণে বাঁচাও। তাহার পরই পুষ্পরাজিকে সন্ধান করিয়া বলিতেছেন,—‘হে পলাশ! হে কাঞ্চন! হে টগর! হে মল্লিকা! তোমরা মাধবের বড় আদরের বস্তু। তোমাদিগকে প্রীতি সম্ভাবন করিতে তিনি অবশ্যই এদিকে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বিরহে আমরা বড় কাতর হইয়াছি। হে প্রিয়-সখিগণ, তিনি কোনদিকে গিয়াছেন বলিয়া দিয়া সপীর মত কাজ কর।’

কিন্তু তাহারা কেহই কোন উত্তর করিল না। প্রভু ভাবিয়াছিলেন, ইহাদিগের নিকট হইতে নিশ্চয় মাধবের সংবাদ পাইবেন। তাহা না পাইয়া প্রভুর মুখমণ্ডল আবার মলিন হইল। তখন তিনি কাতরভাবে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন,—“ও বুঝেছি, ইহারা শ্রীকৃষ্ণের দাসী, তাই ভয়ে কিছু বলিতেছে না।” ইহাই বলিয়া প্রভু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, তাহার পর আবার চলিতে লাগিলেন।

কিছুদূর যাইয়া একটা শৃগন্ধ পাইলেন। তখনই মনে হইল এইত কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ পাইতেছি, তবে তিনি নিশ্চয়ই এই পথেই গিয়াছেন। ইহাতে আবার আশার সঞ্চার হইল ও সেই সঙ্গে মুখমণ্ডল পুনরায় প্রফুল্লিত হইল। তখন সম্মুখে চাহিয়া দেখেন কতকগুলি হরিণ চরিতেছে। ভাবিলেন, ইহাদের কাছে প্রকৃত তথ্য পাইব। তখন তাহাদিগকে সন্ধান করিয়া বলিতেছেন,—‘হে হরিণ দয়িতে! মাধব তোমাদের নয়ন-তৃপ্তিব জন্য প্রিয়াসহ নিশ্চয় এই পথে

গিয়াছেন, সেইজন্যই তাঁহাদের অঙ্গগন্ধ পাইতেছি। তাঁহারা কোনদিকে গিয়াছেন জানাইয়া আমাদের প্রাণদান কর।”

তাঁহারা কোন উত্তর করিল না দেখিয়া ভাবিলেন,—ইহারা বুঝি বন্ধনা করিতেছে। তাই আবার বলিলেন, “তোমরা আমাদের পরে ভাবিয়া কথা কহিতেছ না। কিন্তু আমরা পর নহি, আমরা শ্রীমতীর সঙ্করী, কৃষ্ণহারা হ’য়ে পাগলিনীর ছায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।”

মৃগগণ প্রভুর বদন পানে চাহিল। প্রভু দেখিতেছেন তাঁহাদের মুখমণ্ডল মলিন, নয়ন ফাটিয়া জল-বাহির হইতেছে। ইহাতে ভাবিলেন, ইহারাও কৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়াছে। তাই মুখে কথা সরিতেছে না।

প্রভু ভগ্নমনোরথ হইয়া আবার চলিতে লাগিলেন। সম্মুখে কতকগুলি বৃক্ষের শাখা ফলফুলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। প্রভুর মনে হইল, ইহারা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিতে যাইয়া মস্তক অবনত করিয়া আছে। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—“তোমরা ওরূপ করিয়া রহিয়াছ কেন?” তাহার পরে বলিতেছেন, “ওঃ বুঝিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমাদ্ভীমহ বিভোর হইয়া যাইতেছিলেন, তাই তোমাদের নমস্কার গ্রহণ করেন নাই; সেইজন্যই তোমরা মস্তক অবনত করিয়া আছ।”

তাহাদিগের নিকটও কোন উত্তর না পাইয়া ভাবিলেন, “অহো! ইহারা কৃষ্ণের সেবক। তিনি উপেক্ষা করায় ইহারা মন্দাস্তিক ব্যাথা পাইয়াছে, তাই ভাবের আবেগে কথার উত্তর দিতে পারিতেছে না।”

এইভাবে কাহারও নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া প্রভু হতাশ হইলেন। তখন কৃষ্ণের উপর ক্রোধাভিমান হইল। তাই মনের আবেগে কাতর-কর্কশ-কণ্ঠে বলিতেছেন, “হে নিষ্ঠুর! বিধাতা-কি তোমাকে এতই কঠিন করিয়াছেন। তোমার হৃদয়ে কি দয়াশায়ী লেশমাত্রও নাই! আমরা অবলা সরলা তোমার লাগি কুলশীল জলাঞ্জলি দিয়া আসিলাম, আর তুমি আমাদের উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলে। এতক্ষণ প্রভু মনের আবেগ ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আর পারিলেন না। বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন

আবদ্ধ জল জোরের সহিত বাহির হইয়া পড়ে, প্রভুর মনের বাঁধ ভাঙ্গিয়া সেইরূপ খরতর বেগে হৃদয়ের ভাবগুলি উথলিয়া উঠিল এবং শেষে নয়ন দিয়া অবিরাম ধারা নির্গত হইয়া বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল, ক্রমে সর্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিল, এবং শেষে মোহ পাইবার উপক্রম হইল। এইরূপ বিভোর অবস্থায় তাঁহার বোধ হইল যেন যমুনার তীরে শ্রীকৃষ্ণ নবীন নটবর বেশে ও ভুবনমোহন-রূপে জগত আলো করিয়া মোহন-মুরলী-করে ধরিয়া কদম্বতলায় ত্রিভঙ্গ ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, আব তাঁহার চন্দ্রবদন পানে চাহিয়া মুগ্ধ-মুগ্ধ হস্ত করিতেছেন।

কোন হারানিধির হঠাৎ দর্শন পাইলে হৃদয়মাঝে যে রূপ অপূর্ব ভাবের তুফান উঠিতে থাকে, শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ পাইয়াছেন ভাবিয়া প্রভুর মনের অবস্থা সেইরূপ হইল। সমস্ত উপবন ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তি আশায় একরূপ হতাশ হইয়াছিলেন। হঠাৎ সেই চিত্তচোরকে দেখিতে পাইয়াছেন এই বিশ্বাসে মনের অবস্থা এরূপ হইল যে, তিনি আর আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না, তাঁহার অবশ অঙ্গ খরখর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, শেষে সেইখানেই মুহুর্ন্ত হইয়া পড়িলেন।

এদিকে স্বরূপ, রামরায় প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে একটু পরে সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন প্রভু চেতনা-হারা হইয়া পড়িয়া আছেন, কিন্তু তাঁহার চন্দ্রবদন প্রফুল্লিত ও পুলকিত। তখন তাঁহারা প্রভুকে সচেতন করিবার জন্ত তাঁহাকে ঘিরিয়া—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।

রাম রাঘব রাম রাঘব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাং ॥

এই পদটি গাহিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ গাহিবার পর তাঁহার অচেতন-ভাব কাটিয়া গেল, তিনি চক্ষু মেলিলেন, এবং ক্রমে উঠিয়া বসিলেন।

স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে হঠাৎ-নিদ্রাভঙ্গ হইলে, মনের ভাব যেরূপ হয়,—প্রভুর বদনে তখন সেই ভাব পরিলক্ষিত হইল। তিনি বসিয়া ইতিউত্তি চাহিতে লাগিলেন,—যেন কাহার অমুসন্ধান করিতেছেন, আর আপনাআপনি

বলিতেছেন, “এই যে আমার ঝুঁকাকে পাইয়াছিলাম, আবার তিনি কোথায় লুকাইলেন!”

প্রভু তখন রাধাভাবে বিভাবিত হইয়াছেন। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার ছায় নির্মল, সরল ও সুন্দর মুখখানি জাঁধার হইয়া গিয়াছে। বহু চেষ্টায় প্রাণনাথকে পাইয়া আবার হারাইয়াছেন,—এই মর্ম-বেদনায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া বাইতেছে। একটু পূর্বে যে নব-জলধর রূপ দেখিয়াছিলেন তাহাই হৃদয়ে জাগিতেছে, কাজেই চন্দ্রবদনে নানা ভাবের তরঙ্গ খেলিতেছে। ভক্তগণ নিকটে বসিয়া তাঁহার শ্রীবদনের সেই অপূর্ণ ভাব-তরঙ্গ লক্ষ্য করিতেছেন, আর সেই ভাবে বিভাবিত হইয়া তাঁহাদেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া বাইতেছে।

স্বরূপ, রামরায় প্রভৃতি উপস্থিত ভক্তগণকে প্রভু চিনিতে পারিতেছেন না। তাঁহার বোধ হইতেছে, তাঁহার মর্দী সখীরা তাঁহার ব্যাধ ব্যাধিত হইয়া ম্লানবদনে বসিয়া আছেন। এরূপ অবস্থায় মনে অতিশয় আনন্দ কি অতিশয় দুঃখের উদয় হইলে নিজজনের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করিতে ইচ্ছা হয়। প্রভুরও ইচ্ছা হইতেছে প্রাণ-সখীদের নিকট তাঁহার ঝুঁকির কথা বলিয়া মনের বেগ লাঘব করেন। সম্মুখে স্বরূপকে পাইয়া তাঁহাকে বিশাখা ভাবিয়া কোমল হস্তে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন, এবং তাঁহার বক্ষস্থলে নিজ বদনখানি রাখিয়া গদগদ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, “বিশাখে! অনেক চেষ্টায় আমার মনচোরকে পেয়েছিলাম, কিন্তু আমি অভাগিনী, তাঁহার সঙ্গ-লাভের ভাগ্য আমার কেন হবে! তাই তিনি দেখা দিয়া আবার অদর্শন হলেন! কিন্তু সখি! তাঁহার সেই বিনোদবরণ সর্বদাই আমার হৃদয়ে জাগিতেছে! আহা! তাঁহার সেই মদনমোহন রূপের তুলনা কি দিব! ময়ূরের কণ্ঠ জিনিয়াও ঝলমল করিতেছে। তাঁহার সেই পীতবসনখানি নীলকাদম্বিনীর কোলে স্থিরসৌদামিনী সদৃশ সুন্দর। তাঁহার মোহনচূড়ার কথা আর কি বলিব! তাহা দেখিলে রমণীর কুলমান কি করিয়া থাকে বল দেখি? আহা! থরে থরে মল্লিকা, আর তাহার মাঝে মাঝে চাঁপা ও নাগেশ্বর ফুল দিয়া যে বিনোদ-কেশের বিনোদ চূড়া কত ছাঁদেই বাঁধা! চূড়ার উপর ময়ূরপাখা কি মনোহর শোভাই

ধারণ কবিয়াছে! সেই চূড়ার ফুলে আবার ভ্রমর মাতোয়ারা হইয়া ঘুবিয়া বেড়াইতেছে। সখি! তাঁহার গলায় বনমালা ঢুলিতেছে। বনফুলের মালায় যে এমন সুন্দর শোভা তাহা কখনও দেখি নাই। আহা! মন-মাতান মোহনমুরলী অধরে ধরিয়া কিবা মৃদু-মধুর হাস্য করিতেছেন,—যেন মুকুতাগুলি ধসিয়া ধসিয়া পড়িতেছে! আবার মাঝে মাঝে বংশীবধনি হইতেছে, আর সেই সঙ্গে পায়ের হুপুব বাজিতেছে। সখি! ইহাতে অবলা সবলা কুলবানা কি করিয়া ধরম রাখে বল!

রমণীর কাতরকণ্ঠস্বরে প্রভু আমার এক একটা কথা বলিতেছেন, আর তাঁহার দেহ এলাইয়া পড়িতেছে ও নয়ন-ধারায় স্বরূপের বক্ষস্থল ভাসিয়া বাইতেছে।

প্রভু একটু সামলাইয়া আবার কাতর-কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতেছেন,—

“সখি! ত্রিভুবন শীতল করিবার জন্ত নবমেঘের উদয় হইয়াছিল। কিন্তু বিধি বাম হইলেন,—কোথা হইতে প্রবল ঝড় উঠিয়া মেঘখানি উড়াইয়া লইয়া গেল। এখন চাতকিনী কিসে বাঁচে বল!

বলিতে বলিতে প্রভুর ভাবান্তর হইল। তিনি বদন তুলিয়া চাহিলেন, আর সম্মুখে রামরায়কে দেখিয়া সেইরূপ কাতর ভাবে বলিলেন,—“পড় পড় রামরায় শ্লোক পড়।” রামরায় প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণের মদন-মোহন রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া, তাঁহার দাসী হইবার বাসনা করিয়া, গোপীরা যে শ্লোকটা বলিয়াছিলেন, তাহাই পড়িলেন। রামানন্দ শ্লোক পড়িতেছেন, আর প্রভুর বদনচন্দ্র কখন প্রফুল্ল, কখনবা মলিন হইতেছে। শ্লোক পড়া শেষ হইলেই প্রভু হৃদয় উবারিয়া অতি করুণ বর্ণে ইহার অর্থ করিতে লাগিলেন। বধা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

কৃষ্ণ জিনি পদ্ম চান্দ পাতিয়াছে মুখ-ফান্দ

তাতে অধর মধুর স্মিত চার।

অঙ্কনারী আসি আসি ফান্দে পড়ি হয় দাসী

ছাড়ি নিজ পতি-বর-স্বার ॥

বাঁজব কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার। প্র

নাহি গণে ধর্মার্থ
হরে নারী-মৃগীর-মর্শ
করে নানা উপায় তাহার ॥

গণ্ডস্থল বলমল নাচে মকরকুন্দল
সেই নৃত্যে হরে নারীচর ।

সম্মিত কটাক্ষ বাণে তাঁ সবার হৃদয়ে হানে
নারীবধে নাহি কিছু ভর ॥

অতি উচ্চ সুবিস্তার লক্ষ্মী-শ্রীবৎস-অলঙ্কার
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বন্ধ ।

ব্রজনারী লক্ষ লক্ষ তা সবার মনোবন্ধ
হরিদাসী করিবারে দক্ষ ॥

অর্থ করিতে করিতে প্রভু রাধাভাবে বিভাবিত হইলেন, তাঁহার বিরহানল দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তখন তিনি ভাবে বিভোর হইয়া “হরিমর্শণ-করাটিকা প্রতীহারী বক্ষস্থলঃ” শ্লোকটি বলিতে লাগিলেন। শ্লোকটির অর্থ এই, শ্রীমতী হৃদয়ের শোক উবাড়িয়া বিশাখাকে বলিতেছেন,—“হে সখি! মদনমোহন কৃষ্ণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করাইবার জন্য আমার বক্ষ স্পৃহা বিস্তার করিতেছেন। তাঁহার বক্ষস্থল ইন্দ্রনীল, মণিমাণিক্য নির্ম্মিত কবাট হইতেও সুবিস্তীর্ণ ও মনোহর। তাঁহার ভুজবৃগল দেখিতে সুসলিল সুদীর্ঘ অর্গলের স্তায়; কিন্তু কার্যে কৃষ্ণ সর্পসদৃশ—যে নারীর হৃদয়ে একবার দংশন করেন সে বিয়ের জালায় জ্বলিয়া মরে। কিন্তু তাঁহার হস্ত ও পদতল কোটা চক্ষের কিরণ, বেনামূল, চন্দন, নীলপদ্ম ও কর্পূর হইতেও অধিক সুশীতল—যাহাকে একবার স্পর্শ করেন, তাহার হৃদয়ের জালা যন্ত্রণা সমস্ত দূর হয়।

হৃদয়ের আবেগে প্রভুর স্বর বন্ধ হইয়া আসিল, মুখে আর কথা সরে না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ধীরে ধীরে আবার বলিতে লাগিলেন,—“এইমাত্র আমার চিন্তাচোরকে পাইয়াছিলাম। কিন্তু হায়! আমার নিজ কণ্ঠদোষে আবার হারাইলাম! চপলিয়া কৃষ্ণ একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারেন না, এক নজর দেখা দিয়া অবলার মনঃপ্রাণ জীবনবোবন সমস্ত হরণ করিয়া আবার অন্তর্জান হন। ইহাই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

তাঁহার পর স্বরূপকে কাতরকণ্ঠে কহিতেছেন—যাহাতে আমার হৃদয়ের জালা জুড়ায় এইরূপ একটা গীত গাও।

স্বরূপের স্তায় প্রভুর মর্শীভক্ত রামরায় ব্যতীত আর কেহ ছিলেন না। প্রভু যখন যে ভাবে বিভোর হইতেন তাঁহার তাহা বেশ বুঝিতেন ও সেই ভাবে বিভাবিত হইতেন। সুতরাং প্রভু গান গাহিতে বলিলে স্বরূপ অতি সুমধুর স্বরে ক্ষুদ্র উবাড়িয়া গীতগোবিনদের এই গীতটি ধরিলেন—
রাসে হরিমিহ বিহিত বিলাসঃ ।

স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসঃ ॥

শ্রীভগবানের স্রষ্টির মধ্যে সঙ্গীতের স্তায় সুমধুর বোধহয় আর কিছু নাই। ইহা ভগবানের অতি প্রিয়,—গোলোকচ্যুত বস্ত্র। আবার ভগবন্ত যখন শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে হৃদয় উবারিয়া গাহিতে থাকেন তখন ইহা মধু হইতেও মধুতর বোধহয়; সুতরাং স্বরূপ যখন ভাবে বিভোর হইয়া এই পদটি গাহিতে আরম্ভ করিলেন, তখন প্রভুর কা কথা, উপস্থিত ভক্তমাত্রই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

পদটি ধরিবামাত্র প্রভুর অঙ্গ পুলকিত হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া প্রেমাবেশে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। স্বরূপ ততই গাহিতেছেন প্রভুর অঙ্গ ততই পুলকে পূর্ণ হইতেছে, আর ততই নৃত্য অধিক মধুর হইতেছে। নৃত্য করিতে করিতে প্রভু ক্রমে অধিক বিভোর হইতেছেন, আর তাঁহার দেহে অষ্টস্বাস্থিক ভাবগুলিও ক্রমে জীবন্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। আবার সমস্ত ভাবগুলি এক সময়ে উপস্থিত হওয়ায় ভাবে ভাবে মহাবুদ্ধ হইতেছে। কিন্তু সবভাবগুলিই প্রবল বলিয়া কেহই কাহাকে হারাইতে পারিতেছে না।

স্বরূপ এক একবার চুপ করিতেছেন, আর প্রভু মুখে বোল বোল বলিতেছেন ও নৃত্য করিতেছেন। যখন স্বরূপ দেখিলেন যে প্রভুর দেহ বর্ণাঙ্ক হইয়াছে ও তাঁহার ক্লাস্তি বোধ হইতেছে, তখন তিনি চুপ করিলেন। কিন্তু প্রভুর নৃত্য থামিল না, তিনি বারে বারে বোল বোল বলিতে লাগিলেন। তখন রামরায় প্রভুকে ধরিয়া বসাইলেন, আর সকল ভক্ত মিলিয়া কেহ মুখে জলের ছিটা, কেহ বাতাস দিতে লাগিলেন, ক্রমে তাঁহার ভ্রম দূর হইল, তিনি সুস্থির হইলেন; বেলী তখন অনেক হইয়াছে। প্রভুকে লইয়া সকলে সমুদ্রতীরে গেলেন। তাঁহাকে স্নান করাইয়া গৃহে আনিলেন এবং ভোজন ও শরন করাইয়া সকলে আপনাপন গৃহে গমন করিলেন।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া

শ্রীসরসিকমোহন বিদ্যাকৃষ্ণ

কলির নরনারীগণের সংসার-যাতনা হইতে পরিত্রাণের
জন্ত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার ভাবদ্যুতি লইয়া
শ্রীগৌরানুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বিশ্বনিমিত্ত
সর্বশক্তিমান্ অখণ্ড আনন্দময় প্রেমময় রসময় শ্রীভগবানের
অবতারবাদে যাহারা বিশ্বাস করেন, আমি তাঁহাদিগকে
ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করি। শ্রীভগবান্ এই প্রপঞ্চে কেন
অবতরণ করেন, শ্রীগীতায় সেই উদ্দেশ্য লিখিত আছে :—

পরিত্রাণায় সাধুণাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্

ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সন্তুভামি যুগে যুগে ॥

যদা যদাহি ধর্মস্ত গ্ৰানির্ভবতি ভারত

অভ্যুত্থানমধর্মস্ত তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

অর্থাৎ সাধুদের পরিত্রাণের জন্ত, দুষ্কৃতগণের বিনাশের
জন্ত ধর্মসংস্থাপনের জন্ত ভগবান্ বলেন আমি যুগে যুগে
অবতীর্ণ হই।

তিনি আরও বলেন—যখন যখন ধর্মের গ্ৰানি হয়
অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই জগতে অবতরণ করি।

শ্রীমদ্ভগবৎ গীতায় ভগবদ্ অবতরণের এই যে হেতুর
উল্লেখ হইয়াছে, এই হেতুগুলি শ্রীভগবানের বহুবিধ অবতারের
পক্ষে প্রযোজ্য বটে। কিন্তু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অবতরণ-
হেতু সর্বাংশে এইরূপ নহে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত
আছে, ভূভারাদি হরণ-স্বয়ং ভগবানের কার্য নহে। ভূভার-
হরণ, অমুর বিনাশ প্রভৃতি কার্য বিষ্ণুশক্তি দ্বারা সম্পন্ন
হইয়া থাকে। অংশাবতার কলাবতার প্রভৃতির দ্বারা এই
সকল কার্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মজ্ঞানন্দন
শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরানুরূপে অবতরণের অন্ত হেতু আছে। সেই

হেতু দ্বিবিধ। একটি অন্তঃরঙ্গ আর একটি বহিঃরঙ্গ।
শ্রীকৃষ্ণাবন লীলায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা এবং তাঁহার
স্বকীয় মাধুর্য্য তথা তদনুভবে শ্রীরাধার সুখই বা কেমন :—
এই তিনটি বিষয়ের অনুভব-আন্বাদনার্থ শ্রীগৌরানুরূপে
অবতরণের অন্তঃরঙ্গ উদ্দেশ্য।

বহিঃরঙ্গ উদ্দেশ্য হইতেছে ভগবান্ ও প্রেম নরনারী-
গণের মধ্যে প্রচার করিয়া সংসার দুঃখ হইতে তাহাদের
উদ্ধার করা। এই অবতরণের ইচ্ছাই বৈশিষ্ট্য। যখন
ভগবৎ বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তখন পণ্ডিত সমাজে
তাঁহার সম্বন্ধে কোন জ্ঞানলাভ করিতে হইলে সাধারণতঃ দুইটি
উপায় অবলম্বিত হয়।

তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধান ও তাঁহার লীলা শ্রবণ। তত্ত্বানুসন্ধান,
দার্শনিক ব্যাপার এবং জ্ঞানেরই কার্য। কিন্তু লীলাশ্রবণ
স্বভাবতঃ সকলের পক্ষে আনন্দজনক বিশেষতঃ এই দৈন্ত-
দারিত্য রোগ-শোক-মৃত্যু প্রভৃতির দ্বারা উৎপীড়িত নরনারী-
গণের সংসার যাতনা হইতে বিমুক্ত লাভের উপায় বলিয়াই
শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণকৈশোবয়ন বেদব্যাস নিজেই তদ্রচিত শ্রীমদ্ভাগবতে
উপদেশ করিয়াছেন,—যথা।

সংসার সিদ্ধমতিদুস্তর যুংতিতীর্থো

নীলঃ প্রবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্ত

লীলাকথা-রস-নিষেবণমন্তরেণ

পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবাস্তিতস্ত ॥*

অর্থাৎ দুঃখ-রোগ-জ্বালাময় সংসার রূপ অতি দুস্তর সাগর
হইতে যিনি পরিত্রাণ লাভের ইচ্ছা করেন ভগবান্ পুরুষোত্তমের
লীলা-কথা নিষেবণ ভিন্ন তাঁহার পক্ষে অন্য উপায় নাই।

*এই শ্লোকটির প্রথম পাদে সংসারকে সিদ্ধরূপে আরোপিত করা হইয়াছে। আবার চতুর্থ পাদে সংসার-সিদ্ধিতে পতিত
জনকে দবাস্তিত বলা হইয়াছে। দব শব্দের অর্থ সাধারণতঃ বনাদি বলিয়া প্রসিদ্ধ কিন্তু সেই অর্থ অবলম্বনে বিচার
করিলে উহা বিবৃদ্ধ দোষাশ্রয় হইয়া পড়ে। টীকাকারগণের মধ্যে শ্রীধর, বীররাঘব, বিজয়ধ্বজ প্রভৃতি এদিকে দৃষ্টিপাত
করেন নাই। দৃষ্টি পড়িয়াছে কেবল আমাদের দেশের সুন্দরদর্শী সুরসিক রসজ্ঞ টীকাকার শ্রীপাদ বিদ্যনাথের। তিনি
দব শব্দের জ্বালা অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। ফলতঃ দব শব্দের বহু অর্থ আছে। কাঠ, বন, বনাদি—যথা 'বিতর
বারিদবারিদবাতুরে', 'অগ্নি, জ্বালা জড়, ব্যথা ইত্যাদি।

দয়াময় শ্রীভগবানের প্রপঞ্চে অবতরণের উদ্দেশ্যমূলে না। নয়ন জলেও বিরহব্যথা কিয়ৎপরিমাণে প্রশমনের কার্য্য একটি হেতু। শ্রীগোরাঙ্গ অবতারের-মুখ্য হেতু নিজ রসাস্বাদন হইলেও জীবের প্রতি করুণা যথেষ্টই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই করুণার মূলে আছেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। ইহার চরিত্রে চিন্তনে চিন্তাশীল ভক্তগণ ও পণ্ডিতগণ বহু প্রয়োজনীয় তথ্য জানিতে পারেন বলিয়াই আমার ধারণা। প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্বে তৎসাময়িক সদাচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারে মেয়েদের চরিত্রে যে সকল সদগুণ পরিলক্ষিত হইত এখন আমরা তাহা চিন্তায় আনিতে পারি না। যে দিন জাহ্নবী তটে কিশোরী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শচীমাতার শ্রীচরণ দর্শন পাইলেন সেইদিন হইতে তাঁহার চরিত্রে অতি সামান্য একটুকু ভাব প্রকাশ পাইল।

শচীদেবী জাহ্নবী তটে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখিবা মাত্রই এই বালিকার সর্ব্ব মূলক্ৰম সম্বন্ধে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং ইনি যে তাঁহার সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্রের অমূল্য সহস্রশ্রী উপযুক্ত পাত্রী তাহাও বুঝিয়াছিলেন।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পতিসেবা শশ্রুমাতার সেবা প্রভৃতি গৃহস্থকুলবধুর পূর্ণদর্শ। অতি অল্প দিন মাত্রই তিনি সাক্ষাৎভাবে স্বামিসেবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধা মেহময়ী শশ্রুমাতার সেবা তাঁহার সমগ্র জীবনের কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার তীব্র বিরহব্যাকুল হৃদয় প্রিয়তম পতি-দেবতার চরণ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিত। মাহুকের ভাষায় তাঁহার বিরহব্যাকুলতা প্রকাশিত হইতে পারে না। যে বিরহ চোখের জলে ভাষার বিলাপে এবং সখীজন-সমক্ষে মন-ছুঃখ-প্রকটনের পথ পায়, প্রশান্তির উপায় পায়, তাহা অতি বড় প্রবল হইলেও একেবারে নিদর্শন-বিহীন নহে। শ্রীরাম-বিরহে সীতার শোক, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে রাধিকার বিলাপ, মহা স্বামী বিরোগে সাবিত্রীর হৃদয়-জ্বালা নরনারীর চিন্তকে শোকসম্পূর্ণ করে। অথচ এই সকল বিরহিণীদের পতিপ্রাপ্তির আশা ছিল, কিন্তু আদর্শ সন্ন্যাসীর পূর্বাশ্রমের পতিব্রতা পরীর পক্ষে স্বামীর জীবদ্দশাতেও আর পুনর্দর্শনের আশা থাকে না। সুতরাং আগ্নেয়-গিরির জ্বায় ইহাদের শোকের জ্বালামালার সময়ে এইরূপ পতি-বিরহী পতিব্রতার শোকের সময় প্রবোধ দিবার কোন উপায় থাকে

না। নয়ন জলেও বিরহব্যথা কিয়ৎপরিমাণে প্রশমনের উপায় শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার ছিল না। তাঁহার নয়নকোণে অশ্রু বিন্দু দেখিলে শচীমাতা অধীরা অস্থিরা ব্যাকুলা হইয়া পড়িতেন। সুতরাং শোকের অশ্রুবিন্দুপাতও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার সখীজন সঙ্গ সম্বন্ধে কোন প্রশঙ্গ দৃষ্ট হয় না। সেরূপ থাকিলেও তাঁহার সম্বন্ধে সে আলাপ বিলাপের সুবিধা ছিল না। কেননা তিনি দিবানিশি পরমমেহময়ী পুত্র-শোকাতুরা শশ্রুমাতার সেবাকার্য্যে অমূল্য নিযুক্ত থাকিতেন।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ জীবন যে কি দুর্কিসহ তাহা সহজেই অনুভব করা বাইতে পারে।

মহালক্ষ্মী পরম ব্যোমাধিপতিকে স্বরূপ সেবা করেন, পুরাণে তাহার বিবরণ আছে। শ্রীকৃষ্ণাবতারে নিকুঞ্জকাননে ব্রজবধু-শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা নিকুঞ্জবিহারীকে যে প্রেমে মুগ্ধ ও বশীভূত করেন, ভাগবতে, জয়দেবের গীতগোবিন্দে, চণ্ডীদাস ও বিষ্ণুপতি প্রভৃতির পদে,—আমরা সে প্রেমের ভাব, ভাষা ও স্বাক্ষরের লেশাভাসের প্রকাশ কিছু কিছু দেখিতে পাই কিন্তু শ্রীনবদীপে মহামহাশক্তি-স্বরূপী শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়ার প্রেম কোনও ভাষাতেই প্রস্ফুট হয় না,—সে এক মহা সংঘম-রূপ মহাগিরিনিরুদ্ধ নিরাবিল অনন্ত মাধুর্য্যময় মহাপ্রেমের বিপুল উৎস। শ্রীগোরাঙ্গের দয়া ভিন্ন সেই তত্ত্বলাভের অপর উপায় নাই। যে পরিমাণে নিষ্ঠাময়ী শ্রীগৌর সেবার অর্চনা হইবে, সেই পরিমাণে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব প্রকটিত হইয়া সাধকের ও তৎসম্পর্কে জগতের অনেক কল্যাণের সূত্রপাত হইবে।

শ্রীগোরাঙ্গের লীলা-লেখকগণ চরিতাখ্যানের সকল দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই। ভক্তিতাব পরিস্ফুট করিয়া তোলাই তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য, এইজন্য শ্রীগোরাঙ্গের গার্হস্থ্য চরিতের কথা ইহাদের গ্রন্থে সবিশেষ আলোচিত হয় নাই। তথাপি ছুই একটি বাক্যের তাৎপর্য্যেই সে সম্বন্ধে বহু কথাই আভাষ পাওয়া যায়। শ্রীলম্বুরারি গুপ্ত তদীয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বিলাস-বিস্রমৈঃ

ররাজ রাজস্বরহমগৌরঃ

বিষ্ণুপ্রিয়া লালিতপাদপঙ্কজো

রসেন পূর্ণো রসিকেজ্জমৌলিঃ।

পত্র-সংগ্রহ

জয় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরহরি।

স্বর্ণগ্রাম, (ঢাকা)* ২৬শে মার্চ

জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ-গৌরাদ নদীয়াবিহারী।।

শ্রীশ্রীচরণেশ্বর—

প্রাণের দাদা, আজ শ্রীবসন্ত-পঞ্চমী—শ্রীমতী বিষ্ণু-প্রিয়াঙ্গীর আবির্ভাব তিথি। আজ প্রিয়াঙ্গীর নামে একটি ছত্র লিখিয়া তাহাই আপনার শ্রীকরে অর্পণ করিয়া আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

আজ শ্রীবসন্ত-পঞ্চমী। ধরিত্রী হরিষর্ষের মাটি-পরিধান করিয়া নব-সাজে সজ্জিতা হইবেন। শীতের গাঢ়শৈত্য ও ছড়িয়া আজি হইতে দূরে সরিয়া যাইবে। কোকিলবধু আজি হইতে বাসন্তী-পঞ্চমে জগতের নব-জাগরণ ঘোষণা করিবে। আজিকার এমন দিনে শ্রীনবদ্বীপে রাজমন্ত্রী মিশ্র সনাতনের গৃহের যাবতীয় অঙ্ককার বিদূরিত করিয়া দেবী আনন্দময়ী প্রিয়াঙ্গীর আবির্ভাব হইয়াছিল।

সনাতনের গৃহে আজ আনন্দের সীমা নাই। মিশ্র সম্পতির হৃদয়াকাশে আনন্দ ঝলসিয়া উঠিতেছে। সে আনন্দ-মাধুর্যের উজ্জলিমা বাহিরের আবরণ ভেদ করিয়া সমগ্র গৃহধানিকে উজ্জল করিয়া তুলিয়াছে। আজ প্রকৃতি ভিতরে-বাহিরে হান্তময়ী। আজ সুহাসিনী বিষ্ণুপ্রিয়া জগতে আবির্ভূতা হইবেন।

আজ তোমরা সনাতনের জয়ধ্বনি দাও। বাঁহার অলিন্দে ভুবনপাবনী গৌরাদ্বেগহিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার আবির্ভাব হইয়াছিল—সেই সনাতনের জয়ধ্বনি দাও। আমরা জগতের সেই পরম-মঙ্গলময় মুহূর্তটিকে পুষ্প-চন্দনে ও নানা আভরণে বিভূষিত করি।

“আজ রজনী হাম ভাগে পোহায়ু

পেঞ্চম প্রিয়া মুখ-চন্দা।”

দাদা। গতকল্য প্রিয়াঙ্গীর নাম উচ্চারণ করিতে চক্ষু

অশ্রুসিক্ত হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে একটি ভাব মনে জাগ্রত হইল। ভাবিলাম—তিথিটির অর্চনা করি। তাই, আজ আপনার এই অধ্যম ভ্রাতার কুটারে প্রিয়াঙ্গীর আবির্ভাব-উৎসব। আজ আপনার কৃপাশীর্ষাদ প্রার্থনা করি। আপনার চরণে শত কোটি প্রণাম।

আপনার একান্ত মেহের ভাই

শ্রীযোগেন্দ্র ঘোষন

জয় শচীনন্দন।

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ।

ইলুহার

তাং ১১-১২-৪৩

শ্রীশ্রীচরণকমলেশ্বর,

পাদপদ্মে অসংখ্য প্রণতিপূর্বক নিবেদন—

প্রাণের দাদা, কৃপাপত্র পাইয়াছি। আদিষ্ট ও ঐচ্ছিক-চরিতামৃত ইতিমধ্যে পাইয়াছেন মনে হয়। আপনি পড়িয়া শ্রীত হইলে শ্রম সার্থক হইবে। সনাতন-শিক্ষার টীকা লিখিতে লিখিতে প্রভুর অপূর্ণ লীলা-রহস্যই দেখিতে পাই। কাশীতে প্রভু বহিরঙ্গভাবে সম্মানী বটে, এবং আত্মগোপন করিয়া ভক্তভাবে কখনো উদ্ধবের ভাবে, কখনো মথুরানাগরীর ভাবে, বিশ্বমঙ্গল ঠাকুরের কর্ণামৃতের শ্লোক লইয়া সনাতনের হাত ধরিয়া কৃষ্ণমাধুর্য আশ্বাদন করিতেছেন; ঠিক সেই সময় তিনি শ্রীনবদ্বীপে এরূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন যে—ঠাকুর নরহরি, বাসুদেব, শেখর রায় প্রভৃতি গৌরমাধুর্য আশ্বাদন করিতেছেন। প্রভু কৃষ্ণরূপ দর্শনের কথায় কহিতেছেন—“না দিলেক লক্ষকোটি সবে দিলে জাঁধি ছুটা-ইত্যাদি, সরকার ঠাকুর গৌর” দর্শনের বিষয় কহিলেন—“হৃদি-সরোবরে গৌরাদ পশিল সকলই গৌরাদময়। এ ছুটা নয়নে কতবা হেরিব, লাখ অঁখি যদি হয়।” প্রভু সনাতনের কাছে “গোপান্তপঃ কিমচরন” শ্লোক আশ্বাদন করিতে ধাইয়া বলিলেন বংশীধ্বনিরূপ চক্রবাত (ঘুনিবায়ু) তৃণ-পত্র সদৃশ নারীর মন উড়াইয়া আনিয়া কৃষ্ণের তারুণ্যামৃত পারাবারে ভাবোদগমরূপ আবর্তের মধ্যে নিয়া ডুবায় আর উঠিতে দেয় না। আর এদিকে ঠাকুর

* এই পত্রখানি বহু বৎসর পূর্বে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের নিকট লিখিত।

নরহরি সেই সময় গৌররূপ আশ্বাদন করিয়া বলিতেছেন—
“গৌররূপ অমিয়াপাখার। ডুবিল তরুণীর মন, না জানে
সাঁতার।”

গৌরাজ্জ ভক্তভাবে কৃষ্ণরূপ-সুখা, চুমুকে চুমুকে পান
করিতেছেন, আর নবদ্বীপে ভক্তগণ গৌররূপ-সুখা ঢালিয়া
ঢালিয়া খাইতেছেন। এ প্রতিযোগিতায় গৌরভক্তেরই যেন
জিত হইল। প্রভু কৃষ্ণমাধুর্য আশ্বাদন করিতে তত্ত্বকথা
কহিতেছেন, যথা:—“আনের বৈভব-সভা কৃষ্ণদত্ত ভগবতা
শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বঅংশী সর্ব্বাংশী।” ইত্যাদি। গৌরভক্তগণ
শ্রীনবদ্বীপে গৌররূপ-রস-সায়রে একেবারে ডুবিয়া যাইতেছেন।
এখানেও গৌরভক্তের জয়। গৌরাজ্জ ইচ্ছা করিয়াই হার
মানিতেছেন। প্রভু কৃষ্ণামৃতের শ্লোক আশ্বাদন করিতেছেন
—মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোমধুরং মধুরং বচনং মধুরং।
এখানে বিভো: কথাটা দ্বারা মধুর্যের মধ্যে ঐশ্বর্যের আভাস
আসিতেছে, আর শ্রীনবদ্বীপে শেখর রায়ের “মধুর মধুর
গৌরকিশোর মধুর মধুর নাট। মধুর মধুর সব সহচর মধুর মধুর
হাট ॥ মধুর রসেতে মাতল ভকত মধুর মধুর গান” ইত্যাদি।
এখানে ছাঁকা গৌরমাধুর্য, এবং যখন গৌরকিশোর বলা
হইয়াছে, তখন পদবর্ণিত মধুর রস বলিতে গৌর বিষয়ক
মধুর রসই বলা হইয়াছে। এখানেও গৌরভক্তের জয়।

আর একটা অপূর্ব্ব-কথা। প্রভু সনাতনকে কহিতেছেন,
—“কৃষ্ণের ঐশ্বর্য অপার অমৃতের সিদ্ধ। অবগাহিতে
নারি’ তার ছুইল এক বিন্দু।” প্রভু কৃষ্ণের ঐশ্বর্যামৃত-
সিদ্ধিতে অবগাহন করিতে না পারিয়া এক বিন্দু ছুইলেন।
আর, মদনমোহন কি কহিলেন? না—“গৌরলীলামৃত
সিদ্ধ অপার অগাধ। কে করিতে পারে তাঁহা অবগাহসাধ ॥
তাঁহার মাধুরী-গন্ধে লুপ্ত হয় মন। অতএব তটে রহি’ চাখি
এক কণ ॥” (আদি দ্বাদশ)। কবিরাজ গোস্বামী যখন বলেন,
—“এইগ্রহ লেখায় মোরে মদনমোহন। আমার লিখন
যেন শুকের পঠন ॥” তখন ইহা মদনমোহনেরই বাক্য।
অর্থাৎ, মদনমোহন গৌরলীলামৃতসিদ্ধ বটে থাকিয়া
এককণা চাখিতেছেন। দুঃখ হয়, বর্তমান গোস্বামিগণ গৌর-
লীলামৃতসিদ্ধর ধার দিয়াও যান না। কবিরাজ গোস্বামী
যে লিখিলেন,—তিনি কৃষ্ণলীলা বা মহিমা এই গ্রন্থে লিখিয়া-

ছেন, গৌরলীলা ও মহিমা বুখাইবার ক্ষম। কৃষ্ণমহিমা
প্রধান বক্তব্য-বিষয় নহে,—গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় গৌর।
গৌরভক্তনই কবিরাজ গোস্বামীর সারসিদ্ধান্ত। আর
বর্তমান গোস্বামিগণ এই গ্রন্থ হইতে বাছিয়া বাছিয়া ঐ
কৃষ্ণকথা কয়টা নিয়া—কৃষ্ণভক্তনই সাধ্য, গৌরকে সাধন নির্ণয়
করিলেন। এই আওতায় পড়িয়া সেদিন একটা গোস্বামি-
যুবক আমাকে চিঠি দেন যে,—তাঁহার গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ভক্তন
করিতেই অমুদ্রাগ, কিন্তু গৌর যে কৃষ্ণকেই সাধ্য বলিয়াছেন,
তাঁহার সামঞ্জস্য কি? আরো অনেকে এতাদৃশ প্রশ্ন করিয়া-
ছেন। অবশ্য প্রভু যেরূপ লেখাইয়াছেন সেইরূপ উত্তরই দেওয়া
হইয়াছে। এই যুবকটা একটি হাই-স্কুলের হেডমাষ্টার।

আর একটা রসের কথা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গৌরকে
বলিলেন,—“পরতত্ত্ব সীমা”, আর বাসুদেব ঠাকুর দেবী
বিষ্ণুপ্রিয়াকে কহিলেন,—“প্রেম-রস-সীমা”। তাঁহার যে পদ
‘রাধার মহিমা প্রেম-রস-সীমা জগতে জানাত কে!’ এখানে
রাধা বলিতে যে বিষ্ণুপ্রিয়া বুঝায়, তাহা সহজেই বোধগম্য।
রাধা অর্থ, চৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন আরাধিকা। (আদি,
চতুর্থ)। কৃষ্ণ অবতারে তিনি বৃষভানন্দনন্দিনী, গৌর-
অবতারে তিনি সনাতননন্দিনী। গৌর, বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে
এতই মিষ্ট, এতই মধুময়, এতই প্রাণসর্ব্বস্ব, যে—তিনি এই
বস্তুটিকে তাঁহার প্রিয়-জীবের উপভোগ্য করার সুযোগ
করিয়া দিলেন,—তাই জগতে তাঁহার প্রেমের মহিমা জানিল।
কৃষ্ণলীলার যেমন পূর্ণ-প্রকাশ গোরে, শ্রীরাধারও তেমন পূর্ণ-
প্রকাশ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতে। শ্রীচরিতামৃতকার শ্রীরাধাকে
বলেন,—কৃষ্ণলীলাসমূহের “বসতি নগরী,” আর বংশীবদনানন্দ
ঠাকুর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে বলেন,—গৌরলীলার “ধাম”। বাসু
দেব ঠাকুর বলিলেন,—বৃন্দাবিনিনমাধুরীতে প্রবেশ করিতে
চাতুরীই সার। সেই চাতুরী কৃষ্ণভক্তন সম্বন্ধে গৌর
শিখাইলেন,—মাগুবেব যে স্বাভাবিক ভালবাসা নামে একটা
বস্তু আছে, উহা কৃষ্ণে অর্পণ করিতে হয়। আর বাসু
দেব ঠাকুর শিখিলেন কি? না—তাঁহারা ভাবিলেন ও
দেখিলেন—“সেই ত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য গোসাঞি।”
আর বৃন্দাবনে আমরা যাব কেন! গৌরকেই তাঁহারা সেই
ভালবাসা দিলেন। তাই মহাজনগণ বলিলেন,—“ফুটল-

শ্রীমদ্রাবন সুরধুনী ধারে।” আর বস্তুতঃ সকলে যুগপৎ নবদ্বীপরস ও ব্রজরস আশ্বাদন করিলেন। ইহার মূলে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া,—বিষ্ণুপ্রিয়াই সকলকে এইরূপ ভাববাসিতে অবসর দিলেন, গোরকে নবদ্বীপে রাখিয়া ও নবদ্বীপের বাহিরে পাঠাইয়া উভয়ত্রই এবং উভয় সময়ই। বস্তুতঃ গোরের সহিত বিষ্ণুপ্রিয়াব মিলনের পরই প্রেমরস ফুটিয়া উঠিয়াছে। গোরই বাস্তব বোধের উপাত্ত, প্রেষ্ঠ, ভজনীয়। তাই তিনি কহিলেন,—“গাও গাও পুনঃ গোরাক্ষের গুণ” ইত্যাদি। স্তবরাং শ্রীরাধা যে প্রেমরসসীমা তাহা বিষ্ণুপ্রিয়াতেই পূর্ণ প্রকাশমান।

আর একটা রহস্য। প্রভু সনাতনকে কহিলেন,—“কাম গায়ত্রী মন্ত্ররূপ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ সার্বভৌম অক্ষর তায় হয়।” কাম দেবায় বিষ্ণুহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তস্মোইনঙ্গ প্রচোদয়াৎ—এই সাড়ে চব্বিশ অক্ষর। শেষের তৎ স্বরবর্ণ সংযুক্ত নয় বলিয়া সম্ভবতঃ এইটী অর্দ্ধ। কেহ কেহ ‘স্ব’কে অর্দ্ধ অক্ষর ধরেন, কিন্তু তাহাতে দুই ‘স্ব’তে (২+২) এক অক্ষর হয়, তাহাতে সাড়েচব্বিশ না হইয়া চব্বিশ হয়। সে বাহ্য হোক, এই গায়ত্রীর কথা প্রভু বলিলেন কেন? প্রভু ও তাঁর পার্শ্বদগণ মহামন্ত্রইত জপ করিতেন। প্রভু সর্বোচ্চর সকলের পক্ষে বাহ্য সহজে গ্রহণীয় সেই মহামন্ত্রই তিনি উচ্চৈঃস্বরে সকলকে উপদেশ দিয়াছেন—পূর্ববঙ্গে, নবদ্বীপে ও নবদ্বীপের বাহিরে। এই মহামন্ত্রে অমৃত্যুর বিসর্গ নাই—শুদ্ধ নাম। “নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাই, তিন চিদানন্দরূপ।” ঠাকুর নরোত্তমও বলিলেন “নাম মন্ত্রে

করিয়া অভেদ।” তবে কথা বোধ হয় এই, সেই সংস্কৃতের কচকচির দিনে, বিভিন্ন দেবদেবীর পূজায় যেমন দেবদেবীর গায়ত্রী ছিল; তাই কৃষ্ণের গায়ত্রীর কথা বলা হইল, কেননা সনাতনকে দিয়া বৈষ্ণব স্মৃতি লেখাইতে হইবে। সেই বৈদী ভক্তির দিনে বিধি আচরণ যাহারা না করিয়া পারেন না তাঁহাদিগকে কৃষ্ণবিশয়ক বিধি, বৈষ্ণবস্মৃতিতে দেওয়া হইল, যেন উহা রাগে পরিণত হয় বা রাগরঞ্জিত বিধি হয়। প্রভু কিন্তু গায়ত্রীমন্ত্রের কথা কহিয়া সাড়ে চব্বিশচন্দ্র ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা সকলই মাধুর্য্যময়, যথা—কৃষ্ণযুগচন্দ্র (১), দুইগুণ (৩), ললটি (৩২), চন্দনবিন্দু (৪২), করনখচন্দ্র (১৪২), পদনখচন্দ্র (২৪২) ইহা হইতে বিধির উদ্ভব হইল এবং গুরুগিরি ব্যবসায় আরম্ভ হইল। তাই হাট-পত্তনে দেখা যায়—সদাগর হইয়া কেহ বেতন লইল। সদাগরী করিতে করিতে আসল জিনিষ খেল হইয়া যায়। অর্থের লোভ এমনই। তাই, “নরোত্তম দাস আর শ্রীশ্রীনিবাস অলঙ্কার ঝালাইয়া করিল প্রকাশ।” অর্থাৎ এই দুইজনকে গোর-বিষ্ণুপ্রিয়াভজন প্রকাশ করিলেন।

বহু সিদ্ধিলাভ, দাদা! সংক্ষেপে শেষ করিলাম। বহু যুবক-মিলিয়া একটা শ্রীগৌরানন্দ-যুব-সমিতি করিয়াছেন। বিনোদবিহারী অমরবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ২৫।৩০টা-কেন্দ্রে এইরূপ হইবে মনে হয়। * * * *

আমার দেহ মন্দ নয়। আপনার শ্রীঅঙ্গের কুশল দিবেন। জগৎ গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া।

স্নেহের বিধু।

শ্রীখণ্ডে শ্রীশ্রীবসন্ত-পঞ্চমী

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন ঘোষ

সে বাংলা ১৩৩৪ সাল, মাঘের প্রথম-ভাগ। বড় শীত। শ্রীনবদ্বীপ হইতে আসিবার কালে দাদা শ্রীহরিদাস গোস্বামী মহোদয় বলিয়া দিয়াছিলেন,—“যোগেন্, যদি গৌরপ্রীতি দেখিতে হয়, শ্রীখণ্ড যাইবে।” আমি বলিলাম,—“তথ্য কাহার গৃহে উঠিব, একখানি চিঠি দাও।” তিনি বলিলেন, “চিঠি দিব না। বিনা চিঠিতে একবার পরীক্ষা করিতেই যাও। দেখিবে, তাহারা মনুষ্যকে কেমন ভালবাসিতে জানে। তবে, রাখালানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের গৃহে উঠিবে।

গোসাইজীর কথা শ্রবণ করিয়া কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া প্রথমে কাটোয়া পৌছিলাম। কাটোয়া হইতে বর্তমান-কাটোয়া লাইট রেলওয়ে ধরিয়া যখন শ্রীখণ্ডে পৌছিলাম তখন অপরাহ্ন। সঙ্গে সামান্য কিছু শীত-কাপড় ও একটি ব্যাগ। আমি ধীরে ধীরে শ্রীখণ্ডের পথ ধরিয়া গ্রাম অভিমুখে চলিলাম। পথে চলিতে চলিতে মনে হইতে লাগিল, সেই পুরাতন যুগের স্মৃতি ঘেন ছবি ধরিয়া আমাব চোখের সম্মুখে উদয় হইতেছে। এই সেই মহাপ্রভুর অতিপ্রিয় নরহরির ভূমি, সেই মুকুন্দ-রঘুনন্দনের ভূমি, সেই লোচনের কবিশ্বের পীঠ, এই তাঁদের চরণ-পূত ধূলি। সাড়ে চারিশত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, সেই পুরাতন-নবদ্বীপ আজ নাই, কিন্তু নরহরির শ্রীখণ্ড যেমন তেমনই রহিয়াছে। আমি চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে, পথ ঘাট মাঠ বৃক্ষ লতা গুল্ম প্রভৃতি দর্শন করিতে করিতে আপন ভাবে আপনি তন্ময় হইয়া চলিয়াছি। অপরিস্রুত ভূমি বলিয়া যে একটা সঙ্কেত তাহা ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইল। কি এক মাধুর্যময় দিব্যভাব আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল।

গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া আমি ঠাকুর-পাড়ায় শ্রীল রাখালানন্দ ঠাকুর মহোদয়ের গৃহে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, রাজগুরু ঠাকুর-মহাশয়ের বাটীর কোন প্রকার বাহ্যিক আড়ম্বর বা সাজসজ্জা নাই। অতি সাদাসিধে সাবেকী ধরণ। বহির্বাটীর খণ্ডটিতে প্রবেশ

করিয়া দেখিলাম,—দালানখানি অতি প্রাচীন। বৈঠকখানা-গৃহে সাজসরঞ্জামের ভিতরে একখানি পুরাতন খাট, তদুপরি একটি অর্দ্ধমলিন বিছানা, এবং একটি জীর্ণ তাকিয়া। গৃহের এক পাশে একটি সাবেকী ধরনের বৃহৎ সিন্দুক। সেখানে একখানি পুরাতন মাদুর পাতা। গৃহান্তরে একটি লোককে দেখিতে পাইয়া ঠাকুর মহাশয়কে সংবাদ দেওয়ার জন্য পাঠাইয়া, আমি মাদুরখানির উপরে উপবেশন করিলাম, এবং তাঁহার জন্য সসম্মানে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম,— ঠাকুর মহাশয় মহাপণ্ডিত লোক, তাহাতে কাসিমবাজার রাজবাটীর গুরু, না জানি কত ধীর-গম্ভীর ও দান্তিক হইবেন। কিন্তু অচিরেই আমার সেই ভ্রম দূরীভূত হইল। কৃশকায় পণ্ডিতমহাশয় একটি হুকা হাতে লইয়া হাসিতে হাসিতে আমার সম্মুখে আসিলেন, এবং আমাকে ভ্রাতৃ সম্বোধনে আনন্দিত করিয়া ঐ মাদুরেরই উপরে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সরলতাময় মধুর সন্তোষে প্রথম দর্শনেই তিনি আমাকে আপনাত করিয়া ফেলিলেন। কিঞ্চিৎ পরিচয়াদির পরেই বলিলেন,—“আমার বড়ই সৌভাগ্য, আপনাকে অতিথিরূপে পাইয়াছি। যদি আসিয়াছেন দুই একদিন থাকিয়া যাইবেন।” ইহাই বলিয়া তাঁহার চতুর্পাঠীর দুইটি ছাত্রকে ডাকিয়া বলিলেন,—“ইহাকে যত্ন করিবার ভার তোমাদের উপর রহিল। ইহার যখন যাহা প্রয়োজন, তোমরা সমাধান করিবে। আপাতত ইহাকে লইয়া সমগ্র শ্রীখণ্ড ঘুরিয়া আইস।” আমি কালবিলম্ব না করিয়া একটি ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া শ্রীখণ্ড ভ্রমণে বাহির হইলাম। কিয়ৎকাল ঘুরিয়া দেখিলাম,—গ্রামটি বিভিন্ন পাড়ায় বিভক্ত। ঠাকুরপাড়া, কায়তপাড়া, নবশাখপাড়া প্রভৃতি হিন্দু জাতির ভিতরে যতগুলি শ্রেণী বর্তমান, মুসলমানক্রমে বিভক্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় জাতিগোষ্ঠীসহ একসঙ্গে বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে ঠাকুরপাড়াটা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সমৃদ্ধিশালী। পুরাতন ইষ্টকালরে পাড়াটি পূর্ব। পুরাতন দ্বিতল অষ্টালিকা-

গুলি অতীতের স্মৃতি জাগ্রত করিয়া দেয়। আবাসবাটী-গুলি বড় শৃঙ্খলাক্রমে অবস্থিত। পরিষ্কৃত অগ্রসত্তা-গুলি, দুই পার্শ্বে বাড়ী। মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্রগৃহগুলি বিশেষভাবে দর্শনীয়। প্রতি বাটার অভ্যন্তরে সুন্দর পরিষ্কৃত প্রাঙ্গণ। চারি ভিটাতে খড়ের নাতিবৃহৎ বর। বরের নমুনা প্রাচীন বস্ত্রের। প্রতি প্রাঙ্গণ বা উঠানের মধ্যস্থলে একটি মড়াই। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, উহা ধানের মড়াই। ক্ষেত হইতে-নুতন ধান উঠিয়াছে। প্রতি গৃহে এইরূপ মড়াই করিয়া সঞ্চয়সরের ধোঁরাকী ধান মজুত রাখা হয়। ধানের সহিত অপরাপর শস্তও এইরূপে রক্ষিত হয়। নরনারীর মুখমণ্ডল-মিষ্ট-হাস্তময়। বালকবালিকার আনন্দ-কোলাহলে সমগ্র গৃহটি পরিপূর্ণ। লক্ষ্মীর শ্রী যেন গৃহে বিরাজমান। দেখিয়া মনে হইল, যদি আজ কাহারও সেই কিশোর গৌরাদের নদীয়া-নগরী দেখিতে ইচ্ছা হয়, তিনি যেন আসিয়া, শ্রীখণ্ডে দর্শন করেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রাচীন নবদ্বীপ যে-ভাবে তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে, শ্রীখণ্ডে আসিয়া তাহা মিলাইয়া লইতে পারিবেন।

সন্ধ্যায় ঠাকুরগৃহে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলাম, বৈঠকধানায় স্থানীয় বহু ভক্তলোক বসিয়া আছেন। ঠাকুর মহাশয় বলিলেন,—“আপনি আসিয়াছেন জানিয়া ইহারা আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন।” সৌজন্য ও শিষ্টাচারে তাঁহারা আমাকে আপ্যায়িত করিলেন। রাত্রি অধিক হইলে ক্রমে তাঁহারা চলিয়া গেলেন। এদিকে ঠাকুরপাড়ার নানা গৃহ হইতে আমার জ্ঞাত প্রসাদ আসিয়া উপস্থিত। আমি ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ঠাকুর মহাশয় বলিলেন,—“শ্রীখণ্ডবাসীগণ মনে করিতেছেন, আপনি সকলেরই অতিথি।”

পরদিন অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিতে পাইলাম, একটি আনন্দমুগ্ধ বৈষ্ণব-যুবক আমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। বড় সরল ভালবাসাময় মুগ্ধ। হাসিতে হাসিতে আমার নিকট আসিয়া বলিলেন,—“দাদা, আমি উপেনু; আপনার জ্ঞাত আসিয়াছি। কলিকাতা হইতে রাস্তা আমাকে আপনার কথা লিখিয়াছেন। জলুন, বরডাঙ্গা দেখিবেন। আমি তৎক্ষণাৎ পরম আনন্দে

ঠাকুর নরহরির সাধনাস্থলী দেখিতে চলিলাম। উহা ঠাকুর-পাড়া হইতে-বেশী দূরে নহে, আধমাইল হইবে। প্রাশস্ত ময়দানের ভিতরে অতি নির্জন মনোরম স্থান। অতি পুরাতন-সেকালের কৃতিপয় বৃক্ষরাজী স্থানটিকে মধুময় বৃন্দাবন করিয়া রাখিয়াছে। বৃক্ষরাজীর সন্মিকটেই একটি জলাশয়। অতি স্বচ্ছ-নির্মল-জল। অল্পসম্মানে জানিলাম মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দসহ কীর্তন-শ্রাস্ত হইয়া এই পুষ্করিণীতে অবগাহন করিতেন। জলাশয়ের একবিন্দু জল মস্তকে ধারণ করিলাম। প্রতিমুহুর্তে বৃন্দাবনের স্মৃতি জাগ্রত হইয়া আমাকে পাগল করিয়া তুলিল। পাখীগণের ডাক ময়ূরের কেকাধনিবৎ প্রতীতমান হইল। বসন্ত ঠাকুর নরহরির এই পরম রমণীয় সাধনাস্থলী আমার নিকট সংক্ষিপ্ত বৃন্দাবন ভিন্ন আর কিছুই মনে হইল না।

বরডাঙ্গায় কিয়ৎকাল কাটাইয়া উপেনের সহিত শ্রীখণ্ডে ঠাকুরবাটা শ্রীমৎ-মহাপ্রভু ও শ্রীমাদীর যুগল বিগ্রহ দর্শন করিয়া এবং “জন্মিরে বৃক্ষে কোটে কদম্বের ফুল।” শ্রীধনুন্দনের ভক্তিময়ী অপূর্ণ কীর্তির স্থানটি দর্শন করিয়া নানাস্থান পরিভ্রমণের পর দ্বিপ্রহরে ঠাকুর গৃহে ফিরিলাম। উপেনের সহিত পল্লীভ্রমণে মনে হইল—শ্রীখণ্ডবাসী নরনারী যেন আমাকে তাঁহাদেরই একজন বলিয়া মনে করিতেছেন। কাহারও কোন সন্দোহ নাই, দ্বিধা নাই।

ঠাকুরগৃহে ফিরিয়া দেখিতে পাইলাম, নানা গৃহ হইতে পূর্ববৎ প্রচুর প্রসাদ আমার নিমিত্ত সঞ্চিত রহিয়াছে। পরম আনন্দে আমরা দুইজনে তাহা গ্রহণ করিলাম। আমি ভাবিতে লাগিলাম,—আমি শ্রীখণ্ডে আজ কাহার অতিথি? বসন্ত, কাহার অতিথি, কাহার যেন নই, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। মনে হইল, তাঁহাদের ভালবাসায় যেন আমি বিক্রীত হইয়াছি।

সন্ধ্যার পরে ঠাকুর রাখালানন্দ নানাবিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। এমন সরল, অমায়িক, কোন প্রকার সন্দোহ বা সংকীর্ণতা তাঁহার ভিতরে নাই। ক্ষুদ্র একখানি চৌকীর উপরে বসিয়া, কত আপনার জ্ঞানের মত আমার সহিত গল্প করিতে লাগিলেন। তাহাতে পাণ্ডিত্য নাই, অভিজ্ঞান নাই, যেন ভাই ভাইর সহিত কথাবার্তা চলিতেছে।

পরদিন আমার কলিকাতায় কিরিবার কথা। ঠাকুর মহাশয় বলিলেন,—“আগামী পরশ্ব শ্রীবসন্ত-পঞ্চমী। এই তিথি শ্রীখণ্ডে বিশেষ উৎসবের তিথি। প্রিন্সাজীর আবির্ভাব তিথি এবং শ্রীরঘুনন্দনের উৎসবের তিথি। এই দিনটি শ্রীখণ্ডে থাকিয়া যাউন।” আমি বলিলাম,—“দাদা, আমার বড় ঠেকা কাজ। কলিকাতা না গেলেই নয়।” তিনি যেন একটু ক্ষুব্ধ হইলেন।

আমি একান্তই কলিকাতা আসিব জানিয়া, পরদিন ঠাকুর মহাশয়, ইচ্ছা না থাকিলেও, তদ্রূপ ব্যবস্থা করিলেন। স্থির হইল,—মধ্যাহ্নে আহায়াস্তে উপেন ভায়ার সহিত হাটাপথে মাজিগ্রাম দর্শন করিয়া কাটোয়া যাইব। সেখানে উপেন আমাকে রাজির ট্রেনে উঠাইয়া দিয়া ফিরিয়া যাইবে। আমি ঐ দিনই চলিয়া আসিব জানিয়া অনেকেই বড় হুঃখিত হইলেন এবং বলিলেন,—“ঐ দিনটি এখানে থাকিয়া গেলে বড় ভাল হইত।” উপেন ভায়া অতিশয় আশ্বাস করিতে লাগিল, কিন্তু আমি তাঁহাদের সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক প্রকার জোর করিয়াই রওনা হইব, স্থির করিলাম। উপেন ছোট ভাইটির মতই হুঃখিত হইল, কিন্তু আর বাধা দিল না।

মধ্যাহ্নে আহায়াদি শেষ করিয়া আমি জোর করিয়াই রওনা হইলাম ১২টা কি ১টা। উপেন কাদ-কাদ ভাবে আমার দিকে চাহিয়া আমার ব্যাগটী এবং বস্তাদি লইল। পা বাড়তেই কে যেন ভিতর হইতে বলিল,—“আহা! যেওনা।” এতক্ষণ কোঁকের মাথায় কিছু খেয়াল হয় নাই। কিন্তু এখন যেন মনটা বড় ভার হইল। ভিতর হইতে কে ফুঁকারিয়া কাদিয়া উঠিল। এই কান্না প্রতি পাদ-বিক্ষেপে যেন বাড়িয়া চলিল। উপেন ভায়া আমার মনের অবস্থা বুঝিলেন এবং স্তম্ভুর স্বরে একটি গানের পদ ধরিলেন, “বুঝি দাদা, পথভুলে এসেছে, (দেখি, ভুল ভাঙ্গে কিনা)”

আমি জোর করিয়া শ্রীখণ্ডের বিস্তীর্ণ ময়দান বাহিয়া চলিতেছি, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিতেছি, কে যেন পিছন হইতে আমার মনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছে। সে আকর্ষণ গৃহের আকর্ষণ অপেক্ষা প্রবল। ভাবিলাম,—“শ্রীখণ্ড ছাড়িয়া আসা বুঝি ভাল হইল না।” কিন্তু যখন

আসিয়াছি, তখন কিরূপেই বা ফিরি। উপেন ভায়া আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিল,—“এখনও দাদা ফিরুন।” আমি বলিলাম,—“না, চলিয়াছি, চলি।”

চলিতে চলিতে আমরা মাজিগ্রাম আসিলাম। আচার্য্য প্রভুর পাঠবাটী দেখিয়া মনে হইল যেন কতকালের পরিচিত স্থান। একটি বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় আমাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন,—“এই যে আমাদের যোগীনবাবু!” আমি প্রশ্ন করিয়া বলিলাম,—“আপনি আমাকে কিরূপে জানিলেন?” তিনি বলিয়া উঠিলেন,—“বাঃ আপনাকে সেবার কাশিম-বাজারে বৈষ্ণব-সম্মিলনী উপলক্ষে দেখিয়াছি না? কিরূপে ভুলিব?” বৈষ্ণবগণের এই অর্হেতুকী শ্রীতির কথা ভাবিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। ভাবিলাম,—অহো! ইহারাই তো আমার যথার্থ বান্ধব। যথার্থ আপনার জন। বাবাজী মহাশয় অতি আনন্দিত চিত্তে আমাদের গকে কিঞ্চিৎ প্রসাদ প্রদান করিলেন। পাঠবাটীর দুরবস্থার কথাও আমাকে একটু জানাইলেন। আমরা কিয়ৎকাল তথায় বিশ্রাম করিয়া কাটোয়া রওনা হইলাম।

অপরাহ্নে আমরা শ্রীগদাধর দাসের মহাপ্রভুর বাটীতে আসিলাম। উপেন বলিল,—“এ স্থানেই আমরা গাড়ী আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব। গাড়ী ছাড়িবে রাত্রি ১০টার, সুতরাং এখন ষ্টেশনে যাইবার দরকার নাই।” তখন শ্রীখণ্ডের বিরহ-বেদনা পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত রহিয়াছে। মন বলিতেছে,—“না, যাইয়া দরকার নাই।” অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া মনের সহিত ঝগড়া করিয়া আর পারিলাম না। উপেনকে বড় সঙ্কুচিত ভাবে বলিলাম,—“আচ্ছা, উপেন, আজ আবার কি ফিরিয়া যাওয়া যায়?” উপেন আনন্দে নাচিয়া উঠিল এবং বলিল,—“হাঁ দাদা, আমি তো পূর্বেই বলিয়াছিলাম। তবে চল, ষ্টেশনে একজন শ্রীখণ্ডবাসী ঠাকুর-কৃষ্ণচরী আছেন। তিনি প্রত্যহ বাড়ী যান। চল, তাঁর সহিত একসঙ্গে শ্রীখণ্ড যাইব।”

তাহাই করা হইল। ষ্টেশনে ঠাকুর মহাশয় আমাদের কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। আমরা রাত্রি ১০টার প্রচণ্ড শীতের ভিতরে নানাবিধ প্রেমালোপ করিতে করিতে প্রচণ্ড মাঠের ভিতর দিয়া শ্রীখণ্ড অভিমুখে রওনা

হইলাম। মনে হইতে লাগিল যেন কতকাল পরে স্বীয় গৃহে ফিরিতেছি।

শ্রীখণ্ডের নিকটবর্তী হইলে সঙ্গী ঠাকুরমহাশয় বলিলেন,—
“আপনাকে এত রাত্রে এত কষ্ট দিয়া আনিলাম বটে, কিন্তু এত রাত্রে খাওয়াইব কি? এখন শ্রীখণ্ড যে নিমন্ত্রণ নরনারী সকলে নিমন্ত্রিত। আচ্ছা, দেখা যাউক, ঠাকুর কি করেন।” আমি বলিলাম,—“আর কিছুই চাই না। একটু পড়িয়া থাকিতে পারিলেই হয়।”

শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের গৃহেই পুনরায় উপস্থিত হইলাম। উপেন ভায়া সে রাত্রি আমার সহিত অবস্থান করিলেন। একটু আশ্চর্যের বিষয় এই যে,—দেখিতে দেখিতে পাচ মিনিটের ভিতরে গরম লুচি ও তরকারী প্রসাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি অবাক হইয়া গেলাম। পরম আনন্দে, উপেনের সহিত প্রসাদ পাইলাম। সারা নিশি বৃত্তিতে পারিলাম, প্রিয়াক্ষী ও শ্রীরঘুনন্দনের আত্মর্ষণই আমাকে কাটোয়া হইতে শ্রীখণ্ডে কিরাইয়া আনিয়াছে। মনে মনে শত অপরাধ স্বীকার করিয়া তাঁহাদের চরণোদ্দেশে প্রণাম করিয়া পরদিন অতি প্রত্যুষে গাভোখান করিলাম।

স্থির করিলাম, আজ নিরুদ্ভিষ চিত্তে প্রিয়াক্ষী ও রঘুনন্দনের উৎসবানন্দে সারাদিন শ্রীখণ্ডবাসীদের সহিত যাপন করিব।

আজ শ্রীখণ্ডে শ্রীবসন্ত-পঞ্চমী। সমগ্র শ্রীখণ্ড আনন্দময়। নরনারী কাঁহারও ঘরের কোন কাজ নাই। কেবল আনন্দ, কেবল আনন্দ কোলাহল। কি এক অপূর্ণ আকর্ষণে শ্রীখণ্ডবাসী নরনারী মহাপ্রভুর আঙ্গিনায় সম্মিলিত। প্রাতঃকাল হইতে স্নায়ক শ্রীল গৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহোদয় রাগরাগিণী সমন্বিত সুললিত গৌরগুণকীর্তন তরঙ্গে আপনি মাতিয়া সকলের প্রাণে দিব্য আনন্দ সঞ্চার করিতেছেন। আমি আজ সকল কথা ভুলিয়া, সমগ্র প্রাণটি লইয়া সারাদিন তাঁহাদের ভিতরে মজিয়া রহিলাম। প্রেমময় শ্রীখণ্ড-বাসীদিগের প্রেম-কৃপা আমার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে শ্রীগোরাঙ্গের একটি মোহন ছবি আঁকিয়া দিল। আর তৎপাশ্বেই দেখিতে পাইলাম, একটা কনক-প্রতিমা ধীরে ধীরে উদয় হইলেন। উঁহারা চিরকালের জঙ্গ আমার মনটিকে শ্রীখণ্ডবাসীদিগের সহিত উঁহাদের চরণে বাধিয়া লইলেন। সে দিন যে ভাবের তরঙ্গ মনে খেলিয়াছিল, তাহা বলিবার ভাষা নাই।

পূর্ণিমা

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী, এম-এ, বি-এল, বি-ট,

এল-সি-পি. (লণ্ডন)।

জীবনের পারাবারে বারে বারে এসেছে পূর্ণিমা
জেগেছে জোয়ার
শশীর সে সুধাহাসি ধীরে ধীরে লভেছে তনিমা
ফিরেছে আশাব।
জাগিয়াছে বক্ষে মোর সীমাহারা দুঃখের কল্লোল
ভাসাইয়া বেলা
বাড়া কমা, উঠা নামা নিয়ে সিদ্ধ নিত্য উত্তরোল
করিতেছে খেলা।
আনোলিত এ অন্তর অহরহ জোয়ারে ভাটিয়
যুগ যুগ যরি
হাসিতেছে কাদিতেছে নিরন্তর কিসের মায়ার
দিবস শরীরী।

খোলো মুখ গোরাচাঁদ হুড়াইয়া দাও বক্ষে মম
তব কর রাশি—
পড়ুক হৃদয়ে মোর মধুভরা জ্যোৎস্না মনোরম
শুভ্র তব হাসি।
জাগো জাগো হে অক্ষয় পূর্ণ সুধাকর—
জাগো জোয়ার
ছুটুক অনন্ত বাহু উজ্জ্বল করিয়া বিস্তার
তরঙ্গ আমার।
হৃদয়ে ধরিয়া তব হে সুন্দর, অনিন্দিত ছবি
নিত্য যেন নাচি
নবীন পূর্ণিমা যেন প্রাবৃত কল্লুক মোর মাথ
শুধু এই যাচি।

বাক্তাবহ

১৬ই মাঘ প্রিয়ারাজী উৎসব। প্রতি বৎসর এই তিথিতে বাংলার নানাস্থানে গৌরভজ্ঞগণ মিলিয়া প্রিয়ারাজীর জয়ধ্বনির ভিতর দিয়া এই তিথিটি উদ্‌যাপন করেন। অষ্টপ্রহর ব্যাপী নাম-সংকীর্তন, পাঠ, মহাপ্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি হয়। এই বৎসরও নব প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীগৌরান্দ্র যুব সমিতির' উদ্যোগে নানাস্থানে অষ্টপ্রহর ব্যাপী নাম-সংকীর্তন, মহাপ্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি ব্যবস্থা হইয়াছে। উৎসবের পনের দিন পূর্বে হইতে উৎসবের পূর্বদিন পর্যন্ত পল্লীতে পল্লীতে প্রভাতী কীর্তন হইবে। আমরা অবগত হইলাম, নিম্নলিখিত স্থানসমূহে উক্ত তিথিতে অষ্টপ্রহর নাম যজ্ঞ চলিবে—

১। বাসঙা, (বরিশাল)—পুরুষ, ২। ঝালকাঠী—মহিলা, ৩। ইলুচাং (বরিশাল)—মহিলা, ৪। গিরোজপুর (বরিশাল)—পুরুষ, ৫। কাউখালী (বরিশাল)—মহিলা, ৬। গরঙ্গল (বরিশাল)—পুরুষ, ৭। চন্দ্রহার (বরিশাল)—পুরুষ, ৮। কমলিকান্দর (বরিশাল)—মহিলা, ৯। বরিশাল—পুরুষ, ১০। বাইশারী (বরিশাল)—মহিলা, ১১। কদমতলা (বরিশাল)—মহিলা, ১২। ঢাকা—পুরুষ, ১৩। ব্রাহ্মণবাড়িয়া—মহিলা, ১৪। ত্রিশ (ত্রিপুরা)—পুরুষ, ১৫। ধামঘর (ত্রিপুরা)—পুরুষ, ১৬। বিষ্ণুপ্রিয়া কুঞ্জ, সালিমার, (কলিকাতা) নোয়াগাঁও (নোয়াখালী)—ইত্যাদি।

শ্রীগৌরান্দ্র যুব সমিতির উদ্যোগে অল্পকিঞ্চিৎ চরিতামৃত জয়ন্তী উৎসব যে কোন গৌরভজ্ঞেরই নিজস্ব উৎসব বলিয়া বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয়। আমরা বড়ই আনন্দিত হইলাম যে, এই যুব সমিতি এই প্রকার জয়ন্তী উৎসবের অল্পকিঞ্চিৎ উদ্যোগী হইয়াছেন এবং ইতিমধ্যে প্রায় সমস্ত ব্যরহাই আশাহুরূপ ভাবেই সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বাংলার নানাস্থানে গৌরভজ্ঞগণ যেখানে যেমন সম্ভব মিলিত হইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ্যে শ্রীমহাপ্রভুর জীবার নিগূঢ়তম রসাস্বাদন করিতে করিতে অশ্রুসিক্ত হইতেছেন—এই চিত্রটি মানসপটে জাগরুক করিয়া আমরাও প্রভূত আনন্দ লাভ করিতেছি।

গত সংখ্যায় শ্রীগৌরান্দ্র যুব সমিতির পক্ষে শ্রীবিনোদ-বিহারী চৌধুরী স্বাক্ষরিত আবেদনপত্রে কয়েকটি মূদ্রণ প্রমাদ থাকার আমরা বিশেষ দুঃখিত।

পাঠকবর্গ কৃপা করিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন।
যথা :—'যুগল সমিতি' স্থলে 'যুব সমিতি' ২নং তালিকায় 'ব্যবসায়ী পাঠক আবশ্যক' স্থলে 'অনাবশ্যক' হইবে; ৩নং তালিকায় 'কালীন' স্থলে 'লীলা' ৪নং মাধুরিয়া স্থলে 'মাধুরিয়া', ৫নং শ্রীনিমাই স্থলে 'শ্রীনিমাই'; 'মহাজননী' স্থলে 'মহাজনপদ'; 'স্বক' স্থলে 'স্বীয়', 'দুয়ার আলো' স্থলে 'দুই আনা' মার্জনিয় স্থলে 'মার্জিত', শুভাস্ত্র স্থলে 'শুভমস্ত'।

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ১৭ই পৌষ রবিবার বরিশাল বাইশারী নিবাসী চন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী গৌরপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উহার মাত্র ১৫ দিন পূর্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীমোহন চৌধুরী মারা যান। বৃদ্ধ বয়সে চৌধুরী দিদি এই শোক সামলাইয়া উঠিতে পারিলেন না এবং সঙ্গে সঙ্গেই শয্যা লইলেন। চৌধুরী দিদির অবর্তমানে আমরা আর একজন গৌরগতপ্রাণ ও বৈষ্ণব-সেবা-পরায়ণা মহিলা হারাইলাম। এই কথাটি যে কতদূর সত্য, যিনিই চৌধুরী দিদির সংস্পর্শে আসিয়াছেন তিনিই উপলব্ধি করিবেন। তিনি কিঞ্চিদধিক পঁচিশ বৎসর যুগল ভজন করিয়াছেন এবং প্রথমে যখন এই নদীয়া-যুগল সেবায় মধুরতম আনন্দের সন্ধান পাইয়াছিলেন তখন স্বামীর অল্পমতি, সমাজের বন্ধন শাসন ইত্যাদি কিছু না মানিয়া তিনি বাহা সত্য বলিয়া রুঝিলেন—তাঁহা প্রাণের সহিত আঁকড়িয়া ধরিলেন। পরে অবশ্য তাঁহার স্বামী যিনি প্রথম অবস্থায় এই যুগল-ভজনের ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি পরম বৈষ্ণব হইলেন। শুধু তাঁহাই নহে—শেষে সগোষ্ঠী গৌরভজননে ডুবিলেন। তাঁহাদের একপুত্র বর্তমান তিনিও নদীয়া-যুগল ভজনে দিন কাটাইতেছেন। বৈষ্ণব সেবার নিষ্ঠায় হরিমোহনের মত ভক্ত খুব কমই দেখা যায়। আমরা গৌর প্রাপ্তার আত্মার চির শান্তি কামনা করি।

১৯৪৪ সালে যে সমস্ত পরীক্ষার্থী আই-এ, আই-এস-সি, বি-এ, বি-এস-সি, এবং বি-কম পরীক্ষায় কোন একটা বিষয়ে যদি অকৃতকার্য হন এবং ক্ষমতা-বিষয়ে শতকরা ৪০ হিসাবে নম্বর পান তাহা হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদিগকে আর একবার মাত্র ঐ বিষয়টিতে পরীক্ষা দিবার সুযোগ দিবেন ঘোষণা করিয়াছেন। এই কম্পাটমেন্টাল পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটা

প্রশংসনীয় সংস্কারে মনোযোগী হইয়াছেন। পৃথিবীর সমস্ত বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ভারতেরও অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ব্যবস্থা বহু পূর্বে হইতেই প্রচলিত আছে।

* * * *

নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভার মণ্ডপে ডাঃ রাখাকুম্ভ মুখার্জীর পৌরোহিত্যে পূর্বজন্ম প্রদর্শক সম্মেলনে গীতা মূর্ত্তিকী নামী এক চারি বৎসর বয়স্ক এক বালিকা গীতা সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়াছেন। আড়াই বৎসর বয়স হইতেই এই বালিকা তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে গীতা শিক্ষা দিতেছেন। চাঁদরাণী নামী অপর একটি বালিকার বয়স সাড়ে তিন বৎসর। তিন বৎসর বয়সে এই বালিকা তাহার পূর্বজন্মের পিতা-মাতার গৃহ, আত্মীয় স্বজন ও জিনিষপত্র চিনিতে পারে। এই বালিকাটিও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এইরূপ ঘটনা ভারতবর্ষে ও জগতের অন্যান্য স্থানে ঘটিয়াছে এবং এখনও মধ্যে মধ্যে ঘটে। পূর্বজন্ম পরজন্ম সম্পর্কে বহুলোকের সংশয় আছে। স্ত্রীর অলিভার লজ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা ইহার তথ্য অনুসন্ধান করিতে বাইয়া এরূপ অকাটা প্রমাণ পাইয়াছেন যে তাঁহারা এই সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যুগলকান্তি ঘোষ মহাশয়ের লিখিত “পরলোকের কথা” ও “Life Beyond Death” পুস্তক পাঠ করিলে সবিশেষ জ্ঞান হইবে।

* * * *

বাঙলা সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে বাঙলা সরকার সম্প্রতি তিন মাসের জন্য অবিলম্বে দুই হাজার আট শত চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এইরূপ অতিরিক্ত ৩০ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন বিলি করা হইবে। উক্ত চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত ১৪শত সরকারী দাওয়ারাইখানার সঙ্গে যুক্ত থাকিবে। এখানকার চিকিৎসকগণ বৈকালে দুইটা কেন্দ্রে উপস্থিত থাকিয়া রোগী দেখিবেন। পেটের গোলযোগঘটিত রোগেরও সেখানে চিকিৎসা হইবে। যে সব স্থানে দাওয়ারাইখানা বা চিকিৎসা-

কেন্দ্র থাকিবে না, সেখানে মহকুমা হাকিম কর্তৃক নির্ধারিত স্থল শিক্ষক প্রভৃতি বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে কুইনাইন বিলি করা হইবে। ডাক্তার জানিটারি ইনস্পেক্টর বা হেলথ এসিস্ট্যান্টদেরও বিলির জন্য কুইনাইন দেওয়া হইবে। সরকারী দাওয়ারাইখানার ডাক্তারগণকে প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২০ করিয়া হাত ধরচ দেওয়া হইবে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে মোট ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। সরকারের উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই। ব্যবস্থাপনা নিখুঁত হউক ইহাই দেশবাসী আশা করে।

* * * *

গত ২৬শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে তিলক নগরে (অমৃতসর) হিন্দুমহাসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ২৫ বৎসর পূর্বে ঠিক এই স্থানেই কংগ্রেসের একটা ইতিহাস প্রসিদ্ধ অধিবেশন হইয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্ত্রীর গোবিন্দচাঁদ নারাং তাঁহার অভিভাষণে ভাবতের রাজনীতিক অচল অবস্থার কথা উল্লেখ করেন। ডাঃ শ্রীমামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে বলেন “আমাদের সম্মুখে যে ভবিষ্যৎ তাহা অন্ধকারময় বলিয়া মনে হয়। এক বিদেশী শত্রু আমাদের দেশ আক্রমণে উদ্ভূত। আমাদের অপরিমেয় জনবল এবং সম্বল রহিয়াছে, কিন্তু আমরা এক বৈদেশিক শক্তির রথচক্রে আবদ্ধ বলিয়া আমাদের নিষেধের বিচার বুদ্ধিমত সেই সম্ভাবিত বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধের নিমিত্ত আমাদের জনবল ও সম্বলকে সঞ্চালিত করিতে পারিতেছি না। ভারতের ভাগ্যান্যস্তা ভারতবর্ষই হইবে, ইহাই আমরা চাহি। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য, কোন স্থানের বিদেশী শাসকই আমরা চাহি না। এই মত পোষণ করা যদি অপরাধ হয় তাহা হইলে প্রত্যেক দেশভক্ত ভারতবাসীর সেই অপরাধ করিয়া তাহার ফল ভোগ করা উচিত। ভারতবর্ষের কথা এই যে, স্বাধীনভাবে সে যাহা করিতে পারে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ভাড়াটিয়া হিসাবে সে তাহা করিতে পারে না। যতদিন পর্যন্ত স্বাধীনতা লাভ না হয়, ততদিন পর্যন্ত বংশ পরম্পরাক্রমে স্বাধীনতার সংগ্রাম চলিতে থাকিবে।”

ঐ দিন প্রাতে বিরাট জনতার সম্মুখে হিন্দু পতাকা উত্তোলনকালে পতাকার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন, “জাতীয় লক্ষ্যলাভের ক্ষমতা যে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে পতাকা তাহারই প্রতীক।” পতাকার উপর অঙ্কিত তরবারি সম্পর্কে তিনি বলেন, “তরবারি ব্যতীত কোন জাতি বাঁচিতে পারে না। কিন্তু কেবল তরবারি দ্বারা জগত শাসিত হয় না, এক্ষণে চাই ত্রায়পরায়ণতা ও সুবিচার।” ডাঃ মুখার্জীর এই বাণী সকলের পক্ষেই শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণযোগ্য।

মধ্যপ্রাচ্যের ব্রিটিশ সময় পরিষদের সচিব মিঃ রিচার্ড গার্ডিনর ক্যাসি বাঙলার স্থায়ী গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন। জাহুয়ারী মাসের শেষ ভাগে তিনি কার্যভার গ্রহণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। মিঃ ক্যাসি অষ্ট্রেলিয়াবাসী। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের একজন সাধারণ বংশীয় ব্যক্তি এই সর্বপ্রথম বাঙলার শাসক নিযুক্ত হইলেন। মধ্যপ্রাচ্যে ১৮ মাস অবস্থানের ফলে মিঃ ক্যাসি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা নাকি বাঙলার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইবে। অর্থনৈতিক ও সরবরাহ বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাঙলার বর্তমান দুর্দিনে বিশেষ কাজে লাগিবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

বাংলার বিশিষ্ট মহিলা কবি শ্রীমতী মানকুমারী বসু আর ইহজগতে নাই। তাঁহার তিরোধানের এই সংবাদে সাহিত্যচুরাগী মাঝেই ব্যথিত হইবেন। তিনি ৭৯ বৎসর বয়সে প্রলোকগত হইয়াছেন। শৈশবাবধি তিনি অবিচল নির্ভর বঙ্গ-ভারতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন। দেশবাসী ও তাঁহার দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করিয়া লইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। স্বীয় অধ্যবসায় ও সাহিত্যচুরাগের সহজাত অমুপ্রেরণায় তিনি বাংলা সাহিত্যের আসরে আপন স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার নাম ও কীর্তি অমরীয় হইয়া থাকিবে। দেশবাসী যৌন বেদনায় তাঁহার বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবে।

পল্লী বাঙ্গলার দুরবস্থা সম্পর্কে বেঙ্গল রিলিফ কমিটির

সম্পাদক শ্রীযুক্ত কানোরিয়া সিরাজগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ও অন্যান্য বহু পল্লীর অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া এক বিবৃতিতে জানানাইয়াছেন—বাঙ্গলার সমস্তার অন্ত নাই। শুধু খাদ্য সমস্যা নয়; বস্ত্র, বাসনপত্র, আশ্রয়, গরু বাছুর, জ্বালানি, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যবিধান ও শিক্ষাসমস্যা বর্তমান। বাংলার যত লোক মরিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে, মৃত্যু সংখ্যা খুব সম্ভব তাহারও বেশী হইবে। লোকের প্রাণহানি বাড়িয়াছে, এখন শিক্ষা ও সংস্কৃতি নষ্ট হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। গ্রামের বিদ্যালয়-গুলিতে ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। তাহারা বেতন দিতে পারে না, গবর্ণমেন্ট সুদৃষ্টিভাবে সাহায্য না করিলে বহু বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া যাইবে। সারা বাঙলায় দুর্ভিক্ষের ফল ফলিয়াছে। বহু মধ্যবিত্ত পরিবারও যাহা কিছু ছিল সব খাইয়া ফেলিয়াছে। নিম্নতর শ্রেণীর লোকেরা চালের টিন, ঘরের বাসন বেচিয়া খাইয়াছে ও খাইতেছে। দরিদ্র চাষীরা একমুষ্টি অন্নের জন্য জমি বিক্রয় করিয়া ফেলিতেছে। সরকার পক্ষই একমাত্র এই অবস্থার প্রতিকার করিতে সক্ষম। কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে ইহাই আমরা কামনা করি।

সাবা বাঙলা জুড়িয়া মহামারীর তাণ্ডব লাগিয়াছে। ম্যালেরিয়ার ভয়াবহ আক্রমণ এবং তদসঙ্গে কলেরা ও বসন্তের প্রকোপে বাংলার পল্লী অঞ্চলগুলি জন বিরল হইয়া উঠিতেছে। মোটামুটি হিসাবে বলা হইয়াছে যে, ১১ই ডিসেম্বরের মধ্যে বাঙলা দেশে অনশনে ও কলেরা প্রভৃতি মহামারীতে ১ লক্ষ ১ হাজারের উপর লোক মারা গিয়াছে। এই হিসাব অসম্পূর্ণ। সঠিক হিসাব প্রকাশিত হইলে হয়ত একেবারেই স্তম্ভিত হইতে হইবে। রাষ্ট্রের নিয়ামক যাহারা তাহাদের গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত হইতে অমুরোধ জ্ঞাপন ভিন্ন আমাদের উপায়ান্তর নাই! আজিও বাঙলার বুকে মৃত্যুর তাণ্ডব অব্যাহত গতিতে চলিতেছে।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে জানানাইয়াছেন যে, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালি

প্রভৃতি অঞ্চলের ভূমিহীন কৃষক ও শ্রমজীবী-বরের বহু সংখ্যক নারী উদরারের জন্য পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে ও হইতেছে। উপার্জনশীল পুরুষেরা হয় মরিয়াছে, না হয় প্রাণ লইয়া পালাইয়াছে। সেই সঙ্গে আরও প্রকাশ্যে, পল্লী বাঙলার নানাস্থান হইতে আড়কাঠিরা দলে দলে নিরাশ্রয় নাবালিকাদের ফুলহাইয়া আনিয়া সহরে বিক্রয় করিতেছে। কিছুদিন পূর্বে যশোর হইতে আনাত তিন নোকা নাবালিকার শেষ নোকাখানি কোনক্রমে ধরা পড়ায়, তদ্ব্যবস্থিত অনাথদিগকে উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে। একমাত্র পেটের দায়েই যে ইহারা দুর্ভিক্ষের কবলিত হইতেছে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। কত মেয়ে যে এইভাবে চালান হইয়াছে কে জানে। অন্নকষ্ট ও মহামারীতে বাঙলা আজ ছিন্ন ভিন্ন, সমাজ জীবনে যদি এমনভাবে অধঃপতন আসিতে থাকে তাহা হইলে বাঙলাদেশের ভবিষ্যৎ কি হইবে? সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের দৃষ্টি এদিকে অচিরে আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যিক।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রীশ্রীচৈতন্য-ব্রিতামৃত গ্রন্থের, শ্রীবিধুবংশ সরকার মহাশয়কৃত প্রসৌরভজনমুগা টীকার সমালোচনা বহু পত্রিকায় বাহির হইয়াছে ও নানাস্থানের রসজ্ঞ পাঠক সমাজেও গ্রন্থখানি সমাদর লাভ করিয়াছে। শ্রীল কৃষ্ণদাস বিরচিত এই গ্রন্থখানি একখানি মহামূল্যবান প্রামাণিক গ্রন্থ হইলেও উহা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বলিয়া সর্বসাধারণ-উহার ভিতর প্রচুর অমনন্দ সরোবরের সন্ধান পান নাই। আমরাও অমৃতবাজার পত্রিকার ভাষায় বলিতে চাই, “শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয় নিজে একজন ধাতনামা সাধক কাজেই অবদানের তুলনা মিলে না—অপর কোন ক্ষেত্রে পাই না...” বৃগান্তর সত্যই বলিয়াছেন “...ভূমিকায় প্রেম ও ভক্তিস্বের যে নিপুণ বিশ্লেষণ স্থান পাইয়াছে, রচনা হিসাবে তাহা যেমন মনোজ্ঞ, আলোচনা হিসাবেও তেমনি গভীরতার পরিচায়ক...” এই মহামূল্য টীকাখানি প্রতিগৃহে স্থান পাইবে ইহাই আমরা আশা করি।

শ্রীশ্রীমা-দাদা শ্রীপত্রিকাখানির সুযোগ্য পরিচালনার জন্য একটা কমিটি গঠিত হইয়াছে। বাঙলার নানা জেলা হইতে কমিটির সভ্য লওয়া হইয়াছে। সভ্যবৃন্দের নাম—রায় সাহেব জগৎচন্দ্র রায়—ব্রাহ্মণবাড়িয়া, শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় নাজীর—নোয়াখালী, শ্রীবিনোদবিহারী চৌধুরী জমিদার—ঢাকা, শ্রীবিধুবংশ মজুমদার—চাঁদপুর, শ্রীমৌলীবংশ দত্ত বিএ—চাঁদপুর, শ্রীকিরণকুমার রায় চৌধুরী জমিদার—বাসুগা বরিশাল, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বিশ্বাস—রঘুনাথপুর, শ্রীরসিকচন্দ্র দে—কাউখালি, শ্রীসুধাংশুভূষণ সরকার—কলিকাতা, শ্রীঅক্ষয়কুমার ভৌমিক—কাশীপুর। কমিটিতে মোট কুড়ি জন সভ্য থাকিবেন। যদি কেহ সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন কৃপা করিয়া শ্রীশ্রীমা-দাদা কার্যালয় অথবা উল্লিখিত যে কোন সভ্যের নিকট অনুসন্ধান করিবেন।

আমাদের সবিশেষ অনুরোধ সশ্বেও অনেকে অস্বাভাবিক স্বীয় বাৎসরিক সাহায্য পাঠান নাই। আমাদের মনে হয় অর্থের অভাবেই যে তেমনটা ঘটিয়াছে তাহা নহে। খেয়ালের অভাবই অধিকক্ষেত্রে দায়ী। কারণ যাহাদের সাহায্য বাকী দেখা যাইতেছে—আপাতদৃষ্টিতে তাঁহারা কেহই অক্ষম নন এবং কেহ কেহ সমাজের চক্ষে ধনী। তাঁহারা যদি কৃপা করিয়া সাহায্য না করেন তবে এই এত দিনের শ্রীপত্রিকা-খানি অচল হইয়া পড়ে। এবং সেইজন্য যদি খেয়ালের অভাবই দায়ী হয় তবে সে দুঃখের ক্ষত বহুদিন থাকিয়া যাইবে।

আবার কেহ কেহ শ্রীশ্রীমা-দাদার নাম করিয়া অনেকের নিকট হইতে বাৎসরিক বা ষাণ্মাসিক টাকা আদায় করিয়াছেন, কিন্তু অস্বাভাবিক তাহা শ্রীশ্রীমা-দাদা কার্যালয়ে জানান নাই, বা অর্থও পাঠান নাই। ইহাতে সকল পক্ষেরই অনুরোধ ঘটিয়াছে। সুতরাং আমাদের বিশেষ অনুরোধ কেহ যেন পূর্বোল্লিখিত সভ্যবৃন্দ অথবা শ্রীশ্রীমা-দাদার যে কোন কার্যালয় ছাড়া অপর কাহাকেও কোন টাকা না দেন।

নন্দাদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ যে মুদ্রাস্ফীতি প্রশমিত
করিবার ও রেলপ্রমণ কমাইবার জন্ত রেলপথের ভাড়া ২৫
ভাগ হইতে ৪০ ভাগ বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব হইতেছে।
সংবাদটা কেবল অভাবনীয়ই নহে, আতঙ্কজনক। ভারতের
জনসাধারণ বিলাস ভ্রমণের জন্ত রেলগাড়ীতে চড়ে না।
অপরিহার্য কারণেই তাহাদের ট্রেনে চাপিতে হয়। যুদ্ধের
মধ্যেই দুইবার ভাড়া বৃদ্ধি হইয়াছে—প্রস্তাবিত সঙ্কর কার্যে

পরিণত হইলে নির্যাতন চরমে পৌছিরে। তৃতীয় শ্রেণীর
যাত্রীদের একেইত দুঃখের অন্ত নাই। ভাড়া বৃদ্ধি করায়
মরার উপর খাড়ার দ্বা দিবার আয়োজনের সংবাদে জনগণ
সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। গত বৎসরের হিসাবে দেখা যায়
রেল কোম্পানীর বিপুল আয় হইয়াছে, তাই কি লাভের
মোহ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রসার নবানুরাগ

(সখীর প্রতি)

বসন্ত বিকালে, সব সখী মিলে,
আমারে করিয়া সঙ্গে।

রাগানেতে গিয়া, আনন্দে মাতিয়া,
খেলি সবে নানা বঙ্গে ॥

কুসুম কাননে, কুসুম চয়নে,
মাতিয়া সবায় মিলি।

ছুটাছুটা করি, কুসুম আহরি,
সাক্ষিতে রাখিল তুলি ॥

শ্রমবোধ হল, সাক্ষি পুরে গেল,
বসিল গাছের তলে।

মনের উল্লাসে, বৃক্ষতলে বসে,
গাঁথি হার কুতুহলে ॥

গালা গাঁথি হ'ল, সখীরা মাতিল,
মালাতে সাজাতে নোরে।

নাছোড় হইয়ে, আমারে ধরিয়ে,
সাজাইল প্রাণভরে ॥

মালাতে সাজায়ে, মাঝেতে রাখিয়ে
সব সখী করে গান।

লজ্জাবতী হয়ে, রত্ন দাঁড়াইয়ে,
উদাস করিল প্রাণ ॥

তাহাদের গান, করিয়া শ্রবণ,
নয়নে অহিল নীর।

হ হ করে মন, না জানি কারণ,
না পারি হইতে স্থির ॥

* * * *

সখীগণ আসি, বলে হাসি হাসি,
কতই বরের কথা।

সঙ্কল নয়নে, চাহি সখী পানে,
সখী পায় মনে ব্যথা ॥

বিবাহ হইলে, শুভ দৃষ্টি কালে,
বিধি মত মুখ হেরি।

দেখি মনচোর, হয়েছে বর,
আনন্দ ধরিতে নারি ॥

আনন্দে বিভোর, বাসরের বর,
আমোদ সামর দেখি।

দেখি নাথ মুখ হয়ে অনিমিত্ত,
বসনে বদন ঢাকি ॥

শ্রীবোগেন্দ্রমোহন ঘোষ।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া জন্মোৎসব

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার জন্মোৎসব ও

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত জয়ন্তী।

সর্বশেষ অবতার শ্রীগৌরাক্ষ মহাপ্রভু এই বাংলাদেশে আসিলেন। তাঁহার ফ্লাদিনী শক্তি নবদ্বীপময়ী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ায়ই রূপায় আপায়র সর্বসাধারণ শ্রীগৌরাক্ষ-সুন্দরকে পরমাখ্যায় রূপে পাইয়াছেন। মহাপ্রভু আসিয়া জীবকে জানাইলেন, সর্বসিদ্ধি ও সর্বকল্যাণপ্রদ “নামসংকীর্তন রুলো উপায়।” এবং এক সময় সমগ্র বাংলাদেশ, তথা সমগ্র ভারতবর্ষ কীর্তন তরঙ্গে সুখের সাগরে তাসিতেছিল। আজ সেই ভারত, বিশেষতঃ এই বাংলাদেশ বিপদের ছায়াপাতে জীবন্ত। হরিনাম সংকীর্তনই মৃত সঞ্জীবনী সুখ। তাই শ্রীগৌরাক্ষ যুব-সমিতি প্রস্তাব করিতেছেন যে যথাসম্ভব ব্যাপক ভাবে বিভিন্ন লোক কেন্দ্রে ছুই, তিন, বা ততোধিক একত্র হইয়া সকলে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অবতরণ তিথি উপলক্ষে দেবীর জন্মোৎসব ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করুন। এতৎসঙ্গে কার্যক্রম বলা হইল বটে; কিন্তু বিভিন্ন কেন্দ্রে তত্ত্বাত্মক অল্পষ্ঠাত্মগণ পারিপার্শ্বিক অবস্থানানুসারে ইহার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারেন। কার্যক্রম :—

(১) ১লা মাঘ হইতে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পঞ্চমী (শ্রীপঞ্চমী) তিথির পূর্বদিন পর্যন্ত প্রত্যহ উষাকীর্তন। এক এক দিন এক এক পল্লিতে ঘারে ঘারে কীর্তন।

(২) ঐ কয়দিন প্রত্যহ বিকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ। সময়, স্থান ও পাঠক কেন্দ্রীয় কমিটি স্থির করিবেন। ব্যবসায়ী পাঠক অনাবশ্যক।

(৩) ২রা মাঘ রবিবার পাঠান্তে প্রয়োজনবলে গৌর কথা আলাপন। সম্ভব হইলে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ লীলা পাঠ।

(৪) ২ই মাঘ রবিবার পাঠের পূর্বে বা পরে অথবা

পাঠের পরিবর্তে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বৈভব মধুরিমা সম্বন্ধে আলোচনা বা বক্তৃতা।

(৫) শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পঞ্চমীর দিন অষ্টপ্রহর শ্রীনাম সংকীর্তন; পূর্বদিন সন্ধ্যার পর অধিবাস কীর্তন ইত্যাদি।

গুরুবন্দনা বৈষ্ণব বন্দনা মহাজনগণের স্মরণ, মহাজনপদ কীর্তন, সম্ভবমত প্রত্যহই আলুসঙ্গিকভাবে অল্পঠের। বিভিন্ন কেন্দ্রের স্থান নির্দেশ কেন্দ্রীয় কমিটিই করিবেন। যেখানে নিত্য সেবা আছে, সেই স্থান শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়।

উষা-কীর্তন, পাঠ ও আলোচনার ব্যয় নাই। অষ্টপ্রহর কীর্তনের দিন কীর্তনকারিগণ স্ব স্ব আহাৰ্য্য—চাল, ডাল ইত্যাদি ছুই আনার পরমা একত্র সংগ্রহ করিলেই ব্যয় সম্বলনের প্রশ্ন সহজে মীমাংসিত হয়। ব্যক্তিবিশেষে সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে ইচ্ছা করিলেও অপরের দত্ত বস্তু গ্রহণ করা বিধেয়, যেন, সকলেই নিজের উৎসব মনে করিতে পারেন।

স্থান বিশেষে প্রয়োজন ও আগ্রহ অনুসারে মহিলাগণও অষ্টপ্রহর কীর্তন করিতে পারেন। কিন্তু, পারিবারিক কীর্তন ব্যতীত সর্বসাধারণের কীর্তনে নারী পুরুষ মিলিত হইয়া কীর্তন করা শোভন নহে। মহিলাদের কীর্তনে ৮৯ বৎসরের বালক মার্কিনীয় হইতে পারে।

ইতিমধ্যেই আমরা কয়েক স্থান হইতে উত্তর পাইয়াছি, তাঁহারা উপরি উক্ত কার্যক্রম অনুযায়ী উৎসবের আয়োজন উদ্বোধন হইতেছেন।

শুভমস্ত ! শুভমস্ত !! শুভমস্ত !!!

নিবেদক—

শ্রীবিনোদবিহারী চৌধুরী

শ্রীগৌরাক্ষ যুব-সমিতির প্রতিনিধি

৩৭১ রজনী চৌধুরীর বাগিচা

গ্যাণ্ডারিয়া, ঢাকা।

বৈষ্ণব গ্রন্থের বিজয় বৈজয়ন্তী।

সাহিত্যভূষণ শ্রীবিধুভূষণ স্বরূপকার, বি. এ, বিভাবিনোদ সম্পাদিত

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

(আদিখণ্ড)

মহাপ্রভুর লীলামৃতের জীবন্ত আলোক্য। ভাব ও ভাব্যের প্রাণবন্ত রূপ।

ইহা পাঠ করিতে করিতে নিতান্ত বহিমুখী শুষ্ক হৃদয়ও নিগুঢ় রসের সন্ধান পাইবেন।

আনন্দাশ্রু বর্ষণে মনের মালিঙ্গ কাটিয়া যাইবে।

মূল্য—৭ টাকা (ডাক মাণ্ডল স্বতন্ত্র)

অমর্তবাক্য পত্রিকা বলেন :—

The greatest classic of the Gaudia School of Vaishnavism, as initiated by Lord Chaitanya is Sri Sri Chaitanya Charitamrita. In fact it is the 'Bible' of the School. Numerous editions of the celebrated work have come out, but none has delighted and moved us more than the present one. Srejit Sarker himself is a "Sadhaka" and is thus able to provide us illuminations and interpretations which we seldom get elsewhere. To men groping in the dark, he offers guidance. We have no doubt that the Commentator will be long remembered by his work.

যুগান্তর বলেন :—

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বাংলা ভাষার একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। দীর্ঘকাল হইতে বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ ইহার তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া আসিতেছেন, বহু উল্লেখযোগ্য সংস্করণও এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। সেই অবিশাল সাহিত্যের মালায় এই সংস্করণটি নূতন সম্পদরূপে গণ্য হইবে এবং এই গ্রন্থের পরবর্ত্তি খণ্ডগুলি প্রকাশিত হইলে সমগ্রভাবে ইহা একটি অদ্বিতীয় প্রামাণিক সংস্করণই হইবে। মূল শ্লোকগুলির সহিত তাহাদের অর্থ, ব্যাখ্যা ও টিকা টিপ্পনী ইহাতে যে ভাবে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে তাহা একাধারে পাণ্ডিত্য ও রসামৃতের আদর্শ স্বরূপ। ভূমিকায় প্রেম ও ভক্তি-তত্ত্বের যে বিপুল বিশ্লেষণ স্থান পাইয়াছে, রচনা হিসাবে তাহা যেমন মনোজ্ঞ, আলোচনা হিসাবেও তেমনি গভীরতার পরিচায়ক। প্রেম ও ভক্তি পরায়ণ বৈষ্ণবগণ তথা জিজ্ঞাসু পাঠকগণ সকলেই ইহা পাঠে সুবিশেষ উপকৃত হইবেন। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীশ্রীমা-দাদা কার্যালয়—ইলুহার, বরিশাল।

শ্রীশ্রীমা-দাদা শাখা কার্যালয়—২২১২ ট্রাঙ্ক ব্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা।

মহেশ লাইব্রেরী—২১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা।

বাণী লাইব্রেরী—১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

অন্ন শচীনন্দন জয় গৌরহরি ।

বিক্রিয়ায় প্রাণনাথ নদীয়াবিহারী ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত জয়ন্তী সংখ্যা

শ্রীশ্রীমা-দাদা

সার্বজনীন প্রেমপ্রচারক একমাত্র মাসিক পত্রিকা

—কাল-পুণ—

৪৫৯ গৌরাঙ্গ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ ।

প্রধান কার্যালয় :

ইলুয়ার, বরিশাল (বেঙ্গল) ।

কলিকাতা শাখা :

২২১-২, ষ্ট্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক বোড্ ।

বার্ষিক—৪

প্রতি সংখ্যা—১০

সূচীপত্র

১। সখি ! কলয় গৌরমুদারম্	...	৫৪৭
২। প্রার্থনা (কবিতা)	...	৫৪৯
৩। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু	...	৫৫০
৪। ওয়েলস বনাম নিউ ডিল	...	৫৫৫
৫। মহাত্মা শিশিরকুমারের প্রসঙ্গ	...	৫৫৯
৬। শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ব	...	৫৬১
৭। Dialogue between Sree Gouranga and Bishnupriya	...	৫৬৩
৮। একখানি চিঠি	...	৫৬৪
৯। আশা (কবিতা)	...	৫৬৪
১০। বাঁশীর সন্ধানে	...	৫৬৫
১১। অধ্বশিক্ষিতের অবস্থা (কবিতা)	...	৫৬৬
১২। বাঁশীর সন্ধানে	...	৫৬৭
১২। বার্তাবহ	...	৫৬৮



স্বপ্নসম্পাদক—

গৌরপ্রেমসুধাসিদ্ধ শ্রীমশালকাস্তি বোষ, ভক্তিভূষণ ।

সাহিত্যভূষণ শ্রীবিধুভূষণ সরকার, বি. এ., বিজ্ঞাবিনোদ ।

কেনবার সময়
“ড্যাড কো”

ছাপ্টি দেখে নিলে আর ভয় থাকে না

রবার সেট সেভিংব্রাশ

হরেকরকম ডিজাইন

মণিব্যাগ—ভ্যানিটা ব্যাগ—পোর্টফোলিও শান্তিনিকেতন ও অজস্র ফ্রেশো, ইত্যাদি
বহুপ্রকার নক্সা, বিভিন্ন আকার ও বিভিন্ন দামের,—সস্তা অথচ মজবুত

সোনার ছোপ দেওয়া

মেয়াদী গ্যারান্টিযুক্ত

হরেকনক্সার—বোতাম, হাতের বোতাম, হার, চুড়ি, কানের অলঙ্কার, ইত্যাদি।

মেয়াদী সময়ের মধ্যে বর্ণচ্ছটার পরিবর্তন হইলে বিনামূল্যে পরিবর্তন করা হয়।

—ইহা ছাড়া—

মফঃস্বলের গ্রাহকবৃন্দের সুবিধার্থে—সর্বপ্রকার মাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়।

দাদা প্রমুখ কোং

অফিস :—২২১/২, ষ্ট্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা।

কারখানা :—৮৮বি, মেছুয়াবাজার, ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও যাদবপুর।

শ্রী গুরু ইলেকট্রোমোটিং ফাউন্ড্রি

২২নং বাহাদুরপুর লেন।

ফরিদাবাদ, ঢাকা।

ছুরী, কাঁটা, চামচ ইত্যাদির বিশ্বস্ত প্রস্তুতকারক।

যাবতীয় ইলেকট্রোপ্লেটিংএর কাজ করা হয়।

যুদ্ধের দরুণ অধিক মূল্য ধরা হয় নাই।

মফঃস্বলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য

প্রতিষ্ঠান। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীমা-দাদা

“মাতৃস্বের ভ্রাতৃস্বের উজ্জল আলোকে,
নদীয়ার প্রেমধারা বহুক ভুলোকে।”

২য় বর্ষ	৪৫৯ গৌরাদ	ফাল্গুন
১১শ সংখ্যা	ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪	১৩৫০ সাল।

সখি ! কলয় গৌরমুদারম্

গৌরপূর্ণিমা আসিতেছে। এই পুণ্য তিথিতে, পুণ্য শুক্লপক্ষে, এই পুণ্য কাল্ধনে, আসন্ন আমরা মিলিত কণ্ঠে রাজরাজেশ্বর শ্রীগৌরঙ্গসুন্দরের জয়ধ্বনি দিয়া ঠাকুর রাধামোহনের অমুগত হইয়া প্রাণ খুলিয়া গুঞ্জরী রাগিণীতে গান করি।

সখি ! কলয় গৌরমুদারম্।

এই রাধামোহন ঠাকুর শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বৃদ্ধ প্রপৌত্র। শ্রীগৌরঙ্গেশ্বরের ধারা সমভাবে রক্ষা করার জন্য প্রভু শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে ধরাদামে প্রকট করাইলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য আসিবার অল্পকাল পরেই মহাপ্রভু অপ্রকট হইলেন। তারপর শ্রীনিবাসই মহাপ্রভুর শক্ত্যাবেশে গৌরধর্ম বিস্তার করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভু ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত প্রকট লীলা করিলেন। তিনি অপ্রকট হইলে তাহার আটচল্লিশ বৎসর পরে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, ঠাকুর নরোত্তম প্রভৃতি খেতরীতে মহাসমারোহ করিয়া গোড়, উৎকল বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণববৃন্দ লইয়া গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া সেবা স্থাপন করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ছিলেন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য। শ্রীজীব গোস্বামী রূপসনাতনের আদেশে তাঁহাকে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করান। তাঁহাদেরই শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া তাঁহাদেরই অভিপ্রায়ানুসারে যে এই নদীয়া-যুগলসেবা স্থাপিত হইল, সে বিষয়ে আর বিদ্ভ্রান্ত সন্দেহের কারণ নাই। এই গৌরবিষ্ণুপ্রিয়াই স্বকীয়া রতির পূর্ণ প্রকাশ—অবশ্য পরকীয়া রতিও ইহার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

শ্রীজীব গোস্বামী নিত্য-প্রেমময়ধামে অর্থাৎ গোলোকে পরকীয়ারতির নিত্য স্বীকার করেন না। তিনি যে ‘গোপাল চম্পু’ নামক গ্রন্থ লিখিলেন, তাহা একধাণি অতি প্রামাণ্য গ্রন্থ। কবিরাজ গোস্বামী কহিয়াছেন—

গোপালচম্পু করিল গ্রন্থ মহাশূর।

নিত্যলীলা স্থাপন বাহে ব্রজরসপূর।

এখানে যেমন ঐ গ্রন্থখানিকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাশূর এবং ব্রজরসপূর্ণ নিত্যলীলা স্থাপনের প্রামাণ্য গ্রন্থ কহিলেন, অগ্রত্ব তেমনই আবার তিনি এই গোপালচম্পুকে ‘গ্রন্থসার’ বলিয়াছেন। এই গোপালচম্পু গ্রন্থে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী নিত্যকাস্তাব্যে স্বকীয়া রতিকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি আবার শ্রীজীব কৃত দার্শনিক-তত্ত্বপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভের সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত—ইহা শ্রীজীব নিজেই বলিয়াছেন। সুতরাং সেই শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভের সিদ্ধান্তেও নিত্যগোলোকে কাস্তাব্যের স্বকীয়া রতিরই নিত্য বলা হইয়াছে—পরকীয়া রতির নিত্য বলা হয় নাই। শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট হইতেই শ্রীনিবাস আচার্য্য এই ভাব ও এই সিদ্ধান্ত পাইয়াছেন। গোপালচম্পু-বর্ণিত নিত্যস্বকীয়ারতিময় শ্রীরাধার কাস্তাব্যই যে গৌরবিষ্ণুপ্রিয়াতে পূর্ণ প্রকাশমান, শ্রীনিবাস ইহা পূর্ণ মাত্রায়ই উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই তিনি সমগ্র বৈষ্ণবমণ্ডলী লইয়া নিত্যস্বকীয়া রতির পূর্ণপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলসেবা স্থাপন করিলেন, এবং প্রকট অপ্রকট সমস্ত গৌরপার্বদগণের উপস্থিতি দ্বারা, এই

ভজনেই যে সকল ভজনের পরাকাষ্ঠা, তাহা দৃষ্টীকৃত হইল।

শ্রীগতিগোবিন্দ ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পুত্র ও মন্ত্র-শিষ্য। তিনিও যে এই মতের সমর্থক তাহা বলাই বাহুল্য। এই গতিগোবিন্দ ঠাকুরের প্রপৌত্র ঠাকুর রাধামোহনের সময় দৈবক্রমে স্বকীয়া রতি ও পরকীয়া রতি সম্বন্ধে পণ্ডিতসভায় প্রকাশ্য বিচার হয়। রাধামোহন স্বকীয়া রতিরই নিত্যত্ব ও প্রাধান্ত স্থাপন করেন এবং তাঁহাকে সকলে এক বাক্যে জয়পত্নী লিখিয়া দেন। এই বিচারে ঠাকুর মহাশয়ের পরিবার এবং শ্রীজীব গোস্বামীর পরিবারের অনেকেই পরকীয়া মতবাদের অমুকূলে বহু শাস্ত্রীয় তর্ক উপস্থাপন করেন বটে, কিন্তু সকল যুক্তি-তর্ক, সকল মত খণ্ডন করিয়া স্বকীয় মত বাদই স্থাপিত হইল। ঠাকুর মহাশয়ের পরিবার পরকীয়া বাদের অমুকূল হউন বা না হউন, ঠাকুর মহাশয় নিজে যে কাস্তাভাবের নিত্য স্বকীয়াই পোষণ করিতেন, তাহা অবিসংবাদিত সত্য, তাহার খেতরীয় মহামহোৎসব এবং সেই উৎসবে গোপালপুরের বিপ্রদাসের ধান্তগোলা হইতে অপ্রাকৃত ভাবে গৌরান্দ্রবিষ্ণুপ্রিয়ায় যুগল মুষ্টি আনয়ন ও সেবা স্থাপনই তাহার বিশিষ্ট সাক্ষী।

যাহা হউক রাধামোহন ঠাকুর ইহার পর এই নিত্য-স্বকীয়া ভাবের একটা গান লিখিলেন। জয়দেব গোস্বামী তাঁহার শ্রীগতিগোবিন্দে একট-ব্রজধামে পরকীয়ারতির আদর্শ শ্রীরাধার কৃষ্ণস্বরূপ বিষয়ক একটা গান লিখিলেন, যথা—

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্।

স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥ ৫৭

চন্দ্রকচাক্ষু ময়ূর শিখণ্ডকমণ্ডলকলয়িত-বেশম্।

প্রচুর পুরন্দর ধনুঃসুরজিত মেঘুর যুদির স্তবেশম্ ॥ ইত্যাদি

অর্থাৎ শ্রীরাধা কহিতেছেন—সখি! যিনি রাসে বিবিধ-বিলাস সময়ে আমার সহিত পরিহাস করিয়াছিলেন, যাহার কেশপাশ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ময়ূরপুচ্ছমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া ইন্দ্রধনু দ্বারা অনুরঞ্জিত সিন্ধু মেঘমালায় স্তায় শোভিত, সেই শ্রীহরিকে আমার মন স্মরণ করিতেছে।

এই গানটা শুক্লরী রাগিণীতে গীত। শ্রীগৌরান্দ্র মহাপ্রভু

বিরহিণী রাধার ভাবে এইরূপ গীতগোবিন্দের পদ আশ্বাদন করিয়াছেন। ঠাকুর রাধামোহনও প্রভুর রাধাভাবোচিত বহু পদ বর্ণনা করিয়াছেন বটে; কিন্তু প্রভু স্বয়ংভাবে যে ভজনীয়, তাহাও তিনি নিম্নলিখিত পদে বর্ণনা করিয়াছেন, উহা স্বকীয়ারতির পূর্ণ প্রকাশক। পদটি এই :—

মধুকর-রঞ্জিত, মালতী-মণ্ডিত জিতবন-কুঞ্চিত কেশম্।

তিলক-বিনিম্বিত শশধর-রূপক যুবতী মনোহর বেশম্ ॥

সখি! কলয় গৌরমুদারম্।

নিম্বিত-হাটক কান্তিকলেবর গর্বিত-মারকমারম্ ॥ ৫৮

মধু মধুরস্মিত লোভিত তরুভূত-মহুপম ভাববিলাসম্ ॥

নিধুবন নাগরী মোহিত মানস বিকথিত গদগদভাবম্ ॥

ইত্যাদি

এইটী শ্রীনন্দীমানাগর-নটবর-শ্রীগৌরান্দ্রসুন্দরের রূপ-বর্ণনা। প্রভু গজদ্বীপ-লীলায় জয়দেব-বর্ণিত কৃষ্ণরূপ রাধাভাবে আশ্বাদন করিয়াছেন; আর শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীনবদ্বীপে মহাগজদ্বীপলীলায় নিত্য নবকিশোর নাগয়েন্দ্র গৌরচন্দ্রের রূপ আশ্বাদন করিতেছেন, ইহাই ঠাকুর রাধামোহনের ঐ পদের সারমর্ম বলিয়া মনে হয়। ইহাই ভজনের পূর্ণ আদর্শ। এই মালতী-মণ্ডিত জিতবনকুঞ্চিত কেশ শ্রীগৌরান্দ্রসুন্দরই আমাদের জীবমাত্রের ভজনীয়। তাই, আশ্রয় আমরা এই গৌর-পূর্ণিমা সমাগমে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের জয়ধ্বনি দেই আর মিলিত কণ্ঠে গাই—

সখি! কলয় গৌরমুদারম্

শ্রীগৌরান্দ্র বড়ই উদার—বদান্তশ্রেষ্ঠ দাতাশিরোমণি।

তিনি পাত্রপাত্র বিচার না করিয়া আপামর সর্বসাধারণকে স্বীয় প্রেমনামাযিত দান করিলেন—তাঁহার প্রেম কোনকালে জীবকে দেওয়া হয় নাই, এই প্রেমরূপ মহাসম্পত্তি এতকাল গুপ্ত ছিল। কে কবে জানিত শ্রীভগবান্ অদোষদর্শী, প্রেমময়, জীবের অতি নিজজন! কে কবে জানিত শ্রীভগবান্কে নিজজনবোধে দাস্ত সখ্য বাৎসল্য মধুরভাবে ভজন করা যায়। কে কবে না ভজিতে প্রেমধন দান করিয়াছে! তাই শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী প্রাণ খুলিয়া শ্রীগৌরান্দ্রের শরণাপন্ন হইতে বলিলেন। তিনি কহিলেন—

চিরাদদন্তঃ নিজগুণবিস্তঃ

স্বপ্রেমনামামৃতমৃত্যুদারঃ।

আপামরং যো বিততার গৌরঃ

কৃষ্ণে জনেভ্য স্তমহং প্রপদ্যে।

যে গৌর পূর্বে ব্রজধামে কৃষ্ণরূপে লীলা করিয়া নিত্যসিদ্ধ পার্শদগণের প্রেম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি পূর্বে প্রেমগ্রহীতা ছিলেন, তিনি এবার অতি উদার হইয়া প্রেমদাতারূপে জীবের গোচর হইয়াছেন এবং জনে জনে এই অপ্রাকৃত প্রেম দান করিয়া আমাদের জর্জরিত মানবজন্ম সকল কবিবার সুযোগ দিয়াছেন।

আমুন আমরা গাই—

নির্দিত-হাটককাস্তিকলেবর গর্জিতগারকমারম্।

মারদেব বড় গর্ব করিতেছেন যে তিনি জীবের উপর এমনই প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছেন যে, জীব প্রাকৃতরূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ শব্দের মোহে, মদন-মাদকতায় উন্মত্ত হইয়া জলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে এবং হিংসাঘেবোদ্ধৃত সমরানলে নিজকে আহুতি দিয়া ধ্বংসোন্মুখ হইতেছে। এই অপ্রাকৃত রূপ-রসময়, অশেষ মাধুর্য্যময়, প্রেমের অনন্তনিধি শ্রীগৌরানন্দস্বরের বশুগণন করিলে মারদেবের গর্ব ধ্বংস হইবে। জীব পরস্পর ভাই ভাই বলিয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিবে, জগত সুশীতল হইবে। তখন সরস্বতীপ্রবোধানন্দের মত আগবা সকলেই দেখিতে পাইব।

বিশ্ব পূর্ণসুখায়তে।

প্রার্থনা।

ওগো প্রভু আরোজনে কেটে গেল দিন।

শ্রান্ত পথে শ্রান্ত হয়ে, বিদ্রূপ বিহীন।

খুরিয়াছি সারা বেলা বনে উপবনে।

তোমার পূজার পুষ্প পত্র অশ্বেষণে ॥

কিরে এমু রিক্ত হাতে, ক্লান্ত কলেবর।

ধূসর ধূলিতে ম্লান, কণ্টকে জর্জর ॥

এই কি পাথের মোর, জীবাচার পথে।

এই কি লভিলু আমি আসি এ জগতে ?

তা যদি না হয় তবে যাবা চাহি দাও।

জীবন ব্যর্থতা হতে আমারে কিরাও ॥

তোমার সার্থক পথে যোগ্য কর তারে।

তোমার মন্দির তলে ঐহ লভিবারে ॥

দাও শক্তি দুর্বলতা করি পরিহার।

সবলে করিতে মুক্ত, ভব সিংহদ্বার ॥

চক্ৰবালা—রংগুব

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ।

(পূর্বসংস্করণ)

—অনুগম—

প্রয়োজনানুরূপ সকল ব্যবস্থাই শ্রীভগবান করিয়া থাকেন । তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে নিত্য নবরূপ লীলা প্রকট হইল আবার ক্ষণ পরেই তাহা অন্তর্হিত হইল, তখন তিনি ধৈর্য্য-হারী হইলেন । যাহা সাধন-সাপেক্ষ, তৎক্ষণ বরং চেষ্টা করা যায়, কিন্তু কৃপা-সাপেক্ষ বস্তুর জন্ত ক্রন্দন ছাড়া আর উপায়ান্তর নাই । তাই চোখের জল বৈষ্ণবের বা গৌরভক্তের সম্বল । শ্রীনিবাস বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন । কাঁদানও তিনি, সাধনা করেনও তিনি । শ্রীভগবানের জন্ত যখন প্রবল আশ্রিত হয়, তখন তিনি স্বয়ং দর্শন দেন, অথবা দর্শন পাওয়ার জন্ত ব্যবস্থা করেন । শ্রীনিবাস দেখিলেন, সম্মুখে একজন অতি স্নেহপরায়ণ ব্যক্তি দাঁড়ান ; তিনি কহিলেন, “বাপু কাঁদিতেছ কেন ? প্রভুর বাড়ী যাবে ? এই গথে যাও ।” গথ দেখাইয়া দিয়াই সেই লোকটা অদৃশ্য হইলেন ।

শ্রীনিবাস এক পা দুই পা করিয়া প্রভুর বাড়ী গেলেন । বংশীবদন ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিলেন, ইনিই সেই শ্রীনিবাস । গৌরগতপ্রাণ শ্রীনিবাসের কথা চতুর্দিকেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে । বালকের নয়নে ধারা, অপূর্ণ আশ্রিত ও আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া বংশীবদন ঠাকুর তাঁহাকে চিনিলেন বটে, তথাপি পরিচয় লইয়া যখন জানিলেন যে এই বালকটাই শ্রীগৌরানন্দনন্দের সেই পরম প্রিয় বস্তু, তখন তিনি শ্রীনিবাসকে বুকে করিলেন ও নয়নজলে তাঁহাকে সিক্ত করিলেন । শ্রীনিবাস প্রণাম করিতে চাহেন, শ্রীবংশীবদন তাঁহাকে কোল হইতে ছাড়িতে চাহেন না । বংশীবদন অনতিবিলম্বে শ্রীদ্বৈত বিষ্ণুপ্রিয়া মাকে সংবাদ দিতে অন্তঃপুরে গেলেন ।

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া তখন অন্তঃপুরে স্বীয় প্রিয় দাসীর নিকট পূর্ব রজনীর স্বপ্ন বৃত্তান্ত নয়ন জলে ভাসিতে ভাসিতে কহিতেছিলেন । শ্রীগৌরানন্দনন্দের তাঁহাকে বলিয়া গিয়াছেন,—“অদ্য এক ব্রাহ্মণকুমার তোমাকে দর্শন করিতে আসিবেন । বহু দুঃখ পাইয়া তিনি তোমার কাছে আসিতেছেন । অতি নিজস্বন জানিয়া কৃপা করিও । তিনি আমার বিরহে যে

দুঃখ পাইয়াছেন, সে দুঃখের অবধি নাই, তুমি তাহার লাঘব করিও ।” এই কথা বলিয়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া - প্রভু যে অপূর্ণ ভুবনমোহনরূপে আসিয়া দর্শন দিয়াছেন, সেই রূপ-মাধুরী বর্ণনা করিতেছিলেন । শ্রীমতী কহিতেছিলেন,—“নটবর প্রাণবল্লভের আমার কি অপূর্ণ রূপের ছটা, কোটি চাঁদের কিরণ বা বিজুরীর ঘটা তার আগে কিছুই নয় । কোটি মন্থণ তা দেখিয়া দূরে পলায় ! কি বা সে চাঁচর চিকুর ! শ্রীঅঙ্গের কি অপূর্ণ সৌরভ ! কমলদল জিনিয়া দীঘল আঁখি দুটী । অশেষ প্রেম সেই আঁখি দুইটী হইতে বিকীর্ণ হইতেছিলেন । সে চাহনি দেখিলে ধৈর্য্য রাখা দায় হয় । সেই চাঁদবদনে কি মুহূ-মন্দ হাসি ! হাসিতে অমিষ-ধারা বর্ষিত হইতেছিল । কত না আদরে আগারে বসাইয়া ধীরে অতি মধুর বচনে শ্রীনিবাসের কথা কহিলেন । আমি আপনা হারা হইয়া । তাঁহার সেই অমিয়মাখা কথা শুনিতেছিলাম । বলিতে বলিতে তিনি অদর্শন হইলেন । ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল । দুঃখের পাথারে পড়িয়া আগিয়া উঠিয়া বসিয়া রহিয়াছি । বুঝিলাম সেই শ্রীনিবাস আমার প্রভুব অতি প্রিয় । মনে হয় সে শীঘ্রই আসিতেছে ।”

এমন সময় বংশীবদন ঠাকুর আসিয়া সংবাদ দিলেন যে নীলাচল হইতে শ্রীনিবাস আসিয়াছে । শুনিয়াই শ্রীদ্বৈত শ্রীনিবাসকে আনিবাব জন্ত ইচ্ছা জানাইলেন । শ্রীনিবাস আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমিতে লোটাইয়া প্রণাম করিলেন । প্রিয়দাসী কহিলেন,—“অই শ্রীনিবাস প্রণাম করিতেছে ।” দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর বিরহ দাব-দাহে জ্বলিতে-ছিলেন । তথাপি শ্রীনিবাসকে দেখিয়া তাঁহার হর্ষ হইল । তিনি তাহার মস্তকে শ্রীচরণ দিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং বাৎসল্যস্নেহে মধুর বাক্যে তাহাকে স্তুষ্ট করিলেন । এখানে শ্রীমহাপ্রসাদ পাওয়ার জন্ত শ্রীনিবাসকে আশ্রিত দিলেন । শ্রীনিবাস কয়েক দিন এখানে রহিলেন এবং শ্রীনিবাসের আগমন শুনিয়া শ্রীবাস, মালিনী দেবী, দামোদর পণ্ডিত, গদাধর দাস, সঞ্জয়, শুক্লাশ্ব ব্রহ্মচারী প্রভৃতি যাহারা তখনো

একট ছিলেন, সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। শ্রীনিবাসও দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া সকলের কৃপাশীর্ষাদ লইলেন।

শ্রীগোরাঙ্গকে পাইতে হইলে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া কৃপা যে সর্বোপরি, এই ঘটনা দ্বারা প্রভু তাহা দেখাইলেন। শ্রীনিবাসের জীবনীতে দেখা যায়, তিনি প্রথমতঃ পিতার মুখে গোরাঙ্গের কাহিনী শুনিলেন। শুনিয়া গোরাঙ্গকে পাওয়ার জন্ত তাঁহার প্রবল আশ্ৰিত হইল। তাই তিনি ছুটিলেন। সর্বপ্রথম শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের কৃপা লাভ করিলেন। এই সরকার ঠাকুর গোরাঙ্গের সজ্জন করিতেন। তাঁহার কৃপা পাইয়া তিনি প্রভুর দর্শনাশায় নীলাচল-মুখী ছুটিলেন। সেখানে প্রভুব দর্শন পাইলেন না। পাইলেন গদাধর পণ্ডিত গোঁস্বামীর দর্শন। গদাধর তাঁহাকে কৃপা করিলেন। শ্রীনিবাস ভাবিলেন, গদাধরের শ্রীচরণান্তিকে থাকিয়া গোরাঙ্গের আশ্বাদনে জীবন কাটাইবেন। গদাধর তাহা দিলেন না। 'দিবেনই বা কেন? গোরাঙ্গের ধাম দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার কৃপা সর্বোপরি। গদাধর এসব মুখে কিছু কহিলেন না বটে, কেবল মাত্র তাঁহাকে কহিয়া দিলেন, 'তুমি বাছা, গোড়দেশে যাও।' অনিচ্ছা-সত্ত্বেও শ্রীনিবাস গদাধরের আদেশ পালন করিতে গোড়দেশে আসিলেন। আসিয়া আর তিষ্ঠিতে পারেন না। তখনো তিনি শ্রীমতীর কাছে না যাইয়া, কাল বিলম্ব না করিয়া, পুনরায় গদাধরের কাছে থাকিবার জন্ত নীলাচলে ছুটিলেন। গদাধর তখন অদর্শন হইয়াছেন। অপ্রাকৃত ভাবে গোর ও গদাধর দর্শন দিয়া তাঁহাকে গোড়ে আসিতে আজ্ঞা দিলেন। এবার তিনি গোড়ে ফিরিয়া আসিয়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার দর্শন পাইলেন। শ্রীনিবাসকে কৃপা করার জন্ত প্রভুও দেবীকে আদেশ দিলেন এবং দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াও তাঁহাকে অশেষ কৃপা করিলেন, শ্রীনিবাসকে কৃপা করার জন্তই শ্রীমতী এ পর্যন্ত বিরহ বেদনা সহিয়াও প্রকট রহিয়াছেন এবং প্রভুও এই জন্তই শ্রীমতীকে এতদিন ধরাধামে প্রকট রাখিয়াছেন। ইহার পরই শ্রীমতী অপ্রকট হন। সে-ও এক অপূর্ব কথা। তাঁহার সেবিত শ্রীগোর বিগ্রহকে আলিঙ্গন করিয়া তিনি সেই বিগ্রহে মিশিয়া

গেলেন। শ্রীগোরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়া-যে একই বস্তু এইরূপে তাহা জীবের গোচর করিলেন। উভয়ই পূর্ব চিদানন্দময়, গোর জগন্নাথ ও গোপীনাথ, মিশিয়া গিয়া এবং বিষ্ণুপ্রিয়া গোরের মিশিয়া গিয়া তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ জীবকে জানাইলেন। কোনও দেশে, কোনও কালে, কোনও অরতারে এরূপ ঘটনা হয় নাই।

শ্রীনিবাস প্রভুর বাড়ীতে কয়েক দিন থাকিয়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার বিষয়-বিরহদশা স্ফুট দেখিয়া বুঝিয়াছেন গোরাঙ্গের বস্তুটি কি! শ্রীমতী এক একটা তণ্ডুল গণিয়া গণিয়া হরিনাম সংখ্যা পূর্ণ করিতেন এবং দিনান্তে সেই তণ্ডুল পাক করিয়া তাহার কিকিয়াত্র নিজে ভক্ষণ করিয়া কোনরূপে জীবন রক্ষা করিতেন। সে-ও কি জন্ত? না— এই শ্রীনিবাসকে শক্তিসম্ভার করিয়া তাঁহা দ্বারা প্রেমধর্ম প্রচার করিবার জন্ত। জীবের দুঃখে তিনি এতই কাতর। গোরকে ত তিনি নদীয়ার বাহিরে পাঠাইয়াছেন। সেই গোর প্রেমনাম বিতরণ করিয়া অপ্রকট হইয়াছেন। এখন তিনিই নিভূতে বিরলে বসিয়া জীবের জন্ত হরিনাম-সংখ্যা পূর্ণ করিতেছেন। শ্রীনিবাসকে দিয়া জীবের কল্যাণ সাধন করাইতে হইবে, এইজন্ত তিনি অতি কষ্টে ধরাধামে রহিয়াছেন। দুঃখ ও সুখ দুই-ই জগতে রহিয়াছে, সুখের ভাগ জীবকে দেওয়ার জন্তই যেন শ্রীগোরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়া দুঃখের ভাগ নিজেরা বরণ করিয়া লইলেন। জীবের দুঃখ মোচন করিবার জন্ত এরূপ কি কেহ কখন আর দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন? বাহা হউক, শ্রীমতীর বিরহ শ্রীনিবাসের চিত্তে এমনই শেলসম বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহারই ফলে উত্তর কালে তিনি ঠাকুর নরোত্তমকে লইয়া এই ঝুগল মিলন করাইয়া গোরবিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহ সেবা মহাসমারোহের সহিত খেতরীতে প্রকাশ করিলেন। এই সময় ঠাকুর মহাশয় একটি পদ গাহিয়াছিলেন—

কি দিব কি দিব ঝুগল মনে করি আমি।

যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥

অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া ও তুমি ত একই বস্তু, সেই বিষ্ণুপ্রিয়াই তোমাকে দিলাম। তাই ঠাকুর নরোত্তম পদশেবে গাহিলেন—

তোমার ধন তোমায় দিয়ে দাসী হ'য়ে র'ব ॥
জীবমাত্রেরই এই আদর্শে গৌরবিকুপ্রিয়া ভজ্ঞন করা কর্তব্য।
ইহাতে সকল দুঃখের অবসান হয়, অকুরন্ত সুখের নিধি প্রাপ্ত
হওয়া যায়।

৭

শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভুর পরিকরগণ বাহারা প্রকট ছিলেন,
তাহারা শ্রীনিবাসকে শীঘ্র শ্রীবৃন্দাবন বাইতে আদেশ দিলেন।
শ্রীনিবাস শান্তিপু্রে শ্রীঅচ্যুতানন্দাদির কৃপা লইয়া খড়দহ
শ্রীনিত্যানন্দালয়ে গেলেন। শ্রীপরমেশ্বরী দাস-তাহাকে লইয়া
শ্রীবনুধা ও জাহ্নবী দেবীদ্বয় ও নিত্যানন্দ-তনয় বীরভদ্র
চন্দ্রের সহিত মিলন করাইলেন। 'চাঞ্চন্দির শ্রীনিবাস
আসিয়াছে' খড়দহের চতুর্দিকে এই সংবাদ অবিলম্বে প্রচারিত
হইল। সকলে তাহাকে দেখিতে আসিলেন। সূর্য্যদাস,
গৌরীদাস, মহেশ-পণ্ডিত সকলেই তাহাকে স্নেহ-কৃপা
করিলেন। চার পাঁচ দিন এখানে রাখিয়া বনুধা ও জাহ্নবী
দেবী তাহাকে অভিরাম ঠাকুরের কাছে পাঠাইলেন। এখানে
তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর বহু লীলারহস্য দেখিলেন। খানাকুল
কৃষ্ণনগরের নিকট বীরলোকে অভিরাম গোস্বামীর শ্রীপাট।
ঠাকুর অভিরাম পূর্বে শ্রীদাম সখা ছিলেন। বীরলোকে
বাইতে খানাকুলবাসী একটি প্রাচীন ব্রাহ্মণকে শ্রীনিবাস
সঙ্গী পাইলেন। সেই ব্রাহ্মণের মুখে তিনি অভিরাম ঠাকুরের
কাহিনী শুনিলেন। অভিরাম সখ্যভাবে সর্বদা আবেশিত-
চিত্ত থাকিতেন। গোপীনাথ তাহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া
একটি স্থান দেখাইলেন। সেই স্থান খনন করিয়া তথা
হইতে গোপীনাথ মুক্তি আনিয়া স্বীয় পত্নী মালিনী দেবীর
সহিত পরমানন্দে তাহার সেবা করেন। শ্রীনিতাই গণসহ
মধ্যে মধ্যে তাহাকে দর্শন দিতে আসিতেন। নৃত্যগীতে
অভিরাম বড়ই চতুর। একদিন তিনি অল্পপম ভঙ্গীর নৃত্য
করিতে করিতে সখ্যরসাবেশে বাঁশী বাজাইতে চাহিলেন।
এদিক ওদিক চাহিয়া নিজের বাঁশী পাইলেন না। তখন
প্রকাণ্ড একখণ্ড কাষ্ঠ সমুখে দেখিলেন। পনের বিশ জনের
কৃমে উহা উঠাইতে পারে না। উহাই অভিরাম উঠাইয়া
হাতে বাঁশীরূপে ধরিলেন। এইরূপ বহু অলৌকিক লীলা-
মাঝে মাঝে তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। এখন নিত্যানন্দ

বিরহে কেবল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন, কাহারো সহিত বড় একটা
কথা কহেন না। এইরূপ বহু কথা কহিয়া ব্রাহ্মণ অভিরামের
বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছাইয়া সেখান হইতে বিদায় লইলেন।

... শ্রীনিবাস ঠাকুর অভিরামের বহির্দ্বারে বসিয়া রহিয়াছেন।
ঠাকুর অভিরাম বেশ রসিক লোক। তিনি সংবাদ পাইয়া-
শ্রীনিবাসকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। এ পরীক্ষার
উদ্দেশ্য শ্রীনিবাসের মহিমা প্রকাশ করা। তিনি এই বালক
অতিথির সেবাব্যবস্থা নিজের বাড়ীতে না কবিয়া দশকড়া
কড়ি তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীনিবাস ইহা দ্বারা যথা-
যোগ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া দারুণেশ্বর নদীর তীরে বাইয়া রন্ধন
করিলেন এবং কৃষ্ণের ভোগ লাগাইলেন। এমন সময় ঠাকুর
অভিরাম কর্তৃক প্রেরিত চারিজন বৈষ্ণব অতিথি আসিয়া
উপস্থিত। বালক-অতিথির নিকট আবার অতিথি।
এক জনের ভক্ষ্য বস্তুর উপর ভাগ বসাইতে চারিজনকে
প্রেরণ। শ্রীঅভিরামের রসিকতা কত। শ্রীনিবাস ঐ
চারিজনকে যথাযোগ্য প্রণাম করিয়া মহাপ্রসাদ ভুঞ্জাইলেন।
বৈষ্ণব চারিজন অভিরামকে আসিয়া জানাইলেন, তাহারা
যেমনই শ্রীনিবাসের বিনয় ব্যবহারে তুষ্ট হইয়াছেন, তেমনই
আকর্ষিত পুরিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়াছেন। এইভাবে
ঠাকুর অভিরাম সেইখানে শ্রীনিবাসের মহিমা প্রকাশ
করিলেন।

শ্রীনিবাসকে তখন বাড়ীতে আনান হইল। আনাইয়া
অভিরাম তাহার জয়মঞ্জল নামক চাবুক তিনবার তাহার
অঙ্গে স্পর্শ করাইলেন। চতুর্থবার স্পর্শ করাইতে বাইতেছেন,
এমন সময় অভিরামের পত্নী মালিনীদেবী স্বামীর হাতে
ধরিয়া বারণ করিয়া কহিলেন,—“এ যে বালক! যে কৃপা
করিয়াছ তাহাই যথেষ্ট। ইহার অধিক সে সহ্য করিতে
পারিবে না। ইহা দ্বারা বহু কার্য সাধিত হইবে। প্রেমে
মত্ত হইলে তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে।” তখন পতি-পত্নী
উভয়ে বালকের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন।
বালকও ভূমিতে পড়িয়া উভয়কে প্রণাম করিলেন, এবং
তাহারাও নয়নজলে সিক্ত হইয়া শ্রীনিবাসকে কোলে
লইলেন। তাহারা তখন তাহাকে শ্রীবৃন্দাবন বাইতে আদেশ
দিলেন।

শ্রীনিবাস তথা হইতে শ্রীধণ্ডে গেলেন। সেখানে নরহরি ও রঘুনন্দনের কাছে ভ্রমণ বৃত্তান্ত সকল নিবেদন করিয়া যাজ্ঞিকগ্রামে মাতার কাছে আসিলেন। বৃন্দাবন যাওয়ার জন্ত মায়ের অনুমতি চাহিলেন। পুত্রের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া মা বারণ করিতে পারিলেন না। শ্রীনিবাস কহিলেন, তিনি বৃন্দাবন হইতে দেশে ফিরিয়া আসিবেন। মা আশ্বস্ত হইয়া প্রসন্নচিত্তে অনুমতি দিলেন। চার পাঁচ দিন থাকিয়া গ্রামবাসী সকলের সহিত মিলিত হইয়া ও তাঁহাদের কৃপালীকাদ মন্তকে লইয়া মায়ের শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া অগ্রহায়ণের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

৮.

পথে শ্রীনিবাস অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি গ্রামে ঘরে ঘরে ভক্তগণকে দর্শন করিয়া কটকনগরে,—বেখানে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, গেলেন। এখানে তাঁহার পিতার কথা শ্রবণ হইল। পিতা গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য এখানে প্রভুর চাঁচর কেশের অন্তর্ধানে কিরূপ মুচ্ছিত হইয়াছিলেন, এবং কয়েকদিন পর্য্যন্ত ক্ষিপ্তপ্রায় ছিলেন ও আত্মার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কেবল ‘চৈতন্ত’ ‘চৈতন্ত’ নাম উচ্চারণ করিতেন, ইত্যাদি বহু কথা মনে পড়ায় শ্রীনিবাস বিকল হইয়া পড়িলেন। সেই সন্ন্যাসের সময় তাঁহার পিতারই যখন এই অবস্থা হইয়াছিল, তখন গৌরজননী শচীদেবী ও গৌরগৃহিণী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর গৌরবিরহ কি মর্ম্মস্তদ হইয়াছিল, তাহা কল্পনা করিতেও শ্রীনিবাসের হৃদয় বিদরিয়া যাইতে লাগিল। তবে এখানে তিনি একটা সামান্য বস্ত্র পাইলেন। সেটা হইল ঠাকুর নরহরি-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গৌরনাগর মুর্ত্তি। ইহা দেখিয়া তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ জুড়াইতে পারিলেন না। কেননা, বিষ্ণুপ্রিয়াসহ মিলিত গৌরবিগ্রহ দেখিতে পাইলেন না। যে পর্য্যন্ত না তিনি গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া যুগল-সেবা স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্ত এই ক্লোভ তাঁহার চিত্তে সততই আগরূক থাকিত। তবে তাঁহার ইচ্ছামত কোন কার্য্য হয় না। শ্রীগৌরাক্ষ যক্ষী, তিনি যক্ষ। তাঁহারই ইচ্ছায় তিনি মর্ত্ত্যে আসিয়াছেন। তাঁহা দ্বারা প্রভু কি কার্য্য করাইবেন,

তাহা প্রভুই জানেন। তাই তিনি যন্ত্র-চালিত ভাবে কাদিতে কাদিতেই দিনযামিনী কাটাইতেছেন।

কটকনগর হইতে শ্রীনিবাস নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মভূমি একচক্রাগ্রামে যাইয়া নিত্যানন্দের বাল্যলীলাস্থলী-সমূহ প্রেমোদ্রেকনয়নে দর্শন করিলেন। এখানেও নিতাই স্বপ্নচ্ছলে পরিকরগণসহ দর্শন দিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবন যাইতে আদেশ দিলেন। এখান হইতে গয়া গেলেন। এখানে মহাপ্রভুর সহিত শ্রীদীর্ঘরপূরী মিলন-লীলা শ্রবণ করিয়া নয়নজলে ভাসিলেন। সেখান হইতে গেলেন কাশীধামে। কাশীতে প্রভু চন্দ্রশেখরের ভবনে থাকিতেন। ইহা শ্রবণ করিয়া সেই স্থানের ধূলিতে গড়াগড়ি দিলেন। চন্দ্রশেখর তখন অদর্শন হইয়াছেন। তাঁহার শিষ্য শ্রীনিবাসকে প্রভুব অবস্থিতি স্থান দেখাইলেন এবং চার পাঁচ দিন রাখিয়া যত্র সহকারে তাঁহার সেবা করিলেন ও কাশীবাসী গৌরভক্তগণের সহিত মিলন করাইলেন। তারপর প্রয়াগ ও অযোধ্যা দর্শন করিয়া ব্রজধামে চলিলেন।

শ্রীকৃষ্ণসনাতনের পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া শ্রীনিবাস গধুরায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার নয়নজল যেন আর জুড়াইবার নয়—তাঁহার হৃৎকের যেন আর শেষ নাই। বড় সাধ করিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ও গৌর-পরিকরগণের আদেশ লইয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন, বড় আশা শ্রীকৃষ্ণসনাতনের পাদপদ্ম দর্শন করিয়া প্রাণ জুড়াইবেন। বিশ্ববিশ্রুত রূপ-সনাতনের কথা শুধু পিতার মুখে কেন, বহু ভক্তের মুখে, বহু লোকের মুখেই শুনিয়া সেই ভ্রাতৃত্বকে দর্শনের জন্ত লুঙ্গ হইয়াছেন। কি মিষ্ট বস্তুই তাঁহারা পাইয়াছেন, বাহারা রস-মাধুর্য্যে অম্বরক্ত হইয়া তাঁহারা রাজোচিত ভোগৈশ্বর্য্য মলমূত্রব্যত্যাগ করিয়া শ্রীব্রজমণ্ডলে আসিয়া বৃক্ষতলবাসী হইয়াছেন। বড় সাধ করিয়াছেন শ্রীনিবাস, সেই দুই ভাইর পাদপদ্মের রূপায় গৌরপ্রেম-সুখসিদ্ধির কণা আশ্বাদন করিবেন। কিন্তু সে সাধও তাঁহার বাদ পড়িল। বিশ্রাম ঘাটে, অর্থাৎ, কংসকে বধ করিয়া কৃষ্ণ বেখানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেইখানে শ্রীনিবাস বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময় দুই চারি জন মাথুর ব্রাহ্মণ বৃন্দাবনের কথা কহিতে কহিতে তথায় আসিতেছেন। তিনি কাণ পাতিয়া শুনিতে

লাগিলেন। তাঁহার বলিতেছেন—“এত বিড়ম্বনা কি আর সহ করা যায়। কি সুখের লাগিয়া আর এ ছার জীবন রাখিব। ভগবানের ইচ্ছা কিছু বুঝা যায় না। ক্রমে ক্রমে শ্রীবন্দাবন রক্ষশূত্র হইতে লাগিল। শ্রীনীলাচলে সর্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দসুন্দর নয়নের অগোচর হইলেন। এ সংবাদ কাশীশ্বর গোস্বামী সহিতে না পারিয়া সঙ্গোপন হইলেন। প্রভুর আজ্ঞায় রঘুনাথ ভট্ট ভাগবত-বক্তা ছিলেন। তিনিও প্রভুর বিয়োগে অদর্শন হইলেন। এই কয়দিন হইল গোস্বামী সনাতনও আমাদের নেত্র-অগোচর হইলেন। আবার এখন শ্রীরূপও অপ্রকট হইলেন। দেখিয়া আসিলাম, ইহাদের অদর্শনে শ্রীগোপাল ভট্ট শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভৃতি বিরহাঙ্গি-জালায় যেরূপ অবিরত জলিতেছেন, তাহা আর বর্ণনা করা যায় না। আমাদের ভাগ্য অতিশয় মন্দ। নইলে যে সুখের তরঙ্গে আমরা ভাসিতেছিলাম, তাহার মধ্যে এ দুঃখের উদয় কেন হইবে।”

ব্রাহ্মণগণের মুখে এইরূপ আক্ষেপোক্তি শুনিয়া শ্রীনিবাস ব্যগ্র হইয়া নিকটে আসিয়া সব বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার কাঁদিতে কাঁদিতে যখন সকল বিবরণ কহিলেন, শ্রীনিবাসের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার দুঃখ, দেহে ধারণ করিতে পারিল না। তিনি মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। “কি শুনলাম, কি শুনলাম!” বলিয়া আবার উঠেন, আবার পড়েন। যখন আশ্রিনাদ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হা হা রূপ সনাতন! আমার আশা পূবিল না এবং ইহা কহিতে কহিতে নখে বক্ষঃ চিরিতে লাগিলেন, তখন

ঐ মাধুর ব্রাহ্মণগণ তাঁহার হাত ধরিলেন এবং বহু যত্নে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিলেন। শ্রীনিবাস রূপসনাতন-বিহীন বন্দাবনে থাকি অসহ্য মনে করিয়া পুনরায় পূর্বদেশের দিকে ক্রিয়া চলিলেন। পা-চলে না, তবু এক পা দুই পা করিয়া চলিতেছেন, আর ভাবিতেছেন “এই জগতই কি সকলে আমাকে শীঘ্র আসিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন! তখন বুঝি নাই আমি ভাগ্যহীন, তাই আসিতে বিলম্ব হইয়াছে। দারুণ বিধাতা আমাকে এতই বিড়ম্বনা করিল! এখনও এ ছার জীবন বাঁচিয়া রহিল! এইরূপ কত ভাবিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে আশ্রিনাদ করিয়া বলিতেছেন—হা হা রূপসনাতন! হা ভট্ট রঘুনাথ! হা পণ্ডিত কাশীশ্বর! শুনিয়াছি তোমরা পরম রূপায়! আমার প্রতি নির্দয় হইয়া কেন চলিয়া গেলে! এইরূপে কখন অঙ্গ আছাড়িয়া ভূমিতে পড়েন, কখন উঠেন এই ভাবে রাত্রি হইলে এক বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিলেন। সারারাত্রি ক্রন্দন করিয়া কাটাইলেন।

প্রভুর ইচ্ছায় শেষরাত্রে তাঁহার নিদ্রা হইল। তখন স্বপ্নক্ষেত্রে রূপসনাতন প্রভৃতি আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন। দর্শন পাইয়া শ্রীনিবাস পুলকিত হইলেন ও আনন্দাশ্রুতে ভাসিলেন। রূপসনাতন প্রেমোদ্রেকনয়নে শ্রীনিবাসের গায়ে হাত বুলাইয়া কহিলেন, “বাপ শ্রীনিবাস! এখন বিষাদের সময় নয়। শ্রীগোপাল ভট্ট আমাদের সহিত অভিন্ন তম্ব। তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ কর; এবং আমরা যে সব গ্রন্থ লিখিয়াছি, উহা অতি অবিলম্বে গোড়ে লইয়া গিয়া প্রচার কর।” ইহা বলিয়া দুই ভাই অস্তহিত হইলেন।

ক্রমশঃ

ওয়েল্‌স বনাম নিউ ডিল

শ্রীমৌলীব্রূষণ দত্ত, বি-এ,

১৯৩৫ সনে, যুদ্ধের চার বৎসর পূর্বে Mr. H. G. Wells তাঁর বিখ্যাত *The New America: The World* গ্রন্থখানা লেখেন। স্বাধী-সমাজের নিকট H. G. Wells-এর পরিচয় নূতন নয়, যেহেতু তাঁর মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্য সম্পাদনেই তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত নয়, অথবা শুধু সাহিত্য ক্ষেত্রেই তাঁর বিরাট প্রতিভা অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে নাই। *World Democracy*র তিনি একজন প্রধান সমর্থক এবং তাঁর বিশ্বপ্রসারী উদার দৃষ্টি-ভঙ্গি ও বিশ্ব-সমস্তাগুলির প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটনে আশ্চর্য্য বিশ্লেষণী ক্ষমতা, আন্তর্জাতিক দৃষ্টি-সম্পন্ন সকলেরই প্রশংসার উদ্দেশ্য করে। বইখানাতে যদিও বিশেষভাবে আমেরিকার সমস্যা এবং নূতন আমেরিকার পত্তনের জন্য 'New Deal' এর পরিকল্পনার সাফল্যের কথাই বেশী বলা হইয়াছে তথাপি ভারতীয়দের কাছে এবং সমগ্র জগতের কাছে ইহার প্রয়োজনীয়তাও কম নয়; কারণ বর্তমান যুগে inter-communication-এর সুবিধার জন্য আমরা সকলেই সকলের neighbour হইয়া দাঁড়াইয়াছি। আজ যাহা আমেরিকার সমস্যা কালই তাহা ভারতীয় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে। বিশেষতঃ যে জাতির শিল্প যত উন্নত, তাঁর সমস্যাগুলিও তত ঘোরাল, সেই গ্রন্থের প্যাচ খুলিতে যেটুকু স্বল্প বিশ্লেষণ-শক্তি, উদার মনোভাব ও ব্যষ্টির স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন তাহা আমাদের আছে কিনা—এই আত্ম-জিজ্ঞাসাও আমাদের নিজস্বগিকে করিতে হইবে, যাতে যখন আমরা কার্য্যকরী ভাবে জাতীয় সমস্যাগুলিতে হস্তক্ষেপের সুযোগ পাই তখন যেন একেবারে উদ্ভ্রান্ত হইয়া না পড়ি, অথবা আজকালকার বাস্তবতা সম্পর্কে অভিজ্ঞ কয়েকজন 'ism'-বাদী ও demagogue-এর হাতে সব ছাড়িয়া দিয়া জাতীয় সমস্যাকে আরো ঘোরালো করিয়া না তুলি।

Mr. Wells বিশ্বসমস্যাকে তিনটি প্রধান সমস্যারূপে দেখিয়াছেন। সেগুলি এই—The politico-war problem, finance—monetary problem ও unem-

ployment problem। প্রথমটিকে প্রাক্‌যুদ্ধকালীন সর্ব্বরকমের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ঠেকাইয়া রাখা যায় নাই এবং Mr. C. E. M. Joad বা Sir Norman Angell-এর মত Pacifist leader-দের শত রকমের argument-গুলিকে স্থিরভাবে ভাবিয়া দেখিবার সুযোগও জনসাধারণ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যুদ্ধ যখন একবার বাধিয়াছে তখন একপক্ষ বা উভয়পক্ষ হতবল না হইলে ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে বলিয়া আশা করা যায় না। তবে, যুদ্ধের পরে যুদ্ধে লিপ্ত জাতিগুলির মধ্যে যে সন্ধি হইবে তাহার উপরেই এই সমস্যাটির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। মানবতার ভিত্তিতে যদি বিভিন্ন জাতিতে সন্ধি হয় তবেই ভবিষ্যতে এই মড়কের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার সম্ভাবনা, নতুবা চিরদিনই আমাদেরিগিকে "The vicious circle of war after peace and peace after war" এর তিক্ত অভিজ্ঞতার দ্বারা উদ্ভ্রান্ত হইতে হইবে।

এই সম্পর্কে ভারতের অধ্যাপক-দৃষ্টি সমগ্র জগতকে আলো দেখাইতে পারে ইহাই আমার স্থির বিশ্বাস। সম্প্রতি চট্টগ্রামের স্থানীয় 'East and West' Club-এর হরিদাস চৌধুরী বলিয়াছেন—"No amount of political re-adjustment and social re-construction can save us from the vicious circle of war after peace and peace after war until there is a radical transformation of human nature and divine transformation of his entire being. This can be achieved only by the light and power of integral spiritual realisation".

কথাটি সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু integral spiritual realisation দ্বারা কি বুঝায় তাহা স্পষ্ট করিয়া না বলিলে প্রাচ্য এবং ততোধিক পাশ্চাত্যের নিকট নিছক একটি abstraction রূপেই প্রতীয়মান হইবে। ভারতীয় অধ্যাত্মিকতা কি?—জিজ্ঞাসা করিলে শতকরা নিরনব্বই জনই যড়দর্শন

থেকে আরম্ভ করিয়া নানা মূনির প্রচারিত এতগুলি মতামত উপস্থাপিত করিবেন যাতে জিজ্ঞাসু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উদ্বাস্ত হইয়া উঠিবেন এবং ভাবিবেন যে ignorance is bliss। এই সম্পর্কে নোয়াখালীর ভূতপূর্ব ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাজি সাবে প্রদেয় বিধুভূষণ সরকার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—“Could you not materialise your religion?” সত্যই আধ্যাত্মিকতা কতকগুলি কঠিন শব্দবিশ্বাস নয় বা আচার সমগ্ৰীও নয়। ইহা আত্মার ধর্ম বা প্রেম—শ্রীগৌরান্ধ্র আচরণের দ্বারা ইহাই জগৎকে দেখাইলেন। জীবে ভগবানে ও জীবে জীবে প্রীতির সমৃদ্ধ স্থাপনের মধ্যেই প্রকৃত মনুষ্য-ধর্ম এবং ইহাতেই জগতের স্থিতি—শ্রীগৌরান্ধ্র আদর্শ প্রেমিকরূপে এই শিক্ষাই দিলেন। জগতের আজ যত সমস্যা তার নিরসন অতি সহজেই হয় যদি মানুষ মানুষকে ভালবাসে; এবং এককণ্ঠ্য বলতে গেলে প্রীতির অভাবই আজ জগতে সবচেয়ে বড় সমস্যা। ভগবান জীবকে কিরূপ ভালবাসেন শ্রীগৌরান্ধ্র তাহা সকলকে দেখাইলেন এবং তাঁর ভালবাসা পাইয়া উচ্চ নীচ, ভদ্র অভদ্র, রাজা প্রজা ও পণ্ডিত মুখের মধ্যে কিরূপ প্রীতির ভাব সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহা যাহারা ভারতের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন। আজ সাম্যবাদীর কোপদৃষ্টি রাজসিংহাসনের দিকে, কিন্তু সেইদিন ভারতের একমাত্র স্বাধীন হিন্দুরাজা প্রজাসাধারণকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন। সকলে প্রেম পাইলে একজন আর একজনকে ভাই ভাই রূপে দেখিবে এবং এই হিংসা-দেষ-পূর্ণ জগতে একটি বিশ্বপরিবার সংস্থাপিত হইবে, যাতে একের স্বার্থের সঙ্গে অন্যের স্বার্থের সংঘাতের কথা যখন উঠিবে তখনই পাবম্পরিক শুভেচ্ছার ভিত্তিতে উহার অল্প সমাধান সম্ভব হইবে। সুতরাং যত রকমের social বা political re-adjustment স্থানকাল ভেদে প্রয়োজন তার প্রেরণাও প্রেমধর্মই দিবে। নতুবা প্রাণহীন কোনও রাষ্ট্রিক কাঠামোর ভিত্তিপত্তনের দ্বারা কোনও সমস্যারই স্থায়ী যীমাংসা হইবে না।

দ্বিতীয়টি Finance-monetary problem। ইহার সূচক সমাধানের উপর প্রত্যেক জাতির উন্নতি তথা সমগ্র জগতের শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে। নতুবা যখনই জাতির হাতে

আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আসে তখনই শ্রেণীসম্বর্ধ অবশ্যস্বাবী। ইহার সমাধানের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন—সকলকে ভাবিতে শিখান যে, অর্থ মানুষের জন্ত, মানুষ অর্থের জন্ত নহে। Private ownership of property মানব সভ্যতার প্রথম স্তর থেকেই আমরা স্বীকার করিয়া আসিয়াছি। ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত ইহার বিরুদ্ধে কাহারও কোন বিশেষ আক্রোশ ছিল না। আজও সভ্য জগৎ মোটামুটি ইহাকে স্বীকার করিতেই চায়, এবং আমার বিশ্বাস Fabian societyর শত চেষ্টা সত্ত্বেও ইহাকে অস্বীকার করা চলিবে না, যদি দেশের Banker, Economist ও Business-expert সকলে মিলিয়া বর্তমান চলতি monetary systemকে দেশের চাহিদা মিটাইবার উপযোগীরূপে adjust করিয়া দিতে পারেন।

পূর্বে propertyর বৈকল্পিক tangible রূপ ছিল বর্তমানে তাহা আর নাই; cheques, stocks, counters, shares প্রভৃতি রূপে ইহা ক্রমশঃ সাধারণের ধরা ছোঁয়ার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। সাধারণের এই অজ্ঞতার সুবিধা নিয়া অনেক চালাক লোক আপন আপন bank balance যে কিরূপ ফাঁপাইয়া নিতেছেন তাহা বুঝিবার উপায় নাই। Mr. H. G. Wells এর ক্ষটিক স্বচ্ছ ভাববিশ্বাসে এই রূপটি অতি প্রাজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে, যথা—“cleverest people ‘play’ the markets, gambling in this intricate confusion, snatch fortunes, spend, disorganise and tangle the natural difficulties of our situation into knots we cannot even cut.” তারপর রহিয়াছে শিল্পোৎপাদনে অবাধ প্রতিযোগিতার সুযোগ। ইহার ফল দাঁড়ায় এই যে “Man is choked with food production and starves”. আমেরিকার তুলনায় আমাদের দেশের productive efficiency অতি নগণ্য, কিন্তু সময় ও সুযোগ মিলিলে অতি সম্ভবই আমরা দেখিতে পাইব যে আমাদের জাতীয় সমস্যা scarcity নয়, আমাদের সমস্যা starvation in the midst of plenty। অবশ্য existing monetary system যদি তৎপূর্বে national needএর উপযোগীভাবে

scientific basisএ adjust করিয়া লওয়া যায় তবে বাহ্যিক বর্তমানে শিল্পপ্রধান দেশগুলির প্রধান সমস্যা (improper distribution of wealth) তাহা আমরা এড়াইয়া বাইতে পারি।

New Deal এই সমস্যার কতকটা সমাধান করিয়াছে, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমরা "Rancous voices"এর সম্মান পাই আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে। সেখানেও unemployment problem কিরূপ উগ্ররূপ ধারণ করিয়াছে—তাহা Mr. Wells একটি contemporary article থেকে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন "a third of a million of American children were out of school and receiving no education at all because there was no money to pay their teachers. There were the school house, the children and the teacher. And they were at a stand still....."

In Georgia, 1318 schools, with an enrollment of 1,70,790, were closed. In Alabama, 81 per cent of all children in rural schools are having an enforced vacation and in Arkansas, three hundred schools were open for sixty days or less during the year." সেখানেও "Men and material stand-wasting and idle, but no public funds are available". বাহ্যিক আমেরিকার সমস্যা তাহা সমগ্র পৃথিবীরও সমস্যা। ইহার জন্য দায়ী present system of monetary organisation। বস্তুতঃ private property যদি মনুষ্য সমাজের উপকারে না আসে তবে আমরা ইহাকে মানিয়া নিব কেন—ইহাই আজ সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। H. G. Wells বলেন "There is no reason why human society should protect any one with possessions, unless there is a corresponding social benefit. And since money is a mechanism to serve human community, and not the human community to serve money, it is plain that if it works so as

to stall the economic life it has hitherto sustained, if it is not forthcoming where property has to be liquidated in order that idle hands may work, something has to be done about it. It has to be altered. Money has to work for us. We cannot tolerate should it play about at games of its own". ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে বর্তমান অসুস্থ অভিযোগের ও বেকার সমস্যার মধ্যে যদি একটি সর্ববাদীসম্মত property-money theory দাঁড় করান না যায় তবে অনেক কাজই অর্থাভাবে বন্ধ রাখিতে হইবে এবং আমাদের সভ্যতাব্যবস্থারও কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই বিকল হইয়া দাঁড়াইবে।

New Dealersগণ unemployedদের জন্য 'Work relief' colonies স্থাপন করিয়াছেন। সেখানে যে সব শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করা হয় তাহা open marketএ ছাড়িতে দেওয়া হয় না, নিজেদের মধ্যে barter করিয়া পারস্পরিক চাহিদা মিটান হয়। ইংলণ্ডেও অনুরূপ প্রচেষ্টার অনুকরণ হইতেছে। Unemployment দূর করার জন্য এই socialist ধরণের schemeটির সহিত আমরা রাশিয়ার Ration card systemএর কতকটা তুলনা করিতে পারি। সবলদের বেলায় moneyর use, open competition, সবই রহিল, আর বেকারদের অর্থাৎ অচলদের বেলায় barter—ইহা বেন কোম্পানী বনাম নবাবের দৈর্ঘ্যশাসন। Mr. Wells এই প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলেন—"It is hardly better than boiling the thermometer to warm the house." সবচেয়ে ভাল হয় যদি দেশের surplus energy, অর্থাৎ বেকারদের nation-buildingএর কাজে নিয়োজিত করা যায়। আজ যুদ্ধের সুযোগে সবদেশই তার unemployment problem দূর করিতে সক্ষম হইয়াছে। যুদ্ধ শেষে আবার এই problem সমস্ত রাষ্ট্রকর্ণধারকে কানাকশি করিয়া তুলিবে। তখন যদি প্রচুর অর্থ না জোটে তবে কোন গভর্ণমেন্টই unemployment দূর করিতে পারিবে না। বর্তমান property-money theoryকে স্ব স্ব জাতীয় দাবী অনুসারে নতুন করিয়া ঝালাইয়া না লইতে

পারিলে অর্থসঙ্কট অনিবার্য। ইংরেজ জাতি বর্তমান যুদ্ধের মধ্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। যাহা করিতে রাশিয়ার বুর্জোয়া প্রলিটারিয়েট সম্ভবের ও অনর্থক রক্তপাতের প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা ইংরেজ জাতি তিনদিনের আলোচনায়ই সমাধা করিয়াছে। ভারতবাসী এই দৃষ্টান্ত অমুকরণ করিতে পারিলে ভারতের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সম্পত্তিতে ব্যক্তির স্বত্বস্বামীত্ব বজায় রাখিয়া উহা যদি রাষ্ট্রের প্রয়োজন বোধে জাতীয় সম্প্রসারণ কার্যে নিয়োজিত হয় তবে একদিকে যেমন জাতির surplus energyকে কর্মলিপ্ত রাখা চলে, অপরদিকে উহা জাতীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আরাম, সৌন্দর্য্য, ও উন্নততর জীবিকার সংরক্ষণে সাহায্য করে। সভ্যতার গতি অব্যাহত রাখার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা জাতিকে দিতেই হইবে, নতুবা confiscation of large fortune এর প্রয়োজন, এমন কি শ্রেণী সংঘর্ষের পথে রাশিয়ার বর্তমান dogmatic ও deplomatic socialism এর পন্থনও অসম্ভব নয়। বেকার সমস্যার স্তূর্ধু সমাধানের মধ্য দিয়া New Dealersগণ socialismকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছেন, ইহা না পারিলে আমেরিকার soil-এও উহা ভূঁইকোড়-এর স্তায় একদিকে দেখা দিতে বাধ্য।

প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ভারত তার স্বকীয় শিল্প প্রতিষ্ঠায় উত্তেজিত হইয়াছে। বীরা এই সুযোগে বড় হইয়াছেন, বিশেষতঃ বর্তমান যুদ্ধের সুযোগে রাতারাতি bank balance বাড়াইতেছেন তাঁদের সহিত দেশের লব্ধ প্রতিষ্ঠ বেকার, ইকনমিষ্ট ও দেশনেতৃগণ একত্রে মিলিয়া যদি একটা soundly working property-money theory ও scheme of practice তৈরি করেন তবেই ভারত তার ভবিষ্যৎ প্রগতির পথ বাধা-মুক্ত রাখিতে পারে। বড়ই দুঃখের বিষয় ভারতে জাতীয় স্বাতন্ত্র্যকামী কোনও দলেরই জাতীয় অর্থসমস্যা সম্পর্কে বিশেষ কোনও programme নাই। কংগ্রেসে সেইদিন মাত্র স্তূতানচন্দ্র প্রেসিডেন্ট থাকা কালীন National planning committee স্থাপিত হইয়াছে। কোনও programme ছাড়াই এখানে ইলেকসান দ্বিত্ব সম্ভব, কারণ এখানে শতকরা ৯০ জন নিরক্ষর। ভারত স্বাধীনতা পাইলে প্রথম সমস্যাই হইবে বেকার

সমস্যা। হিন্দু রাষ্ট্র ক্ষমতা পাইল, কি মুসলমান উহা দখল করিল, পরাধীনতার সময় ইহা বড় সমস্যা হইতে পারে, কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা জুটিলে শিক্ষা ও জাতীয় সম্প্রসারণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া কিরূপে বেকার সমস্যার সমাধান করা হইবে তাহাই হইবে সবচেয়ে বড় সমস্যা। ইহার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন সর্ববিষয়ে নির্ভুল statistics, সুচিন্তিত কর্মপন্থা ও প্রয়োজন অমুযায়ী বর্তমান Property-money theory ও practiceএর আমূল পরিবর্তন, যাতে রাষ্ট্রক্ষমতা যিনিই ব্যবহার করুন, তাঁর ঘেন বলিতে না হয়—“আমাদের programme ত আছেই, but money is not forthcoming.”

ভারতের ধনী পূর্বে জনসাধারণের জন্য বহুৎ বহুৎ পুষ্করিনী খনন করিয়াছেন, হাসপাতাল নির্মাণ করিয়াছেন, ধর্মশালা গড়িয়া দিয়াছেন, নদীর ঘাট বাধাইয়া দিয়াছেন, এমন কি পশুর জন্য পিঞ্জরাপোল নির্মাণ করিয়াছেন। বর্তমান যুগে এরূপ স্বতন্ত্র হিতকারী প্রচেষ্টার প্রয়োজন নাই। কারণ রাষ্ট্রই অমুকরণ Nation-building কার্যের জন্য বহু বেকারের অল্প বস্ত্র সংস্থানের বন্দোবস্ত করেন। বেকার আজ আর অনস্বস্ত প্রয়োজন নয়, বেকারদের জাতীয় স্বথ, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, শিক্ষা ও সভ্যতাব্যবস্থা নিভর করে। তারা কাজে নিয়োজিত থাকিলে একে যেমন ‘rancous voices’ কর্পটাতে ভেদ করিবে না, অন্যদিকে জাতীয় শ্রীবুদ্ধিও চিরদিন অব্যাহত থাকিবে। এই Nation-building কার্যের জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তাহা বর্তমান Property-money theory ও scheme of practice এর পরিবর্তন সাধনের দ্বারাই সম্ভব।

আমাদের বিশ্বাস ভারতের প্রেমধর্ম্য ভাবতকে রক্ষা করিবে, এবং এখানে ‘Haves’ ও ‘have nots’ এর সম্ভবের প্রয়োজন কোন দিনই হইবে না। জাতির অগ্রগতির পথে যত সমস্যাই দেখা দিবে পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হইলে অতি সহজেই উহার সমাধান করা যাইবে। এক কথায় বলিতে গেলে প্রীতির অভাবই সবচেয়ে বড় সমস্যা, পৃথক পৃথক সমস্যাগুলি ইহারই বহির্বিকাশ মাত্র। যুগধর্ম্য সংস্থাপক শ্রীগোরাঙ্গসুন্দর অলক্ষ্যে থাকিয়া তাঁর লীলাভূমি তথা বিশ্বকে প্রেমমন্ত্রে উদ্বোধিত করুন আর বিশ্ব স্বথ সমৃদ্ধি পূর্ণ হউক—ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা।

মহাত্মা শিশিরকুমারের প্রসঙ্গ।

শ্রীহরিদাস দাস

শ্রীশ্রীপাদ হরিমোহন শিরোমণি গোয়ালী ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণায় শ্রীপাট আড়িয়াল গ্রামের একজন একনিষ্ঠ শ্রীগৌরভক্ত। মহাত্মা শিশিরকুমারের দর্শনে যাইয়া তিনি বাহা বাহা স্বচক্ষে দেখিয়া ছিলেন এবং অমুভব করিয়াছিলেন, তাহাই নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি। লেখকের জ্ঞাতি বিচ্যুতি মাঙ্কনীয়।

শ্রীধাম বুদ্ধাবন হইতে প্রত্যাবর্তন কালে শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ মনে মনে ভাবিলেন যে এবার কলিকাতায় গিয়া শ্রীগোবিন্দের ‘চিহ্নিত দাস’ শিশিরবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিব। সে আজ অনেক দিনের কথা। শিশিরবাবু তখন কলিকাতায় পুরাতন বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। প্রভুপাদের সঙ্গে ১০।১২ জন লোক—কেহ কেহ বা প্রভুপাদেরই শিষ্য।

সকলেই ছই মহাপুরুষের মিলন-রঙ্গ ও মধুর প্রসঙ্গ দর্শন ও শ্রবণের জন্য লোলুপ হইয়া আছেন। শ্রীপ্রভুপাদ শিশিরবাবুর বাড়ীতে গিয়া ‘জয় গৌর’ বলিয়া ধ্বনি করিলেন,—শিশির-বাবু ধ্বনি অমুসারে আনন্দে উদ্ভাসপ্রায় হইয়া লক্ষ্মে ঝঞ্জে নীচে আসিলেন। শিশিরবাবুর আকার দেখিয়া কেহই বুঝিলেন না যে ইনিই তাঁহাদের প্রার্থিত বস্তু—ছোট একথানা কাপড় হাঁটুর উপরে রহিয়াছে, অতি দীন হীনের ন্যায় কান্দাল-বেশে আসিয়া মৃদুমধুর সঙ্গায়ণে সকলকেই আপ্যায়িত করিলেন। শ্রীপ্রভুপাদ তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন যে ইনিই হয়তঃ শিশিরবাবু হইবেন। কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে সাতিশয় মুগ্ধ হইয়া লজ্জায় আর নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না, অথচ উৎসুক্যে অনেকক্ষণ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন—‘এভাবে আত্মগোপন আব কতক্ষণ চলিবে? আমরা বহুদিন হইতে আপনার নাম শুনিয়াছি, বহুদূর হইতে ব্যাকুল প্রাণে দর্শন লাগসায় আসিয়াছি, আমাদেরকে গৌরকথা শুনাইয়া পরিভূষিত করিতেই হইবে।’

শ্রীপ্রভুপাদকে একখানি খাটের উপরে এক পাশ্বে বসাইয়া শিশিরবাবু এক পাশ্বে সজ্জিত হইয়া বসিলেন, অন্তান্ত সকলেই যথাযোগ্য আসনে বসিয়া উৎকর্ষ হইয়া রহিয়াছেন—

একণে কি কথা হয় প্রাণভরে শুনিবেন। শিশিরবাবু ঐ ‘গৌর-কথা’ শব্দটি শুনিয়াই যেন ভাবাবিষ্ট হইয়া গেলেন—বহুদিনের নিজ জীবন-কাহিনী সব স্মৃতিপটে যুগপৎ উদ্ভিত হইয়া বাহিরে প্রকাশ হওয়ার জন্য যেন উদ্ভূষ হইয়া রহিল। তিনি অমৃত-মধুর রচনে বলিতে লাগিলেন,—‘শিরোমণি প্রভু! আমার মুখে আপনি কি গৌরকথা শুনিবেন? আমি পূর্বজীবনে বোর নাস্তিক ছিলাম,—কৃষ্ণ বিষ্ণু কিছুই গ্রাহ্য করিলাম না। জ্ঞানের চর্চা করিতেই বেশ ভাল লাগিত এবং দিবানিশি ঐ ভাবেই আত্মহার্য হইয়া থাকিতাম। আমার মেজদাদা (হেমন্তবাবু) একদিন হাঁসখালির বাড়ীতে আমার অবস্থা পর্যালোচনা করিতে গিয়াছিলেন। দাদা বরাবরই বৈষ্ণব এবং ভক্তিমার্গের মহাসাধক ছিলেন, আমি তাঁহাকে এইজন্য কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা স্মরণ হইলেও লজ্জায় মরিয়া যাই। দাদা নিরামিবাশী, অনিয়াও আমি তাঁহার পাতে আমার জীবন দ্বারা চিৎড়িতরকারী পরিবেশন করাইলাম। দাদা হাত তুলিয়া বসিয়া আছেন, করুণ আঁখিতে আমার দিকে তাকাইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মধুর স্বরে বলিলেন,—‘শিশির! আমি তোমার অবস্থা দেখিয়া বড়ই ব্যথিত ও হতাশ হইলাম। শ্রীপ্রভু তোমার মতি পরিবর্তন করিয়া দিন।’ আমি মেজদাদার হাতে ধরিয়া কতই অনুরোধ করিলাম—দাদা কিন্তু নির্বাক নিষ্পন্দ হইয়া আমার দিকে তাকাইয়া কি ভাবিতেছেন। বহুক্ষণ পরে বলিলেন,—‘শিশির! শ্রীগোবিন্দদেবের কৃপা হইলে সব বুঝিতে পারিবে।’

এই ঘটনার কিছুদিন পরে দাদার ঐ কথার এবং তাঁহার একথানা পত্রে আমার প্রাণে নব জাগরণ আসিল। দাদা লিখিয়াছিলেন,—‘শিশির, তুমি গৌরাজের চিহ্নিত দাস, তোমার হাতে প্রভু অনেক কাজ করিবেন।’ চিঠি পড়িয়া এবং দাদার ভাবাবেশের কথা মনে হইয়া আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া মুগ্ধিত হইলাম। দাদাকে লিখিলাম,—‘কিসে ভক্তি হয় বল দেখি।’ দাদা উত্তর দিলেন,—‘‘ছই পয়সা ধরচ করিলেই ভক্তি হয়। বটতলার ছাপান শ্রীনরোত্তম ঠাকুরমহাশয়ের প্রার্থনা পুস্তক

একখানা দুই পয়সায় কিনিয়া পাঠ করিয়া দেখিবে, তাহাতেই ভক্তি হয়।' কথাটা শুনিয়া প্রথমেই ত ভক্তি চটিয়া গেল। দুই পয়সায় আবার ভক্তি হয়? যাক্, প্রাণ কিন্তু বটলার পুঁথির অন্বেষণে ছুটিল, বাধ্য হইয়া চরণও ঐদিকে চলিল। অনেক অমুসন্ধানের পরে একখানা পুঁথি পাইলাম—দুই পয়সায় কিনিয়া ঘরে আনিয়া খুলিতেই দেখি প্রথম পংক্তিতে লেখা আছে—‘গোরাজ্জ বলিতে হবে পুলক শরীর।’

এই পংক্তিটি বারংবার পড়িয়াও যখন অঙ্গে পুলক হইলনা, তখন এই সব বাজে কথা মনে করিয়া পুঁথিখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। দাদাকে চিঠি লিখিলাম,—‘কই, গোরাজ্জ বলিতে ত আমাব অঙ্গে পুলক হয় না, তবে তোমার কথা সত্য বলিয়া বুঝিব কিরূপে?’ দাদা উত্তর দিলেন,—‘তোমাব না হইলেও কি অস্ত্রেরও হয় না? ভক্তির যাজনে ষাঁহাদের চিত্ত নির্মল হইয়াছে—তাঁহাদের ‘গোর’ নাম শ্রবণ-গ্রহণ মাত্রেই পুলকাদি হয়।’ এই কথা কয়টি পড়িয়া শরীরে যেন একটা তড়িৎশক্তির খেলা হইয়া গেল। হরিনাম লইলে কাহার অঙ্গে পুলক হয়, অশ্রুপাত হয়? ইহা দেখিবার জন্য চিত্ত বড়ই ব্যাকুল হইল; দিবানিশি কেবল ঐ চিন্তা, কোথায় কাহার অঙ্গে সাত্বিক বিকার দেখিব? পাঞ্জাব, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র আধ্যাবর্ত্ত-অমুসন্ধান করিলাম—যেখানে যেখানে সাধু মহাত্মার নাম শুনিয়াছি, সেখানে সেখানেই খবর দিয়া, সম্ভব হইলে তাঁহাকে আনাইয়াছি অথবা নিজেই গিয়া তাঁহার চরণ দর্শন করিয়াছি। কিন্তু নাম-শ্রবণে কাহারও অঙ্গে সাত্বিক বিকার না দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িলাম। বহু অর্থব্যয়, বহু পরিশ্রম এবং বহু অমুসন্ধানও যখন ঈদৃশ-দর্শন হইল না, তখন বিষন্ন চিত্তে ভাবিলাম যে এ জীবনে বোধ হয় তাদৃশ মহাত্মা দেখিতে পাইব না। বহুদিন পরে হঠাৎ একদিন খবর পাইলাম যে জগলি জেলায় একজন জোলা খুব বৃদ্ধ হইয়াছেন—তিনি

হরিনাম শুনিলেই বিকারগ্রস্থ হন। খবর পাইয়াই সে স্থানের সবিশেষ পরিচয় লইয়া তাঁহার দর্শনে যাত্রা করিলাম। গিয়া দেখি—একটি সংকীর্ণ গোকার সেই মহাত্মা দ্বার কণ্টকাকূত ও রুদ্ধ করিয়া ভিতরে ভজন করিতেছেন। বাহির হইতে ‘জর গোর!’ প্রাণগোর!’ এই নাম করিলাম। নামের ধ্বনি কর্ণরঞ্জে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্রই দেখি সেই মহাত্মা ঘরের বাহিরে ছুটিয়া আসিতেছেন,—অঙ্গে শিমূল কাঁটার মত পুলক, চক্ষে প্রেমাক্ষ-পাত, সর্বাঙ্গ ফুলিয়াছে এবং রক্তবর্ণও হইয়াছে। তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইলেও বলিতেছেন,—‘কেরে বাপ আমার প্রাণ-বল্লভের নাম শুনাইলি! কেরে বন্ধু আমার প্রাণনাথের ভুবন-মোহন নাম করিলি!!’ এই বলিয়াই তিনি প্রেমবাহু প্রসারণ করিয়া আমাকে তাঁহার বিশাল-বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। আমার সর্বাঙ্গ কি এক অপার্থিব রসে অভিষিক্ত হইল তাহা জানি নাই! তাঁহার স্পর্শ কি অমৃত হইতে পরামৃত, তাহা বুঝি নাই!! তাঁহার মধুর কণ্ঠের মধুর কথাগুলি কত মধুর তাহা বলিবার ভাষা নাই। বলিব কি শিরোমণি প্রভু! অলঙ্কিতভাবে আমারও চক্ষে তখন জল পড়িতে লাগিল! সেই অবধি আমার জীবনের আমূল পরিবর্তন হইয়া গেল!! পূর্বে গোরনাম শুনিয়া কাহারও চক্ষে জল দেখি নাই বলিয়া আক্ষেপ করিতাম, কিন্তু এক্ষণে দেখি সেই গোরনামে সকলেরই চক্ষে জল আসে, রোমাঞ্চও হয়। এই দেখুন না কেন—আপনাদের সকলেরই ত চক্ষে অশ্রু ঝরিতেছে। প্রভু আমি মনের মাহুষ মনে আঁকিয়াছিলাম—যেহঁমত আঁকিয়াছি, ঠিক সেইমতই পাইয়াছি। কিন্তু ষাঁর রূপাশক্তিতে এই বস্তু হস্তগত হইয়াছে—সেই মেজদাদা আজ নাই!!’ এই পর্যন্ত বলিয়াই শিশিরবাবু নীরব হইলেন। শ্রীল শিরোমণি প্রভুও বাঙ্কিত বস্তুর দর্শনানন্দে অশ্রুপাত করিতে করিতে বিদায় লইলেন।

শ্রীগোরাঙ্গ তত্ত্ব।

গৌরধামপ্রাপ্ত হেমন্তকুমার বোষ

শ্রীকৃষ্ণ অবতারে পূর্ণ-প্রেমের ও শ্রীগোরাঙ্গ অবতারে পূর্ণ-করুণার বিকাশ হয়। ফুল ভিন্ন ভগবান পূর্ণ হইতে পারেন না। ভগবান নিত্য-পূর্ণ এই জন্ত নিত্য-যুগল। কিন্তু যখন লীলার জন্ত অবতার হন, তখন যে রূপ লইয়া লীলা করেন, উহা বিকাশ করিবার জন্ত পুরুষ ও প্রকৃতি রূপে পৃথক হইয়া জগতে উদয় হন।

প্রেমাবতারে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বিকাশের জন্ত যেই মাত্র বংশীধ্বনি করিলেন, সেই প্রেমের প্রতিমা শ্রীমতী রাধা উদয় হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে যুগল করিলেন।

করুণাবতারে নবদ্বীপে শ্রীগোরাঙ্গ করুণা-লীলার জন্ত যেই করুণাশ্রু ফেলিলেন, সেই করুণার প্রতিমা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া আসিয়া তাঁহাকে যুগল করিলেন।

দেবী লক্ষ্মীকে লইয়া শ্রীনিমাই পণ্ডিত গার্হস্থ-লীলা করেন। তিনি করুণাবতার শ্রীগোরাঙ্গের যুগল নহেন। তিনি শ্রীনিমাই পণ্ডিতের সহধর্মিণী। ভগবৎপ্রেম বিকাশের জন্ত ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিলেন। জগদ্বাসী জীব কি উপায়ে ব্রজের এই প্রেমের অধিকারী হইতে পারে, তাহাই শিক্ষা দিবার জন্ত শ্রীগোরাঙ্গের অবতার হইল। শ্রীগোরাঙ্গ এই জন্ত করুণার সার হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন, এবং এইরূপে করুণা বিকাশ করিয়া জীবকে এই দুঃস্বভাবের অধিকারী করিলেন।

সাধ্য-সাধকের মিলন ভিন্ন সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। আবার ভগবান করুণা না করিলে তাঁহার সঙ্গে জীবের মিলন সম্ভব নহে। ভগবৎ-সাধকদিগের এইজন্ত ভগবানের করুণা ভিন্ন ভগবদ্দর্শন হয় না।

স্বচ্ছন্দ ভগবান ইচ্ছা করিলে জীবকে দর্শন দিতে পারেন। কিন্তু ভক্তি-জগতের নিয়ম এই যে, যে সময় জীব অকিঞ্চন ভাবে ভগবানের শরণ লয়, সেই সময় যদি ভগবান করুণা করিয়া বরমুখ হন, তাহা হইলেই জীব ও ভগবানে মিলন হইয়া থাকে।

জীবের প্রতি ভগবানের এই করুণা-দৃষ্টি ও তাঁহার সহিত

মিলন হইলেই যে জীবের সকল ইষ্ট সিদ্ধ হয়, তাহা নহে। এই করুণা-দৃষ্টি দ্বারা জীব নির্মল হইয়া ভগবৎসাধন-বল প্রাপ্ত হয় এবং এই সাধন-বল যে পরিমাণে জীব যোগবলে উৎকর্ষ করিতে থাকে, ভগবান সেই পরিমাণে জীবের হৃদয়ে বিকাশিত হন।

জীব সঙ্কল্প উপায়ে যাহাতে ভগবান হইতে সাধন-বল পাইতে ও ইহার উৎকর্ষ করিতে পারে—শ্রীগোরাঙ্গ জীবকে সেই পথ দেখাইয়া দেন।

শ্রীমতী রাধা যমুনার জলে গাত্র-মার্জনা করিতে লাগিলেন। যতই মার্জনা করেন, ততই তাঁহার অঙ্গে সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার অঙ্গ-লাবণ্যে ভুবন উজ্জর করিল এবং যেই তাঁহার এইরূপ অলৌকিক রূপের বিকাশ হইল, আর শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলেন।

শ্রীগোরাঙ্গ জীবের এই যমুনার জল, এই অঙ্গ-মার্জনী এবং সেই শ্রীকৃষ্ণ।

প্রভু যিশুও এইরূপ করুণার অবতার। কিন্তু তাঁহার করুণায় জীব কেবল ভগবৎ দর্শন এবং এই দর্শন দ্বারা যে সাধন-বলের উদয় হইয়া থাকে, মাত্র তাহাই প্রাপ্ত হয়। যিশু জীবকে সাধন-যোগের শিক্ষা দেন না। সুতরাং তাঁহার আশ্রিত জীবের হৃদয়ে ভগবান পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে পারেন না ও তাহারা পূর্ণভাবে ভগবানের ভক্তনাও করিতে পারে না।

আবার প্রভু যিশু বলেন যে, জীব তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ না করিলে তাহার অনন্ত নরকভোগ হইবে।

কিন্তু শ্রীগোরাঙ্গ কি করেন? তিনি আপনি বরমুখ হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হন, এবং যে রূপ অকিঞ্চন-ভাবে ডাকিলে ভগবান হইতে জীব করুণা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আপনি সাধক হইয়া জীবকে সেই অকিঞ্চন-ভাবে শিক্ষা প্রদান করেন। এইরূপে জীব ও ভগবানে মিলন করিয়া, জীবকে নির্মল ও সাধন-বলের অধিকারী করেন, এবং সাধক হইয়া জীবকে

সাধন-যোগের শিক্ষা প্রদান এবং প্রেমময় হইয়া জীবের হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের বিকাশ করেন।

কাহাকেও অনন্ত নরকে পাঠাইবার ক্ষমতা তিনি উদয় হন নাই। জীব মাত্রকেই উদ্ধার করিবার ক্ষমতা তিনি উদয় হন।

জীবের ঐহিক ও পারত্রিক অনেক বাসনা আছে। এই সকল বাসনা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা জীব ভগবৎ-করুণার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। কিন্তু জীবের এই ঐহিক সুখ-দুঃখের নাশ আছে। এইজন্য জীবের সুখ-বৃদ্ধি কি দুঃখ-নাশের জন্য শ্রীগোরাঙ্গ উদয় হন না।

হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, দেবতাদিগেরও পতন আছে এবং যে দেবত্বের পতন আছে সে দেবত্ব জীবকে প্রদান করা শ্রীগোরাঙ্গ-অবতারের উদ্দেশ্য নহে।

জ্ঞানযোগ-বলে জীব ভগবানের তুল্য ক্ষমতা লাভ করিতে পারে। কিন্তু জগতে দুইজন ভগবান থাকিতে পারেন না। এইজন্য জ্ঞানযোগ বলে কোন জীব যেই ভগবানের তুল্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, তৎক্ষণাৎ সে ভগবানে মিশিয়া যায়। ইহাকে নির্কোণ বা লয়-প্রাপ্ত বলে। যে সাধনযোগ-বলে জীব এইরূপ লয়-প্রাপ্ত হয় সেই সাধন-যোগও তিনি জীবকে শিক্ষা প্রদান করেন না।

আবার, যে সকল সুখের কি আনন্দের লয় হয়, জীবকে সে সমুদয় সুখ কি আনন্দ প্রদানের জন্যও শ্রীগোরাঙ্গ উদয় করেন না। তবে যে সুখ কি আনন্দ নিত্য ও নিরূপম, জীবকে সেই সুখ কি আনন্দ প্রদানের জন্যই শ্রীগোরাঙ্গ অবতীর্ণ হন।

এই সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু ভগবানের যে সমুদয় শক্তি আছে সে সমুদয় যে স্পৃহাময় তাহার কোন সন্দেহ নাই। ইহা না হইলে এই সুন্দর ও সুচিত্র জগতের সৃষ্টি হইত না, ইহা এইরূপ ভাব রস ও জ্ঞানময় হইত না, কিম্বা সাধকের ও সাধকের সঙ্গে জগৎ-তপ যাগ-যজ্ঞেরও সৃষ্টি হইত না।

আবার ভগবৎ-শক্তিতে যত স্পৃহা আছে, উহার সমুদয় জীবের না থাকিতে পারে, কিন্তু জীবের যে সমুদয় স্পৃহা আছে, ইহা যে ভগবানে আছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। কারণ ভগবান স্রষ্টা এবং জীব তাঁহারই সৃষ্টি।

সংসার পাতাইয়া বাস করার স্পৃহা জীবের অনিবার্য। এই অনিবার্য ইচ্ছাটি জীব ভগবান ভিন্ন আর কাহা হইতে পায় নাই। অপিচ কেবল হিন্দুধর্মাবলম্বীগণ নহেন, বাহাদের

ভগবানে বিশ্বাস আছে তাহারা সকলেই কোন না কোন আকারে স্বীকার করেন যে, ভগবানের একটি সংসার আছে। ব্রহ্মধাম আর কিছুই নহে, এখানে শ্রীকৃষ্ণ সপরিবারে বাস করিয়া থাকেন।

ভগবানের যে একটি সংসার আছে, তাহা প্রায় জীবমাত্র বিশ্বাস করিয়া থাকে। ভগবানের এই সংসারের গঠন-কিরূপ তাহা লইয়া মতভেদ থাকিলেও একথা সকলেরই স্বীকার করিতে হয় যে, এই সংসারে বাহারা অবস্থিতি করেন তাঁহাদের সঙ্গে ভগবানের কোন না কোন সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্কের অহুরোধে এই সংসারীদিগের সঙ্গে ভগবানের কোন না কোন বিষয়ে ইতর বিশেষ রাখার প্রয়োজন করে, এবং এই ইতর বিশেষের জন্য এ সংসারীগণ কোন মতে ভগবানের তুল্য হইতে পারেন না। সুতরাং জ্ঞানযোগ-বলে জীব যেরূপ ভগবানের তুল্য হইয়া নির্কোণ প্রাপ্ত হন, ইহাদের সেইরূপ নির্কোণ প্রাপ্ত হইবার সম্ভব হয় না।

ভগবান নিত্য। সুতরাং তাঁহার সংসারও নিত্য। কাজেই বাহারা তাঁহার সংসারে বাস করেন তাহারও নিত্য।

যে সাধন-বলে জীব এই নিত্য সংসারে প্রবেশ করিয়া নিত্য হইয়া ভগবানের সঙ্গ লাভ করিতে পারে, শ্রীগোরাঙ্গ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য জীবকে সেই সাধন-বল ও সেই সাধনযোগের শিক্ষা দান করা।

নিজ-জন না হইলে কেহ কাহার সংসারে প্রবেশ করিতে পারে না ও হৃদয়ের বন্ধন ভিন্ন কেহ কাহারও নিজ-জন হইতে পারে না। প্রেম-যোগের দ্বারা একজন আর একজনের হৃদয় আবদ্ধ করিতে পারে এবং যে প্রেম-যোগে হৃদয় আবদ্ধ করিতে পারে এবং যে প্রেম-যোগে হৃদয় আবদ্ধ করিয়া থাকে, শ্রীগোরাঙ্গ জীবকে সেই ভগবৎ-প্রেম-যোগ শিক্ষা দেন।

শ্রীগোরাঙ্গ যদিও জীবকে প্রেমযোগ শিক্ষা প্রদানের জন্য অবতীর্ণ হন, কিন্তু বাহার এ যোগে অধিকার না হয় তাহাকে তিনি পরিত্যাগ করেন না। যে জীব ভগবানকে যেরূপ উপাসনা করিতে চাহে, তিনি তাহাকে সেই ভক্তিবল প্রদান করেন। সুতরাং প্রভু যিশু যদিও করুণাময় কিন্তু তিনি জগতে পূর্ণ করুণা প্রকাশ করেন না। পূর্ণ করুণা প্রকাশ করেন আমার শ্রীগোরাঙ্গ। যিশু যুগল হইয়া পৃথিবীতে উদয় করেন না, তার জন্যে তাঁহা হইতে পূর্ণ করুণা বিকাশ হয় না।

Dialogue between Sree Gouranga and Vishnupriya

on the very night of the first Holy Union.*

Bidhu Bhusan Sarker

“My wish thou ask me, Lord ; my Love !—
my Life and Soul !
United as we are to play the novel role.
If truly do I say, Oh Lord ! What I desire,
I fear thy tender heart then it may tease and tire.
Disclose I must the thought I cherish'd
how so long,
With that to-night a newer thought I see
now throng.
When first I saw Thee, I was taken by
Thy Grace—
Was lost in Thee—I search'd myself, but
found no trace.
My eyes were feasted on Thy beaming
beauty, true.
But no satiety got, while all the more it grew.
I feel a little shy to speak of my desire—
The world Thy beauty could enjoy—I did aspire.

Again a holy thrill I feel now at Thy touch.
And all the world I wish a heaven's thrill
as such,
Thy Love Divine may drench all in the
nectar sweet ;
But know not what the fate then I shall
have to meet.”
The Lord now sayeth—calm, appealing
was the tone—
“My Love ! my sweetest mate ! Thou never
shalt be lone !
The noble lofty aim of Thine shall ne'er be vain !
Thro' Thee the fallen shall the highest end
attain !
Thou lovest all, and They with love shall Thee
adore,
This love Divine shall higher, higher ever soar.

*বাসর ঘরে শ্রীগোরাঙ্গ শ্রীমতীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—“আজ এই মধুমিলনে তোমার প্রাণের বাসনা শুনিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে।”

শ্রীমতী বিস্ময়প্রিয় কহিলেন—“প্রিয়তম, আমার বাসনা কহিলে তোমার কোমল প্রাণে ব্যথা পায় নাকি ভয় হয়। তোমার বাক্য রক্ষাও করিতে হইবে। আগে একটি বাসনা ছিল, আজ আর একটি নূতন বাসনা জাগিয়াছে। তোমাকে প্রথম দেখিয়াছি অবশি তেহাতে আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া অতৃপ্তনয়নে তোমার রূপমাধুরী আশ্বাদন করিতেছি, সেই সঙ্গে সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে, জগতও তোমার রূপমাধুর্য আশ্বাদন করুক। আজ আবার তোমার শ্রীঅঙ্গ-স্পর্শে এতই স্বর্গীয় সুখ বোধ হইতেছে যে, সাধ হয় সমগ্র জগত এই স্বর্গসুখ উপভোগ করুক এবং তোমার অপার্থিব প্রেমামৃতে সকলে সিক্ত হউক। কিন্তু, জানি না, নাথ ! তাহাতে আমার কপালে কি হয় !”

শ্রীগোরাঙ্গ কহিলেন,—“প্রিয়তমে ! তুমি আমার চিরসঙ্গিনী। তোমার এই লোকাতীত বাসনা ব্যথা হইবে না। তোমার রূপায় পতিত জীব জীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হইবে। তুমি সকলকে ভালবাস, সকলেই তোমাকে প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করিবে, এবং এই অপ্রাকৃত প্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।”

একখানি চিঠি

জয় গৌর

ঐশ্ব্যাম বৃন্দাবন,
১৯১১২১

ঐশ্ব্যামগোরাঙ্গ পদ্যাবলি পরিচর্যা-পরায়ণ পরম
ভাগবত ঐশ্ব্যুক্ত বাবু বিশ্বভূষণ সরকার
ভাগবত প্রচারেণু—

আশীর্বাদ প্রেমালিঙ্গনং চ—আপনার প্রেরিত “নদীয়ার মর্মবাণী” নামক ৪ খণ্ড পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্ডিত হইলাম। “নদীয়ার মর্মবাণী” বাস্তবিক মর্মবাণী। উহা পাণ্ডুলোকের অশ্রুসার কর্তার মর্মকেও স্পর্শমাত্রে বিগলিত করিয়া দেয়। ঐশ্ব্যম্ মহাপ্রভু পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। তাঁহার সঙ্গে জীবের যাবৎ সম্বন্ধ নিত্য; শাস্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য সকলের যখন তিনি বিষয়ালম্বন, তখন মধুর রসের হইবে না কেন? মধুর রস যে সর্বরসের চরম সীমা এবং তাহাতে সমস্ত রসের ভাব, তাহা ভক্তিরসের সমুজ্জ্বল সিদ্ধান্ত। সুতরাং ঐশ্ব্যাম মধুরসে আমার গৌরাঙ্গসুন্দরকে আরাধনা করেন, তাঁহার পরম ভাগ্যবান। প্রভুর সন্ধ্যাস গ্রহণের

পরেও ঐশ্ব্যম্ রায় রামানন্দ তাঁহাকে রসরাজ মহাভাবরূপে দর্শন করিয়াছিলেন, এইরূপ দর্শন মধুর রস ভিন্ন হইতে পারে না। সুতরাং, ঐশ্ব্যাম ঐশ্ব্যম্ অস্তরঙ্গ, তাহার সন্ধ্যাস স্তুতিতেও মধুর ভাব দর্শন করিয়া থাকে।

ঐশ্ব্যাম ঐশ্ব্যম্ লীলাতে ঐশ্ব্যম্ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর দাস্ত বা সখ্য অবলম্বন করিয়া এই যুগলকে মধুরভাবে ভজন করেন, তাঁহার পরম ভাগ্যবান। বেক্রপ ঐশ্ব্যামচন্দ্রের বনবাসকে এবং ঐশ্ব্যম্ মধুরা গমনকে কোমল প্রাণে সহ্য করিতে পারে না, তাঁহার অযোধ্যার আবরণে এবং ব্রজের আবরণেই উপাসনা করিয়া থাকেন। ঐশ্ব্যম্ লীলাতে নিমগ্ন থাকিয়া ঐশ্ব্যাম ঐশ্ব্যম্ ঐশ্ব্যম্ ও ঐশ্ব্যম্ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বিচ্ছেদাবস্থা কোমলপ্রাণে সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহার এই ঐশ্ব্যম্ লীলা-বরণে ঐশ্ব্যামচন্দ্রসুন্দরকে উপাসনা করিয়া থাকেন। ঐশ্ব্যম্ সর্বরসময় স্তুতি, তিনি মধুর রসের বিষয়ালম্বন স্বরূপ হইবেন না কেন? ইতি

আশীর্বাদক

ঐশ্ব্যম্ হৃদন গোস্বামী (সার্কভৌম)

আশা

ঐশ্ব্যম্ সর্বস্বতী এম-এ, বি-এল, বি-টি, এল-সি-পি (লণ্ডন)

তীব্র তপস্তার মাঝে কুছ সাধনায়
চাহিনা তোমারে—
যাবে নিত্য মধুময় সহস্র পঙ্খায়
তব অভিসারে।
তোমারে বাঁধিব আমি জন্ময়েতে মম
দেখারে কৌশল,—
এ কথা ভাবিতে মোর, ওগো প্রিয়তম
চোখে আসে জল!
প্রিয়তম-দরশনে জুড়াইব আঁধি
মনে রাখি আশা,
নিম্নে যাব উপহার সে ঐশ্ব্যম্ লাগি
শুধু ভালোবাসা।
পথ চেয়ে আছি তুমি আমার লাগিয়া
যুগ যুগ ধরি
অনন্ত তিমির রাতে একাকী জাগিয়া
নিত্য মোরে স্মরি।
পাঠায়েছ প্রেমলিপি প্রতিদিন প্রাতে—
প্রভাত-তপনে,

পাঠায়েছ দূতরূপে অঙ্ককার-রাতে
সহস্র স্বপনে,
তারায় তারায় তুমি করেছ ইসারা
আকাশের তীরে
নয়নের মায়্যা মাঝি দিই নাই সাড়া
তুমি গেছ কিরে।
কুলহারা তোমার ও প্রেমপারাবারে,
বিন্দু ছই চারি
আমার যা আছে প্রিয়, তা দিয়ে তোমারে
ভূলাতে কি পারি?
তুমি ভালোবাসিয়াছ করুণা করিয়া
সে ভরসা করি
তুমি মোর লাগি আছি বাহু বাড়াইয়া
হে গৌরহরি,
শুধু সেই ভরসায় নিরাশা-আধারে
দেখি পথেরখা
আগে মোর বাপ্পে-ধেরা অশ্রু-সিদ্ধিপারে—
সুখ ইন্দু লেখা।

বাঁশীর সন্ধান

শ্রীকিরণ কুমার সেন শর্মা

(এই প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত বিষ্ণুভূষণ সরকার মহাশয়ের গৌর-প্রাপ্তা সহধর্মিনীর শ্রীচরণোদ্দেশে লিখিত। ১৩৩৫ সালের ফাল্গুনী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে তিনি ইহ জগৎ ত্যাগ করেন। যাইবার প্রাক্কালে তিনি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করেন—সেই কালো ছেলেটা কই? সে যে বাঁশী ফেলে গেল।’ কখনো বা বালিশের পার্শ্বে বা নীচে হাত দিয়া ‘সেই কাল ছেলের ফেলে যাওয়া বাঁশীর সন্ধান করিতেন। কখনো বা তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত তাঁর সন্তানগণকে বলিতেন ‘ঐ বাঁশী বাজে। কান পেতে শোন। শুনতে পাওনা? ভাল করে কান পেতে শোনো’। তাঁহার বাৎসল্যে শত শত গৌরভক্ত তাঁহাকে ‘মা’ ডাকিয়া প্রাণ জুড়াইতেন এবং তিনিও সকলকে সন্তানাদিক স্নেহ করিতেন। তাঁহার স্নেহে যত্নেই পূর্ববঙ্গের বহু গৃহে নদীয়া-যুগল-সেবা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ও-অত্য়াপি সেবিত হইতেছেন। ১৮৩৮ সালে কলিকাতায় ধুমধামের সহিত বিষ্ণুপ্রিয়া জন্মমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে। এবং ইতিপূর্বে কলিকাতা নগরীতে অত ধুমধামের সহিত প্রিয়াজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় নাই; এমন কি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অবতরণ তিথি উপলক্ষে ইতিপূর্বে কলিকাতায় বিশেষ কোন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু সেই বছর হইতে অত্য়াপি এই তিথিতে অষ্টপ্রহর নাম যজ্ঞ, স্থানে-স্থানে প্রিয়াজী-কথা আলোচনার্থে সভা ইত্যাদি হইয়া আসিতেছে। আরো আনন্দের কথা যে শ্রীশ্রীসাদাদার গণ ছাড়া অপরাপর বৈষ্ণববৃন্দও এই বৎসর প্রিয়াজী-অবতরণ তিথিতে সভার অনুষ্ঠান করেন ও উক্ত সভায় প্রিয়াজী-কথা আলোচনা করিয়া শ্রীপঞ্চমী তিথিটা শ্রীপূর্ণ করেন। যাহা হউক, তাঁহার গৌরপ্রাপ্তির পর হইতে অত্য়াপি তাঁহার গুণমুগ্ধ শত সহস্র সন্তানগণ প্রতি বৎসর ফাল্গুনী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে ইলুহার (বিশাল) মিলিত হন ও তাঁহার তুষ্টির জন্ত তাঁহার সেবিত প্রিয়াজীবলভের অঙ্গনে অষ্টপ্রহর গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া নাম সংকীর্তন করেন। এই সময় শত সহস্র ভক্ত মহাপ্রসাদ

পানেন। এই বৎসরও উক্ত তিথিতে অষ্টপ্রহর নাম যজ্ঞ হইবে।—সম্পাদক)

মা! তুমি ত বাঁশীর সন্ধান দিতে চ’লে গেলে! যাবার সময় সেই কালো ছেলেটা খুঁজলে! জিজ্ঞাসা কল্লে—‘সেই ক’লো ছেলেটা কই? সে যে বাঁশী ফেলে গেল!’ তারপর তুমি গদাঝল চাইলে! গদাঝল দেওয়া হ’ল। এর পরে তুমি বললে—‘এখন আমি যাই!’ এই ব’লে মা! তুমি নয়ন মুদিলে। আর ত তুমি, মা, ফিরলে না! তুমি ত আর এলে না, মা! তোমার সেই কালো ছেলেটাকে বাঁশী দিতে পেলে—দেওয়া কি হ’ল না, মা! না, তোমার সেই চপল ছেলে কখন কোথায় আবার বাঁশী ফেলে, পাছে বা সেই বাঁশী হারিয়ে তার খেলা বন্ধ হয়ে যায়, বাঁশী না হলে যে তার চলনা,—খেয়গণের কর্ণানন্দী এই বেধুরব, রাখাল-বালকদের নিয়ে নিত্য নতুন খেলার সাথী এই বংশী,, আকুল প্রাণে উজ্জান ব’য়ে বমুনার উধাও হ’য়ে চুটে’ যাওয়ার যাহু মন্ত্র এই বংশীধ্বনি, গোপিকাকুলের বিনিবর্তিত সর্বকামা ব্যতীতবজ্রাভরণা হ’য়ে কুলশীল জীবন যৌবন দুস্ত্যজ আর্ধ্যপথ ত্যাগের মোহন মন্ত্র এই সরলা বংশীর কলনাদ, ব্যাঘ্রকুরঙ্গ ভৃঙ্গদভেক প্রভৃতির প্রেমভোগী সন্মেলনের যোগসূত্র এই বিশ্ববিমোহন বংশীর স্তম্ভুর সুর, এ বংশী না হ’লে তাঁর যে এক মুহূর্ত্তও চলেনা, মাঝে মাঝে আনমনা হ’য়ে পাছে বা বাঁশীটা কোথাও ফেলে যায়, তাই, মাগো! তার সন্ধান দেওয়ার জন্ত তুমি বুঝি চিরতবে সেধায় পেকে গেলে! আর এলেনা মা!

য়েহময়ী মা আমাদের! ত্রিশনগরে শ্রীমা অগ্রকট হ’তে তিনি আমাদের শত সহস্র সন্তানকে তোমার হাতে সঁপে দিয়ে গেলেন। আর আমরা তোমারি স্নেহে লালিত হ’য়ে তোমারি দেওয়া গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া নিয়ে পরমানন্দে নেচে গেয়ে সংসারপথে সুখে স্বচ্ছন্দে চ’লেছিলাম। কিন্তু এই কাণ্ডগেরই শুক্লা সপ্তমীতে তুমি চ’লে গেলে। সে আজ চার বছর।

কলকাতার বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর জন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন ক'রে তুমি ইলুহারে এসে একমাস থেকে আমাদের বহিষ্কৃত অস্তরালে গেলে। নীরবে তুমি কাজ ক'রে গেছ। বহিষ্কৃত বড় একটা ধরা দাওনি। বুঝতে পারিনি তখন তোমার মেহের গভীরতা, নীরবতার মধ্যে তোমার অপার কার্যশক্তি, আড়ম্বরবিহীনতার মধ্যে অশেষ মেহের বিকাশ, স্বাভাবিকতার মধ্যদিয়া লোকাতীত বস্তুর সহিত সহজ সুন্দর যোগসূত্র স্থাপন।

তোমার কাছে, মাগো! আমাদের কখন কিছু চাইতে হয়নি। কেননা, সংসারের অভাব অভিযোগ কিছুই আমাদের বুঝবার অবসর হয়নি। সংসারের কোন তাপ আমাদের গায়ে লাগেনি। অধিকন্তু এই ইহলোকে থেকেই নদীয়াধুগল ভঞ্জে নদীয়ার লীলারস আশ্বাদনে সুখের সাগরে ভাসিতেছিলাম। গৌর আমাদের অতি নিজ্জন, এই সুখে আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিয়া নাচিয়া গাহিয়া কাল কাটাই-তাম, এখনো যেন মা, জীবনের বাকী ক'টা দিন বিশ্বাসী জনগণকে ভাই ভাই ব'লে নেচে গেয়ে চলে যেতে পারি। এখন তোমার কাছে মেহাশীষ চাচ্ছি বটে, তোমার প্রকট-

কালে এসব চাওয়ার কথা মনেই স্থান পায়নি। তুমি অস্তরালে যাওয়ার এইটুকু এখন পার্থক্য হয়েছে। তোমার মেহদৃষ্টি এখনো আমাদের উপর সমভাবেই বর্তমান, এ বিশ্বাস আমরা হারাইনি।

সারা জীবন গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ভঞ্জন ক'রে তুমি মা যাবার বেলা সেই কালোছেলের বাঁশীর সন্ধান দিতে যাওয়ার কথা আমাদের জানিয়ে দিলে। এতে আমাদের ভঞ্জে কোন দ্বিধা হয় নি। ভঞ্জনের কোন ছোট বড় নেই। ভঞ্জন ত দূরের কথা জীবের মধ্যেও ছোট বড় জ্ঞান ভুলিয়ে দিয়েছে। ভঞ্জন যে, লীলারস আশ্বাদন, গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলা, ন'দেধাম ও ব্রজধাম যে একই লীলার বৈচিত্রী-পূর্ণ দুইটা দিক, এবং পরস্পর পরস্পরের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ও আশ্রিত তাহা যেমন প্রকটকালে শিখিয়েছে, অপ্রকট হওয়ার কালেও তাই দেখিয়ে গেলে।

আমরা যেন মা তোমার এই গৌর-গোবিন্দের ন'দে ও ব্রজধামের লীলামাধুরী যুগপৎ আশ্বাদন কর্তে পারি, তোমার শ্রীচরণে তোমার সন্তানগণের এই কাতর মিনতি।

জয় গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া।

অর্দ্ধশিক্ষিতের অবস্থা

কাঁচা চাউল খেলেও অপরিপাক হয়
বুক জ্বালা, পিত্ত রোগ কিছু দমে রয়
সিদ্ধ করি ভাতরূপে খাইলে তাহার
অবশ্য ক্ষুধার জ্বালা নিবারিত হয়
কিন্তু আধা সিদ্ধ চা'ল খায় যদি কেহ
জনমে পেটের পীড়া নাহিক সন্দেহ
ছনিয়াতে অর্দ্ধ শিক্ষা প্রাপ্ত নয় যত
নহে চা'ল-নহে ভাত আধাসিদ্ধ মত।

বাঁরা খোদার খুব ভক্ত তাঁদের বিপদ অতি শক্ত ;
এই ভবে বাঁরা সব ঈশ ভক্ত অতি
তাঁহারা ও কত, কাজে লভিছে দুর্গতি।
মানবের আদি পিতা হুজুরত আদম
স্বর্গে বসি ধেরে ছিল একটু গন্দম
পত্নীর বিয়োগী হয়ে ছিল বহুকাল
ছনিয়াতে আরো কত ভুগিল জঞ্জাল।

বাঁশীর সন্ধানে।

কবু*

মা! তুমি চ'লে গেলে! যাবার বেলা বললে, "সেই কালো ছেলেটা কই? সে যে বাঁশী ফেলে গেল!" এই ব'লে গঙ্গা জল চেয়ে নিলে। পরক্ষণেই চোখ বু'জে রইলে। সেই কালো ছেলের বুদ্ধি বাঁশীর সন্ধান দিতে গেলে! শুনেছি, বাঁশী না হ'লে তাঁর চলেনা। তাঁর বাঁশীর সুরে নাকি ক্ষেত্রগণ যুধে যুধে এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ায়, রাখাল বালকেরা কত রঙ্গে ভঙ্গে নাচ'ত আর খেলা কর'ত, পোপীগণ যে যার কাজকর্ম ছেড়ে বনের দিকে ছু'টে যেত, যমুনা উজান বহিত। তোমার সেই চপল ছেলে মাঝে মাঝে বুদ্ধি আনমনা হ'য়ে কোথাও বাঁশী ফেলে যেত। তুমি বুদ্ধি মাগো, তাঁকে সেই বাঁশীটা দিতে গলে!

সে ত আজ অনেক দিন হ'ল, মা! সামনের কান্ধা-শুক্রা সপ্তমীতে চার বছর হবে। বাঁশী দেওয়া কি আর হ'লনা! তুমি ত আর এলেনা, মা! পাছে বা সে আবার কোথাও বাঁশীটা হারিয়ে ফেলে—তা হারালে যে তাঁর খেলাই বন্ধ—তাই বুদ্ধি, মাগো, তুমি বাঁশী খুঁজে দিতে সেখানে তাঁর কাছে কাছেই চিরকাল থেকে গেলে!

তা থাক, মা! তোমার স্মৃতি কেন বাধা দেব! তবে, মাগো! তাঁর সঙ্গে আমাদের একবার পরিচয় করিয়ে দাও। সে যে মোদের দাদা। দাদার সঙ্গে আমরা কি একটু খেলবনা!

তুমি যে-খেলা ছড়িয়ে দিয়ে গেছ মা, তাতে যে সাধ মিটছেনা, প্রাণ ঠাণ্ডা হচ্ছেনা। তোমার সেই কালো ছেলেটাকে মোদের চিরসাথী ক'রে দাও। তাঁকে নিয়ে আমরা নেচে গেয়ে নিত্য নতুন খেলা খেলে সুখের তরঙ্গে ভেসে বাই। তুমি কি তা দেখে স্মৃতি পাবেনা!

আমায় সংসারের খেলায় যুক্ত করে দিয়ে গেছ। কিন্তু মা, কত শত লোকের সংসারখানিকে পৌরবিস্মৃতিপ্রিয় সংসার ক'রে দিয়ে জালাময় সংসারকে আনন্দ-নিকেতনে পরিণত ক'রে দিয়ে গেছ। আমার বেলাও তাই কর মা! যেন সেখানে যেয়েও গৌরাদের সংসারে বসতি করি।

*লেখিকার বাড়ী-শিলচর। প্রবন্ধটি স্বীয় জননীর উদ্দেশে লিখিত শ্রীমা, বিশেষভাবে দুইটি বস্তুতে তাঁহার। শক্তি রেখে অপ্রকট হন। একজন ইনি "ইহার স্মৃতি-স্মৃতির উপর লেখা আছে"

সেই কালো ছেলে- বাঁশী গেল ফেলে

নির্যাতনের কালে গেল এই ব'লে।

ধরামারে মাতৃসঙ্গে এসে-য়েহ দিয়া

প্রকাশিলেন শ্রীমায়ের পৌরবিস্মৃতিপ্রিয়া।

আর একজন শ্রীল তারকচন্দ্র সিংহ ভক্তিসিদ্ধান্তসাগর মহাশয়ের পত্নী। তিনি এখনো নদীয়ায় গুল সেবা প্রকাশ-কার্য্য করিতেছেন।

বার্তাবহ

শ্রামল বাঙলার পরিচ্ছন্ন নীল আকাশে দুর্ঘ্যোগের কালে মেষ ঘনাইয়া আসিয়াছে। বাঙালীর অভিশপ্ত জীবনে দুঃখ-শোক, দৈম্য রোগ নিত্যকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্ষুধিতের আর্ন্তনাদে কিছুদিন পূর্বেই বাঙলার আকাশ বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল—অনশনে মৃত্যু চেনা বন্ধুর মতই গধে প্রান্তরে নিত্য প্রত্যক্ষ হইত। সেই অবস্থা প্রশমিত হইতে না হইতেই, ম্যালেরিয়া বসন্ত ও কলেরা মহামারীরূপে দুর্গত বাঙালীর-বুক সন্ত্রাস জাগাইয়াছে। ঢাকা ময়মনসিংহ নোয়াখালী, ত্রিপুরা, বরিশাল প্রভৃতি জিলাসমূহে হাজার হাজার লোক এই আবর্তে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে ও হারাইতেছে। দুর্ভিক্ষের বিভীষিকার অবসান না হইতেই কলেরা ও বসন্ত সমগ্র বাঙলাকে সন্ত্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। মাহুঘের সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া নূতন আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। বরিশালের অবস্থা এমন এক চরম পর্যায়ে পৌছিয়াছে যে আমানতগঞ্জ ও কোতোয়ালি ওয়ার্ডের হাট, বাজার, ভোজনাগার, দুধসত্র চায়ের দোকান মিঠাইয়ের দোকান রেন্টোরা, স্কুল পাঠশালাগুলি সাময়িকভাবে বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে। হিসাব করিলে দেখা যাইবে সমগ্র বাঙলার অর্দ্ধেক অধিবাসী আজ এই মহামারীর কুক্ষিগত। সরকারী ও বেসরকারী অবিরাম চেষ্টা ভিন্ন প্রতিকারের পথ নাই। মানব হিতৈষীনার উদ্বুদ্ধ নরনারী ও প্রতিষ্ঠান সমূহ সেবাত্রিতে সার্থকতার সন্ধান পাইবেন।

* * * * *

বিধ্বস্ত বাঙলার অগনিত নরনারী আর একবার দুর্ভিক্ষের সন্মুখীন হইতে পারে এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া নিউজ ক্রনিকল পত্রিকার দিল্লীস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, ভাল ফসল হওয়া সত্ত্বেও বাঙলার দ্বারদেশে আবার দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইলে বাঙলার রোগজীর্ণ ও খাচ্ছাভাবে অপরিপুষ্ট সহস্র সহস্র নরনারীর দুঃখের অবধি থাকিবে না। আশার কথা এই যে বাঙলা সরকার এই সংবাদের প্রতিবাদ করিয়া

এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে সংবাদদাতা ভুল ও বিকৃত সংবাদ প্রচার করিয়াছেন এবং তথ্য দিয়া ও বৃদ্ধি দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন সে আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই। কারণ না থাকিলেই ভাল। ‘মরার উপর আর খাড়ার ঘা’ না পড়ে এই কামনাই সকলে করিতেছেন।

* * * * *

মাদ্রাজ গবর্নমেন্টের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে তিরুভালমিউর গ্রামে সাময়িক বিভাগের কয়েকজন কর্মচারী জীলোকদের শ্রীলতা হানি করিয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তদন্তের ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতি মনোযোগী হইয়াছেন। গবর্নমেন্ট জনসাধারণকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে অপরাধীগণকে ধরিবার জন্য পুলিশ ও সাময়িক কর্তৃপক্ষ সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। ভারতরক্ষা আইনের দাঁপটে বহু ঘটনাই লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যায়। মাদ্রাজ গবর্নমেন্টের এই আয়োজনকে তাই মনের ভাল বলিতে হয়।

গত ২০শে জাহুয়ারী রয়টারের সংবাদে প্রকাশ যে মিঃ আমেরি বলিয়াছেন যে ভারতে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে ১৯৪৩ সালের গত পাঁচ মাসে দশ লক্ষের অধিক লোক মারা যায় নাই। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে গত ২৮শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সাময়িক বিভাগ ১২৮৯০০ রোগীর চিকিৎসা করিয়াছে এবং পনের লক্ষ কলেরার টীকা দিয়াছে। সংবাদটা নিশ্চয় মন্তব্যের অপেক্ষা রাখেনা। সাময়িক বিভাগের স্তুতিবাদের ছিদ্রপথেও বর্তমান বাংলার নগ্নরূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

* * * * *

গত ৩রা মাঘ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উৎসব সর্বত্র অম্লম্বিত হইয়াছে। বাংলা দেশের জ্ঞান ও কর্মের, ত্যাগ ও ধর্মের ক্ষেত্রে যে সব মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে স্বামীজী তাঁহাদের অন্ততম। জ্ঞানের আলোকে কর্মের প্রেরণায়, জীবনের উৎকর্ষ সাধনের অগ্নি আদর্শ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। সম্যাসী বিবেকানন্দে বাস্তব জীবনকে উপেক্ষা করেন নাই—এই জীবনের দুঃখ দারিদ্র্য, অভাব ও

অবমাননাকে সংগ্রামের নথ্য দিয়া জয় করিবার, জীবনে পরাভবকে অস্বীকার করিবার শিক্ষা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা সেই যুগমানবের আবির্ভাব তিথিতে প্রত্নানিত দেশ-বাসীর সহিত আমাদের আন্তরিক প্রণাম নিবেদন করি।

* * * *

ছুরিয়া জুড়িয়া বাদ্জিয়া সম্পর্কে তীব্র প্রতিযোগিতা চলিতেছে—বাজারের অধিকার লইয়া রেবা রেবির অন্ত নাই। ব্রিটিশ ও মার্কিন ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতার আবর্তে পরাধীন ভারতবর্ষের স্বার্থহানি ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। বৈদেশিক বাণিজ্য বিস্তারের ব্যাপারে ব্রিটিশ ও মার্কিন ব্যবসায়ীদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষে আমেরিকাজাত পণ্যের চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে, বিক্রয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাই বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কঠোর বিধিনিষেধ প্রয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার ফলে যুক্ত-রাষ্ট্রের রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারে বিঘ্ন ঘটায় মার্কিন ব্যবসায়ীরা ক্ষুব্ধ হইতেছেন। ভারতের বাজার লইয়া এই বিরোধী স্বার্থের সংঘাতে এদেশে শিল্প বিস্তারে ব্যাঘাত ঘটবে।

* * * *

ফেব্রুয়ারী মাসের বাজেট অধিবেশনে এগারটি সরকারী বিল উপস্থাপিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। সাধারণ বাজেট আলোচনা ব্যতীত কৃষি আয়কর বিল, মাধ্যমিক শিক্ষা বিল, উর্ডিন্যান্স আইনগুলি পাশ করিয়া লইবার বিল, কৃষি আয়কর বিল, মিউনিসিপ্যাল বিল প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিতে দীর্ঘ সময় আবশ্যক হইবে। মে মাস পর্যন্ত এই অধিবেশন চলিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

* * * *

ভারতের কয়েকজন প্রখ্যাত নিম্নলিখিত আর্থিক উন্নতির যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন উহা প্রবর্তিত হইলে পনের বৎসরের মধ্যে ভারতের জনসাধারণের জীবন যাত্রা প্রণালীতে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটবে। বলা হইয়াছে যে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে ১৫ বৎসরে মোট ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হইবে। জাতীয় প্রয়োজনের দিক দিয়া

(১) খাদ্য (২) পরিধেয় (৩) বাসগৃহ (৪) শিক্ষা ও (৫) চিকিৎসকের সাহায্য জনসাধারণের নিকট পৌছাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবগুলি রচিত হইয়াছে। পরিকল্পনায় বিজ্ঞানকারীরা বলিয়াছেন যে ইহা কার্যকরী করিতে সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে ত্রিকান্তিক সহযোগিতা আবশ্যক। জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই জাতীয় সহযোগিতা সম্ভব হইবে কি?

* * * *

দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাঙলার দুর্গত জনসাধারণের সেবায় নিযুক্ত বেঙ্গল রিলিফ কমিটি জিনিষ পত্র ও টাকায় এ পর্যন্ত মোট ৩৫ লক্ষ টাকা সাহায্য পাইয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে এবং কলম্বো, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আমেরিকা হইতেও সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। বর্তমানে কমিটি রোগের চিকিৎসা, বস্ত্র বিতরণ, ছাত্রদের পুনরায় স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা প্রভৃতি কার্যের প্রতি বেশী নজর দিতেছেন এবং একটা ব্যাপক পরিকল্পনাভূমারে কার্য আরম্ভ করিবার চেষ্টায় আছেন।

* * * *

ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্তার যোগেন্দ্র সিংহ কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের এক সভায় বলেন যে জাতীয় শিক্ষার জন্য ভারত ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ভার বহন করিতে পারে। কোন কোন মহলে এরূপ ভুল ধারণা আছে যে শিক্ষার জন্য ভারত এত টাকা ব্যয় করিতে পারে না। অত্যাশ্রয় সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে ভারতের আর্থিক উন্নতির মোগ রহিয়াছে এ কথা সত্য। কিন্তু মানুষই উৎপাদনের সর্বোৎকৃষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করিয়া থাকে। মানুষকে সর্ববর্ধকম পূর্ণ কর্মক্ষম করিয়া তোলা আবশ্যিক। ভারতীয় সম্পদের সচ্যবহার করিতে হইলে মানুষকে শিক্ষিত করিতে হইবে। কাজেই ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য যে ব্যয় হইবে তাহা পরিণামে উঠিয়া আসিবে।

* * * *

ভারত সরকার নিম্নলিখিত শ্রদ্ধা মহোদয়দের লইয়া হিন্দু আইন কমিটি গঠন করিয়াছেন—চেয়ারম্যান কলিকাতা

হাই কোর্টের বিচারপতি জ্ঞান বি, এন.রাও। সদস্য—
কলিকাতা হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ডাঃ দ্বারকানাথ-
মিত্র, পুণার আইন কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ রুড় পাড়ে, মিঃ
ভেক্টরাম শাস্ত্রী। মাদ্রাজ প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের
কর্মচারী মিঃ রাজা গোপালন এই কমিটির সেক্রেটারী
হইবেন।

* * * *

এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকার
কালে বাঙলায় ছুভিক্ষের পুনরাবির্ভাব রুদ্ধ করা ও বাঙলার
জনসাধারণের সামাজিক ও বৈষয়িক জীবন পুনঃ প্রতিষ্ঠা
সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলেন
যে সম্ভাব্য চাউল, খাদ্য শস্য সরবরাহ করা ব্যতীত জনসাধা-
রণকে তাহাদের পূর্বকার জীবন যাত্রার ফিরাইয়া আনা
আম্ভ প্রয়োজন। শুধু ভিক্ষা দিলেই এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান
হইবে না। ভিক্ষা বৃদ্ধি জোর করিয়া চাপাইয়া দিলে ব্যক্তি
ও জাতির আত্মসম্মানের চেতনা ক্ষুণ্ণ হয়। মধ্যবিত্ত
শ্রেণীই বাঙলার কৃষ্টি ও বৈষয়িক জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ
কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ পরিবার আজ নিঃসম্বল
হইয়া পড়িয়াছে অথচ তাহারা ভিক্ষাও চাহিতে পারে না।
তিনি আরও বলেন যে ভারত সরকার যখন কলিকাতা ও
শিল্প অঞ্চলে আহাধ্য সরবরাহের ভার লইয়াছেন এবং যখন
দেশে প্রচুর শস্য জমিয়াছে তখন ছুভিক্ষের পুনরাধা-
পাঙ্কিতে পারে না। তবু যদি সত্য সত্যই তাহা ঘটে তাহা
হইলে তাহার দায়িত্ব সরকারের উপরই বেশী করিয়া পড়িবে।
রাষ্ট্রের নিয়ম কানুন ডাঃ মুখার্জি যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য সম্পর্কে
পূর্বাঙ্কেই অবহিত হইলে প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব হইবে।

ভারতের সর্বত্রই স্বাধীনতা দিবসের অমুষ্ঠান প্র-
তিলিত হইয়াছে। সরকারী রীথি নিষেধের সমারোহের
বেড়াঙ্কালে সমারোহের বা আড়ম্বরের অবকাশ না থাকিলে ও
জাতীয় জীবনের স্পন্দন তরঙ্গায়িত হইয়া সঙ্কল্পের দৃঢ়তা
বোধনা করিয়াছে। ভারতবাসী স্বাধীনতা চিন্তে কংগ্রেসের
বাণীকে নূতন করিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। মার্কিন
বেতার কেন্দ্রে ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে যে অমুষ্ঠান
হয়, তাহাতে ভারতের স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করিয়া

বিখ্যাত 'এশিয়া' পত্রিকার সম্পাদক ও অত্যন্ত বিশিষ্ট
ব্যক্তি বক্তৃতা করিয়াছেন। ভারত বাসীর পক্ষে এই
অমুষ্ঠানের সংবাদ উৎসাহব্যাঞ্জক সন্দেহ নাই।

পার্লামেন্টের সদস্য প্রখ্যাত লেখক ও চিন্তানায়ক মিঃ
ডি এন্ প্রিট, রেভারেণ্ড সোরেসেন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ
উত্তর লণ্ডনের ৪৪ হাজার শ্রমিক প্রতিনিধিদের এক সভায়
ভারতবর্ষ সম্পর্কে বক্তৃতা করিয়াছেন। মিঃ সোরেসেন
ব্রাবরই ভারতবর্ষের দাবী সমর্থন করিয়া আসিতেছেন।
তিনি এই সভায় তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলেন "আমি
মনে করি, ভারতবাসীদের আমরা যদি আমাদের সম দর্যাদা-
দানে স্বীকৃত হইতাম তাহা হইলে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় আমরা
ভারতবর্ষের পূর্ণ সহযোগিতা পাইতাম। ভারতের বন্দী
নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেওয়া উচিত। স্তার অসওয়াল্ড মোস-
লেকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে অথচ পণ্ডিত জহরলাল প্রমুখ
ভারতীয় দেশ প্রেমিকগণ এখনও বন্দী আছেন।" নিরপেক্ষ
চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেরই রেভারেণ্ড সোরেসেনের এই উক্তি
সহিত একমত হইবেন। কিন্তু শাসকগণ্ডীর চিন্তাধারা
স্বতন্ত্রভাবে প্রবাহমান।

* * * *

কোয়াংটুং আন্তর্জাতিক সাহায্য সমিতির সম্পাদক মিঃ
জর্জ এ্যাডামস্ চুং কিং এর সরকারী কর্মচারীদের নিকট
এক সংবাদে জানাইয়াছেন যে দক্ষিণ চীনের কোয়াংটুং
প্রদেশে অনশনে ও রোগাক্রান্ত হইয়া ইতিমধ্যে দশ লক্ষ
লোক প্রাণ হারাইয়াছে। এই বৎসর তথায় আর এক
সাংঘাতিক ছুভিক্ষ দেখা দিবার উপক্রম হইয়াছে এবং
অবিলম্বে সাহায্য না আসিলে এ বৎসরও তথায় শত সহস্র
লোক মূনিশ্চিত মৃত্যু মুখে পতিত হইবে। প্রতিবেশী
রাষ্ট্রের এই দুঃসংবাদে নিগৃহীত ভারতবাসী কেবল চোখের
জল ফেলিতে ও পরিত্রাণের কামনা করিতে পারে। কারণ
ভারতীয়ের নিগ্রহ চীনকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত
হইয়াছে যে গরু বাছুর প্রভৃতি কৃষিকার্য ও জনসাধারণের
স্বাস্থ্য রক্ষার্থ অপরিহার্য, কিন্তু কিছুদিন ধরিয়া সেনা

বাহিনীর খাণ্ড সরবরাহের জন্য অত্যধিক গৃহপালিত পশু হত্যা করা হইতেছে। ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে তাঁহারা যেন সেনাদলের জন্য গৃহপালিত পশু ক্রয় বন্ধ করার ব্যবস্থা করেন। আনন্দের বিষয় প্রস্তাবটি ইউরোপীয় দলেরও সমর্থন লাভ করিয়াছে এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইতেও পারিয়াছে। ইহা হইতেই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে। এ সম্পর্কে অনতিবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে যুদ্ধকালের মধ্যেই গৃহপালিত পশুর বংশ বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। কর্তৃপক্ষ সচেতন হইবেন ইহাই আমরা আশা করি।

* * * * *

গত ২৪শে মাঘ সিঁধি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্বোধনে ২৫নং বাগবাজার স্টাটে অনুষ্ঠিত এক সভায় বৈষ্ণবাচার্য্য পণ্ডিত রসিকমোহন বিজ্ঞানভূষণ ১০৫তম বৎসরে পদার্পণ করার তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়। বক্তাগণ রসিকমোহনের বিভিন্ন গুণাবলী উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। শ্রীর যত্নাথ সরকার বলেন,—“পণ্ডিত রসিকমোহন মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বৈষ্ণব আদর্শ প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার এই কার্যের কথা বিস্তৃত হইলে ঘোর অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক হইবে।” আমরাও গুণগ্রাহীদের সঙ্গে মিলিতভাবে পণ্ডিতপ্রবরের প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

* * * * *

বিষ্ণুপ্রিয়া জন্মমহোৎসব

ও

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত জয়ন্তী

মাঘী-শুক্রা পঞ্চমী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর অবতরণ-তিথি। তৎক্ষণ্ণ এই তিথিটী শ্রীপঞ্চমী। সকলে এই তিথিকে শ্রীপঞ্চমী বলেন বটে, কিন্তু কেন যে এই তিথিটী শ্রীপঞ্চমী হইল এবং তৎক্ষণ্ণ এই তিথিতে জনগণের কি করণীয় সে বিষয়ে সর্বসাধারণ অজ্ঞ ও উদাসীন। যাহার অবতরণ হেতু এই তিথিটার সহিত ‘শ্রী’ যুক্ত হইল, এই তিথিতে সেই গোলোকবিহারিণী গৌরানন্দগোবিন্দী, ভগবানের স্নানাদিনীশক্তি

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জয়ধ্বনি দিয়া সকলের চিত্তশোধন করা সমীচীন। অঞ্চ কতজন উহা করেন তাহা ভাবিয়া দেখিবার কথা। এই তিথিতে কেন্দ্রে-কেন্দ্রে যেখানে বৈষ্ণব সম্ভব-মিলিত হইয়া সকলের প্রয়োজন—ঠাকুরাণীর জয়ধ্বনি দেওয়া। নব-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরানন্দ-স্ব-সমিতির উদ্দীপনায় এবার বাংলার নানা স্থানে প্রিন্সাজী-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রভাত-কীর্তন, প্রিন্সাজী-কথা পাঠ, গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া নাম-সংকীর্তন, মহাপ্রসাদ বিতরণ—এই উৎসবের অঙ্গ। অবশ্য ইতিপূর্বেও প্রিন্সাজী-উৎসব যে অনুষ্ঠিত হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু উহা মাত্র দুই তিনটা স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল। এবারের শ্রায় একই তিথিতে এমন ব্যাপক উৎসব ইতিপূর্বে আর হয় নাই এবং ইহার অন্তরালে যিনি প্রেরণা দিয়াছেন তিনি সকলের ধন্যবাদার্থ।

শ্রীপঞ্চমী তিথিতে যে সকল স্থানে অষ্টপ্রহর, গৌরবিষ্ণু-প্রিয়া নাম-সংকীর্তন, প্রভাত-কীর্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ হইয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

বরিশাল জিলা

স্থানের নাম	উদ্বোধকতার নাম
বাসুণ্ডা—	শ্রীকিরণকুমার সেন রায়চৌধুরী
ঝালকাঠি—	শ্রীনিকুঞ্জবিহারী বিশ্বাস
বাইশারী—	শ্রীহরিমোহন চৌধুরী
ইদিরকাঠি—	শ্রীশরচ্চন্দ্র বড়াল
কাউখালি—	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চন্দ
বলভদ্রপুর—	শ্রীনিবারণচন্দ্র কুণ্ড
পিরোজপুর—	শ্রীকালীবর দত্ত, উকিল
কদমতলা—	শ্রীরাজমোহন সোমদ্যার
ইলুহার—	শ্রীযুক্ত প্রফুল্লবালা দেবী
শান্তিহার—	শ্রীহরপ্রসন্ন গুহ
রেখাখালী—	শ্রীবসন্তকুমার ডাকুয়া
গরঙ্গল—	শ্রীসত্যচরণ বিশ্বাস
কমলিকান্দর—	শ্রীগৌরদাস নট্ট
রঘুনাথপুর—	শ্রীযুক্তা ননীবালা দেবী

নোয়াখালী জিলা

নোয়াখালী—শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়, নাজীর

ত্রিপুরা জিলা

কালীপুৰ—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভৌমিক

মাকিয়ারা—শ্রীঅর্জনচন্দ্র রায়

উজানচর—শ্রীরসিকলাল রায়

রায়চন্দ্রপুর—শ্রীব্রজবাসী রায়

পূর্বহাটা—শ্রীনবদীপচন্দ্র রায়

পাইকপাড়া—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীয়াং—শ্রীরতনাকান্ত দাস

নোয়াগাঁও—শ্রীশশিকুমার ভৌমিক

সেউড়া—শ্রীবিনোদবিহারী দেব

ত্রিশা—শ্রীকালচাঁদ দেব

নগর-পাড়—শ্রীরজনীকান্ত রায়

সারভূঞাপুর—শ্রীয়াসবিহারী চৌধুরী

চন্দনাইল—শ্রীকীর্ত্তীচন্দ্র আচার্য্য

বিজয়নগর

চুপাতি—চন্দ্রকুমার সরকার

চম্পকনগর—শ্রীহারিকানাথ ভূঞা

ধাংগুর—শ্রীহরিদাস রায়

গাংকা—শ্রীসত্যীশচন্দ্র চক্রবর্তী

ঢাকা জিলা

ঢাকা—শ্রীহরির মজুমদার

ব্রাহ্মদি—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মৌলিক

আবদুল্লাপুর—শ্রীশোভালাল কুণ্ড

নরসিংহদি—শ্রীমহানন্দ আচার্য্য

সদাসদি—শ্রীদীননাথ সাহা

ফরিদপুর জিলা

কোটালিপাড়া—শ্রীগুরুনাথ রায়

খুলনা জিলা

মরেলগঞ্জ—শ্রীজ্ঞাননাথ রায়

বাণিয়াখালি—রসিকচন্দ্র বাল্য

কলিকাতা

বাগবাটার (সভা)—বৈষ্ণব সমিতির

সালিমার—শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন

চালতাবাগান (সভা)—শ্রীশ্রীমা-দাদা-কর্ম্মীক

আর একটি আনন্দের কথা। এই শ্রীগৌর যুব সমিতির-উত্তোগে নানা স্থানে ১৫ দিবস ব্যাপী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত যে কত মহামূল্য সম্পদ এবং মানুষ মাত্রেই উহা কত শ্রদ্ধার বস্তু তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা মিলেনা। এমন একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থের সহিত শিক্ষিত সমাজেও কতজন সম্যক পরিচিত তাহা ভাবিবার বিষয়। কারণে অকারণে, এমন কি সামান্ত কারণেও আজকাল জয়ন্তী উৎসবের ছড়াছড়ি! অথচ বাংলার গৌরব, ভারতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মজ্ঞানের কেন্দ্রস্থরূপ এই গ্রন্থখানির জয়ন্তী-উৎসব আজি পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইল না। ইহার জয়জয়কার দিবার লোক সারা বাংলায় মিলেনা; অথচ এমনও দেখিয়াছি, কে কবে তিনটি কবিতা লিখিয়া মারা গেলেন, অমনি সেই লেখকের বংশ-পরিচয় উদ্ঘাটন করিতে ও এই তিন ছত্র কবিতার ঢকা বাজাইতে বাঙ্গালীর উৎসাহের অবধি নাই। শুরু হইয়া যায় পাড়ায় পাড়ায় শোক সভা, সংবাদপত্রের গায়ে দেখিতে পাই উহারই রোমন্থন বিবরণ। ইহার অমর লেখনীপ্রসূত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, সেই দেশবরেণ্যের নাম কত জন জ্ঞানেন? শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর প্রতিভা, অগাধ-ভক্তি কত জনে মিলে? অথচ তাঁহার নাম আমরা জানিনা বা তাঁহার প্রতি, তাঁহার অপূর্ণ অপ্রাকৃত দানের প্রতি আজ পর্য্যন্ত আমরা অচেতন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দুইশত হরিসভা আছে, অথচ কাঁহারও দৃষ্টি এই দিকে পড়ে নাই। শ্রীগৌরাদ যুব সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের এই প্রকার মৌলিক প্রচেষ্টায় আমরা ইহাদের নিকট হইতে আরো অনেক কিছু পাইবার আশা করিতে সাহসী হইতেছি।

* * * * *

ঢাকায় অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত জয়ন্তী-উৎসবের ৯ই মাবের সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত সঞ্জীবকুমার চৌধুরী এম-এ, (Triple) বি-এল, মহাশয় বলেন,—“ইহার চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের বৈভব ও মধুরিমা সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলো-

চনার আয়োজন করিয়াছেন, তাঁরা সমগ্র ঢাকাবাসীর শ্রদ্ধা পাওয়ার উপযুক্ত, কারণ ঢাকাতে এই ধরনের সভা এই সর্বপ্রথম organise করা হইল।” শুধু ঢাকা কেন, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত জয়ন্তী ইতিপূর্বে কোথায়ও হইয়াছে বলিয়া আমাদের জ্ঞান নাই। তিনি আরো বলেন,—“আমি যত যত ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়াছি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দ্বারা এরূপ analytical অথচ comprehensive collection আর কোন্‌খানেই দেখি নাই।” পরিশেষে তিনি বলেন,—“তাঁহারা যেমন, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পাইতে পারেন এইরূপ একখানা গ্রন্থকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবার জন্য এই সভার আয়োজন ক’রেছেন, তেমনি তাঁরা যদি এই গ্রন্থের সংস্কৃত অংশ পরারে লিপিবদ্ধ ক’রে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন, তবে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির একটা মহৎ উপকার করবেন। বাঙ্গালীর যে কোন সম্মান যেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ক’রে দেখেন যে কি অপূর্ব ধনভাণ্ডার এই গ্রন্থখানিতে সমিবেশিত আছে।”

শ্রীশ্রীমাদাদার সুযোগ্য পরিচালনা ও স্থায়িত্ব করে একটা কমিটি গঠিত হইয়াছে এ সংবাদ গত সংখ্যায় দেওয়া হইয়াছে। এই কমিটিতে আরও দুইজন সভ্য যোগদান করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল কুণ্ড, পানাম (ঢাকা) ও শ্রীগৌরদাস নট্ট কমলিকান্দর (বরিশাল)। জ্ঞানেন্দ্রবাবু মীরকাদিম বন্দরের ধনী ব্যবসায়ী এবং শ্রীগৌরদাস নট্টও ধনী ব্যবসায়ী। উভয়ের গৃহেই নদীয়া-বুগল শ্রীবিগ্রহ সেবিত হন। ইতিপূর্বে ইহাদিগকে বৈষ্ণব-সেবার জন্য অকাতরে ধরচ করিতে বহুবার দেখিয়াছি। শ্রীশ্রীমাদাদা কমিটিতে যোগদান করিয়া তাঁহারা স্বীয় উদার মনের সঠিক পরিচয় দিলেন।

মোরেলগঞ্জের সংবাদে প্রকাশ যে প্রিয়াঙ্গী উৎসব ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত জয়ন্তী উৎসব পনের দিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু স্থানীয় অধিবাসিগণের অহুরোধে বুড়ি দিন ধরিয়া প্রভাত-কীর্তন, পাঠ ও বক্তৃতা চলে ও শ্রীপঞ্চমী তিথিতে মহাসমারোহে অষ্টপ্রহর নাম-সংকীর্তন

হয়। প্রায় এক হাজার ভক্ত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। লাহা ষ্টেটের ম্যানেজার ও শ্রীপ্রিয়নাথ সেন শুণ্ড মহাশয়দ্বয়ের উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় সমস্ত উৎসব সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কতিপয় স্থানীয় মুসলমানও এই উৎসবে যোগদান করেন। বিশ দিন যাবৎ মোরেলগঞ্জ ও নিকটবর্তী গ্রামগুলি গৌরবিশুপ্রিয়া নামের ধ্বনিতে মুখরিত থাকে। এইভাবে প্রায় ৫০টা কেন্দ্রে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

মাঘী সপ্তমী শ্রীঅর্ধৈত প্রভুর জন্মোৎসব। এই তিথিতে পাইকপাড়া (ত্রিপুরা) শ্রীভুবনমোহন মজুমদার মহাশয়ের রাঢ়ীতে অষ্টপ্রহর নাম-সংকীর্তন হইয়াছে ও উপস্থিত সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই তিথিতে নোয়াখালিতে শ্রীল রামদাস বাবাজিউর কৃপাপ্রাপ্ত জনৈক ভক্তের গৃহে অষ্টপ্রহর কীর্তন হইয়াছে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অবতরণ তিথিতে চট্টগ্রামের জমিদার শ্রীঅমরকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়ের ঢাকা ৩৭১ নং রজনী চৌধুরী বাগের বাসা বাটাতে অষ্টপ্রহর নাম-সংকীর্তন হইয়াছে। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করেন। অমরবাবুর সুযোগ্য পুত্রদ্বয় শ্রীবিনোদবিহারী ও শ্রীকুমুদবিহারী ভক্তবৃন্দের সেবার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। এই তিথিতে শ্রীশ্রীমাদাদার প্রধান কার্যালয় ইলুহারে প্রিয়াঙ্গী-বল্লভের শ্রীঅঙ্গনে অষ্টপ্রহর নাম-কীর্তন হয়।

অপর বৎসরের তুলনায় এই বৎসর শ্রীশ্রীমাদাদার গ্রাহক সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার গ্রাহকবৃন্দকে অহুরোধ করা বাইতেছে, তাঁহারা যেন চিঠিপত্র লিখিবার বা সাহায্য পাঠাইবার কালে স্বীয় ক্রমিক নম্বর লিখিয়া দেন। তাহা হইলে জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে হইলে কোন পক্ষেরই দেরী হইবে না। ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যার রূপারের উপর ক্রমিক নম্বর থাকিবে। কৃপা করিয়া নম্বরটা স্মরণ রাখিবেন।

আর একটা নিবেদন। শ্রীপত্রিকা কলিকাতায় ছাপা হয় ও সেখান হইতেই ডাকে পাঠান হয়। সুষ্ঠু পরিচালনার

কত ২২১১২ ট্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোডে, (পুরাতন হাওড়া পুলের বাম পার্শ্বে) শাখা অফিস খোলা হইয়াছে। শ্রীপত্রিকা সম্পর্কে যাবতীয় চিঠিপত্র ও টাকা উক্ত ঠিকানায় পাঠাইলে কার্যের সুবিধা হয়। ইলুহার প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় প্রেরিত ধবরাধবরগুলি ইদানিং ডাকের বিলম্ব হেতু আমাদের নিকট বিলম্বে পৌঁছে। তদ্রূপ অনেক ধবরই সময়মত না পাওয়ায় অপ্রকাশিত থাকে এবং কোন স্ফাতব্য বিষয় জানিতে দেবী হয়। উৎসব তারিখ ও স্থানের নাম ও উল্লেখাগণের নাম, যে মাসে উৎসব হইবে তৎপূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইলে শ্রীপত্রিকায় উহা আনন্দের সহিত প্রকাশ করা হয়। দেবী হইয়া গেলে উভয় পক্ষেরই অনুবিধা।

গত সংখ্যায় অনুরোধ জানান হইয়াছে যে, কেহ যেন শ্রীপত্রিকা-বাবদ কোন অর্থ আমাদের কার্যালয় ব্যতিরেকে অপর কাহাকেও না দেন। দেখা যাইতেছে যে, অনেকেই শ্রীপত্রিকার নাম করিয়া অর্থ গ্রহণ করেন, অথচ উহা শ্রীশ্রীমা-দাদার নিকট পৌছায় না। ইহাতে সকল পক্ষেরই ক্ষতি। সুতরাং আমরা আবার বলিতেছি, গ্রাহকবৃন্দ যেন স্বীয় সাহায্য কলিকাতার ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন। দুইজন একযোগে মণিঅর্ডার করিতে পারেন; সে ক্ষেত্রে উভয়ের নাম ঠিকানা জানাইবেন। অগত্যা ইলুহার কার্যালয়ে বা কমিটির যে কোন সভার নিকট দিতে পারেন।

* * *

১৭ই ফাল্গুন ইং ১লা মার্চ ইলুহার, বরিশাল, প্রিয়াজী-

বল্লভের শ্রীঅঙ্গনে অষ্টপ্রহর নাম-সংকীর্তন চলিবে। এই তিথিতে শ্রীল বিধুভূষণ সরকার মহাশয়ের পত্নী গৌরধামে গমন করেন। বহু গৌরভক্ত তাঁহাকে মাতৃস্বরূপিনী জ্ঞান করিতেন। প্রতিবৎসর এই শুক্লা সপ্তমী তিথিতে বাংলার নানা জেলা হইতে গৌরগতার গুণমুগ্ধ সন্তানগণ মিলিত হইয়া অষ্টপ্রহর কীর্তন করেন। হাজারে হাজারে লোক মহাপ্রসাদ পান। এই বৎসরও নোয়াখালি, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা, সিলেট, ফরিদপুর ইত্যাদি বহু জিলা হইতে শত শত গৌরভক্ত উক্ত উৎসবে যোগদান করিবেন।

* * *

নোয়াখালী হইতে শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র রায় মহাশয় জানাইতেছেন, “..... শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শুভ আবির্ভাব তিথি ত্রয়োদশীতে উষা-কীর্তনের পরে ‘বিষ্ণুপ্রিয়ায় প্রাণ আমার গৌরাজ হে’ নাম-কীর্তন হইতে থাকে খুব হৃদয়স্পর্শী মধুর সুরে। তক্ত-সংখ্যা বেশী ছিল না, কিন্তু ক্রমে লোক জুটিতে থাকে—মেয়েরাই বেশী। পরে চারিপ্রহর শ্রীনাম-কীর্তনে বেশ আনন্দের কাটিয়া গেল। দ্বিপ্রহরের কিছু সময় কেবল মেয়েরাই কীর্তন করে;—তরুর আলগতো তাহাও বেশ সুন্দর হইয়াছে। সন্ধ্যার পরে কীর্তন সমাপনান্তে আরতী কীর্তন ও পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব (শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে) গাহিয়া রাত্রি দশটায় কীর্তন বন্ধ হয়।” সমালোচনা নিম্নয়োজন।

শ্রীশ্রীমা-দাদা কমিটি

যুগ্ম সভাপতি

গৌরপ্রেমসুধাসিন্ধু শ্রীমণ্ডলকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ
সাহিত্যভূষণ শ্রীবিধুভূষণ সরকার বি-এ, বিজ্ঞাবিনোদ

সভ্যবৃন্দ

শ্রীকিরণকুমার সেন রায়চৌধুরী, জমিদার, বাসগু, বরিশাল
রায় সাহেব জগন্নাথ রায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা
শ্রীমোলীভূষণ দত্ত বি-এ, ডিষ্ট্রিক্ট কাননগো, চট্টগ্রাম
শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়, নাজীর, নোয়াখালী
শ্রীবিধুভূষণ মজুমদার, চাঁদপুর, ত্রিপুরা
শ্রীবিনোদবিহারী চৌধুরী বি-এল, জমিদার

৩৭১২ রজনী চৌধুরী বাগ, গ্যাণ্ডারিয়া, ঢাকা

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বিশ্বাস, তালুকদার, রঘুনাথপুর, বরিশাল
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল কুণ্ড, মার্চেন্ট, মীরকাদিম, ঢাকা
শ্রীগৌরদাস নট্ট, মার্চেন্ট, কলমিকান্দর, বরিশাল
শ্রীরসিক চন্দ্র দে, মার্চেন্ট, কাউখালী, বরিশাল
শ্রীসুধাংশুভূষণ সরকার, কলিকাতা

কর্ম বিভাগ

প্রচার : প্রামাণ্য প্রচার
শ্রীকিরণকুমার সেন রায়চৌধুরী শ্রীবিধু ভূষণ মজুমদার
ও
শ্রীবিনোদবিহারী চৌধুরী শ্রীরসিকচন্দ্র দে

প্রবন্ধ

শ্রীমোলীভূষণ দত্ত

মন্ত্রণা সংগ্রহ
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বিশ্বাস ডক্টর অক্ষয়কুমার ভৌমিক

অর্থ

রায় সাহেব জগৎ চন্দ্র রায়

শ্রীগৌরদাস নট্ট

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল কুণ্ড

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়

পরিচালনা :—শ্রীসুধাংশুভূষণ সরকার

কলিকাতা শাখা অফিস

প্রধান কার্যালয়

ইলুহার, বরিশাল

শাখা কার্যালয়

২২১১২ ষ্ট্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা।

বৈষ্ণব গ্রন্থের বিজয় বৈজয়ন্তী।

সাহিত্যভূষণ শ্রীবিধুভূষণ সরকার, বি-এ, বিভাবিনোদ সম্পাদিত

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

(আদিখণ্ড)

মহাপ্রভুর লীলায়তের জীবন্ত আলেখ্য। ভাব ও ভাষার প্রাণবন্ত রূপ।

ইহা পাঠ করিতে করিতে নিতান্ত বহিস্মুখী শুদ্ধ হৃদয়ও নিগুঢ় রসের সন্ধান পাইবেন।

আনন্দাশ্রু বর্ষণে মনের মালিগা কাটিয়া যাইবে।

মূল্য—৭ টাকা (ডাকমাণ্ডুল স্বতন্ত্র)

অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন :—

The greatest classic of the Gaudia School of Vaishnavism as inantiated by Lord Chaitanya is Sri Sri Chaitanya Charitamrita. In fact it is the Bible of the School. Numerous editions of the celebrated work have come out, but none has delighted and moved us more than the present one. Srejut Sarker himself is a "Sadhaka" and is thus able to provide us illuminations and interpretations which we seldom get elsewhere. To men groping in the dark, he offers guidance. We have no doubt that the Commentator will be long remembered by his work.

সুগান্ধর বলেন :—

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বাংলা ভাষায় একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। দীর্ঘকাল হইতে বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ ইহার তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া আসিতেছেন, বহু উল্লেখযোগ্য সংস্করণও এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সুবিশাল সাহিত্যের মালায় এই সংস্করণটি নূতন সম্পদরূপে গণ্য হইবে এবং এই গ্রন্থের পূর্ববর্তি খণ্ডগুলি প্রকাশিত হইলে, সমগ্রভাবে ইহা একটি অদ্বিতীয় প্রামাণিক সংস্করণই হইবে। মূল শ্লোকগুলির সহিত তাহাদের অর্থ, ব্যাখ্যা ও টকা টিপ্পনী ইহাতে যে ভাবে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে তাহা একাধারে পাণ্ডিত্য ও রসায়ত্ত্বের আদর্শ স্বরূপ। ভূগিকায় প্রেম ও ভক্তি-তত্ত্বের যে বিপুল বিশ্লেষণ স্থান পাইয়াছে, রচনা হিসাবে তাহা যেমন মনোজ্ঞ, আলোচনা হিসাবেও তেমনি গভীরতার পরিচায়ক। প্রেম ও ভক্তি পরায়ণ বৈষ্ণবগণ তথা জিজ্ঞাসু পাঠকগণ সকলেই ইহা পাঠে সন্নিবেশ উপকৃত হইবেন। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীশ্রীমা-দাদা কার্যালয়—ইলুহার, বরিশাল।

শ্রীশ্রীমা-দাদা শাখা কার্যালয়—২২১২ ষ্ট্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা।

মহেশ লাইব্রেরী—২১১ শ্রামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বীণা লাইব্রেরী—১৫ নং কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা।

জয় শচীন্দ্রনন্দ জয় গৌরহরি ।
বিকৃপ্রিয়র প্রাণনাথ নদীয়াবিহারী ॥

শ্রীঅষ্টৈতপ্রভু কহিতেছেন :—

শুন ভাই সব, এককর সমবায় ।
মুখভরি গাই আজি শ্রীচৈতন্য রায় ॥
আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাই ।
সর্ব অবতারময় চৈতন্য গোসাঞি ॥

শ্রীশ্রীমা-দাদা

সূচীপত্র

সার্কজনীন প্রেমপ্রচারক, একমাত্র-মাসিক পত্রিকা

—বৈশাখ—

৪৬০ গৌরান্দ, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ ।

প্রধান কার্যালয় :

ইলুহার, বরিশাল (বেঙ্গল) ।

কলিকাতা শাখা :

২২১-২, ষ্ট্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড ।

১। বৈশাখের অবদান	... ৬০১
২। বৃগধর্ম্ম শ্রীনাম-সংকীর্তন	... ৬০২
৩। শ্রীচৈতন্যষ্টক	... ৬০৬
৪। সাধু-অন্বেষণে	... ৬০৭
৫। বিষ্ণুপ্রিয়া নাথ (কবিতা)	... ৬০৮
৬। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান গঙ্গাগর্ভে লুপ্ত	... ৬০৯
৭। হেলোকুলিত খেদয়া বিশদয়া প্রোখীলদামোদয়া (কবিতা)	... ৬০৯
৮। বৈশাখী-পূর্ণিমা	... ৬১০
৯। শিরোমণি হরিশোহনের জীবন-কথার এক পরিচ্ছেদ	... ৬১৩
১০। শ্রীমতী ও কাঞ্চনা (কবিতা)	... ৬১৩
১১। পত্র-সংগ্রহ	... ৬১৪
১২। শ্রীশ্রীআনন্দমুন্দর	... ৬১৭
১৩। বার্তাবহ	... ৬১৯

বার্ষিক—৪

প্রতি সংখ্যা—১০



বৃগদসম্পাদক—

গৌরপ্রেমসুধাসিদ্ধ শ্রীমণালকান্তি বোষ, ভক্তিভূষণ ।

সাহিত্যভূষণ শ্রীবিধুভূষণ সরকার, বি-এ., বিজ্ঞাবিনোদ ।

উন্ম-আ-স্নিও
(অশোকক স্পাউণ্ড
ঘটিত)

যাবতীয় শ্রীরোগে অব্যর্থ



হ্যারোলিন
সুবাসিত কেশ তৈল
(অলিভ অয়েল ঘটিত)

আর ম্যালেরিয়া হয় না।

“ম্যালোরিন”

ম্যালেরিয়া ও সর্বপ্রকার জ্বরের পরীক্ষিত অমোঘ ঔষধ।

স্নাত

সকল প্রকার বাত বেদনায় একমাত্র প্রতিষেধক।

(প্রেটি ক্যামিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ—কলিকাতা)

আমাদের যাবতীয় ঔষধ ড্রাগকন্ট্রোল অর্ডারে পড়ে না সুতরাং

ইহা বিক্রয় করিতে লাইসেন্স লাগে না।

সোল এজেন্ট :- দাদা এণ্ড কোং

২২১-২ ষ্ট্রাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা।

শ্রীগুরু ইলেকট্রোপ্লেটিং ফাউণ্ড্রি

২২নং বাহাদুরপুর লেন।

কলিদাবাদ, ঢাকা।

ছুরী, কাঁটা, চামচ ইত্যাদির বিশ্বস্ত প্রস্তুতকারক।

যাবতীয় ইলেকট্রোপ্লেটিংএর কাজ করা হয়।

যুদ্ধের দরুণ অধিক মূল্য ধরা হয় নাই।

মফঃস্বলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য

প্রতিষ্ঠান। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীমা-দাদা

“মাতৃশ্রের ভ্রাতৃশ্রের উজ্জল আলোকে ।
নদীয়ার প্রেমধার বহুক ভুলোকে ॥”

২য় বর্ষ	৪৬০ গৌরাক্ষ	চৈত্র
১২শ সংখ্যা	মার্চ, ১৯৪৪	১৩৫০ সাল ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বৈভবমধুরিমা ।

শ্রীতরুণতা রায়

(নোয়াখালি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত জয়ন্তী উৎসবে পঠিত)

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি গভীর গবেষণাপূর্ণ দার্শনিক ওত্থবিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া স্মৃতিগণ বলেন বটে, কিন্তু আমাদের মনে হয় শ্রীগৌরাক্ষ যেমন সর্বোৎকর্ষ—জ্ঞানী অজ্ঞান, যোগী যোগ-বিহীন, বিদ্বান মুখ, ভক্ত অভক্ত, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, পুরুষ নারী সকলেরই ঈশ্বর ; তেমনই এই সর্বোৎকর্ষের চরিতামৃত বর্ণনায়, গ্রন্থখানিও মুখ পণ্ডিত সকলের জন্মই অভিপ্রেত । সেই সাহসেই আমার এ সম্বন্ধে দুই এক কথা আলোচনা করিতে ভরসা হইল । একটা বড় ভরসার কথা গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

যদি নাহি বুঝে কেহ শুনিতে শুনিতে সেহ

কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত ।

কৃষ্ণে উপজীব্যে প্রীতি বুঝিবে রসের রীতি

শুনিলেই হয় বড় হিত ॥

এই ভরসায় বস্তুশক্তির উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই মহাগ্রন্থখানি পড়ি ও শুনি ।

‘দর্শন’ শব্দের সহজ অর্থ আমরা বুঝি ‘দেখা’ । তত্ত্ব-বিচার যাহাই হউক, শ্রীগৌরাক্ষ কি বস্তু, তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধ কি ইত্যাদি দর্শন করিতে গ্রন্থখানি আমাদের কাছে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন । বাসুদেব সার্কভৌম ছিলেন স্মার-দর্শন বা তর্ক-শাস্ত্রের বড় পণ্ডিত । তাঁহার মত অত বড় পণ্ডিত ভারতে তখন ছিলেন না । তিনি প্রভুর কাছে প্রথমতঃ কত ওত্থবিচার করিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে প্রভুকে বড় ভূজ্য মুর্তিতে দর্শন করিলেন—অর্থাৎ তিনি

দেখিলেন মহাপ্রভুই শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, তিনিই শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র গৌরানন্দ্রের স্বয়ং ভগবান । আর তখনই পণ্ডিত সার্কভৌম একশত শ্লোকে “প্রণমামি তং শ্রীশচী-তনয়ং” বলিয়া স্তব করিলেন । বাসুদেবের সকল পাণ্ডিত্য গৌরভজনে পরিসমাপ্ত হইল । বাসুদেব সার্কভৌমের এই দর্শন বা দেখা আমাদের কাছে অনুপ্রাণিত করিয়াছে—এই বাসুদেবের কৃপায় আমরাও গৌর-বস্তুটিকে চিনিতে পারিলাম । গ্রন্থকার আমাদের কাছে ইহা বলিলেন ।

আবার অন্তর গ্রন্থকার বলিলেন—কাশীতে সরস্বতী প্রকাশানন্দ ছিলেন বেদান্তের অদ্বিতীয় পণ্ডিত । তিনি ছিলেন সন্ন্যাসীর রাজা—দশ সহস্র সন্ন্যাসীর গুরু । জীবে ও ব্রহ্মে অভেদ জ্ঞান ছিল তাঁহার সাধনা । ভক্তিবাদের তিনি ছিলেন বিরোধী,—ভক্তি কাহাকে করিবেন ? নিজেকেই ত তিনি ভগবান্ ভাবিতেন ! শঙ্করাচার্যের রূত বেদান্ত-ভাষ্যের অনুগামী হইয়াও বটে, এবং সন্ন্যাসী হইলেই সে নারায়ণ হয়, এই বিবেচনায় ও সন্ন্যাসি-সমাজের এই নিয়মালুসারেও বটে । এই মুখস্থ কথায়ই তিনি নিজেকে নারায়ণ ভাবিতেন । তলাইয়া দেখেন নাই তিনি কতদূর নারায়ণ । বেদান্ত-দর্শনের বিচারই ছিল তাঁহার আশ্রয় । কিন্তু সত্য সত্যই যখন তিনি দর্শন করিলেন শ্রীগৌরানন্দ্রস্বয়ং প্রকৃত চতুর্ভূজ নারায়ণ, তখন তাঁহার সকল মোহ, সকল অভিমান কাটিয়া গেল । প্রকাশানন্দ শিষ্যগণ লইয়া বুঝিলেন—একমাত্র শ্রীগৌরাক্ষই নারায়ণ, আর কেহ পূর্ণনারায়ণ হইতে পারেন না,

আর সকলেই পূর্ণভগবান্ শ্রীগৌরানন্দন্বরের অংশমাত্র। প্রকাশানন্দের এই দর্শন বা দেখার ফলে প্রকাশানন্দ নিজেও যেমন গৌরনাগরবরের ভজন করিতে লাগিলেন, অদ্বৈত-জ্ঞানান্ভিমানী সন্ন্যাসীদের মধ্যেও তেমনই ভক্তির তরঙ্গ সমুথিত হইল। প্রকাশানন্দের এই দর্শন বা দেখার ফল আমরাও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের রূপায় পাইলাম। আমরা ভাবিলাম শিরোবেষ্টনে নাসিকা স্পর্শ করায় লাভ কি? দার্শনিক তত্ত্ব বিচার করিতে যাইয়া অবধা সময় নষ্ট করা নিম্নয়োজন। গৌরই যখন সাধ্যবস্ত, তাঁহার ভজন যখন সকল তত্ত্বের, সকল বিচারের চরম-সীমা, তখন সোজাসুজি তাঁকে ভজন করাই বুদ্ধিমানের কার্য; প্রকাশানন্দের দর্শন ও দেখায় আমাদেরকে ইহা শিখাইল।

এইরূপে কোথায় মাদ্রাজে গোদাবরী তীরে রাজ-মহেন্দ্রীর শাসনকর্তা দর্শন করিলেন বা দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বাহিরে সন্ন্যাসী বটেন, কিন্তু বস্ততঃ তিনি নিত্যমিলিত গৌরবিকুপ্রিয়া-বৃন্দ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ইহা এমনই সুনিপুনভাবে ঐকান্তিকতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন, যে রায় রামানন্দের ঐরূপ দর্শনে আমাদেরও গৌরকে ঐ বৃন্দ-রূপে দর্শন করিতে সহায়তা করিয়াছে—ইহাতে তর্ক বা বাদ-বিতণ্ডার অবকাশ নাই। রামানন্দ রায় বুদ্ধি বিচার ও পূর্ব পূর্ব শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা ভক্তির বিভিন্ন স্তরের কথা কহিলেন, বধা—(১) স্বধর্ম আচরণ; (২) সমস্ত কর্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ; (৩) স্বধর্ম ত্যাগ, অর্থাৎ সকল কর্মত্যাগ; (৪) জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, (৫) জ্ঞানশূন্য ভক্তি, অর্থাৎ বিচার না করিয়া নির্বিচারে স্বাভাবিক ভক্তি,—যেমন গুত্র পিতাকে ভক্তি করে; (৬) প্রেমের সহিত ভক্তি; (৭) দাস্ত প্রেম,—যেমন ভৃত্য প্রভুকে ভালবাসে তেমন ধারা; (৮) সখ্য প্রেম,—যেমন শ্রীদাম কৃষ্ণকে ভালবাসিয়াছেন; (৯) বাৎসল্য প্রেম,—যেমন মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন; (১০) কান্ধা প্রেম,—যেমন সত্যভামা রুক্মিণী প্রভৃতি কৃষ্ণকে ভালবাসিয়াছেন; (১১) রাধা প্রেম,—যেমন শ্রীরাধা দেহ গেহ, চিত্ত বিস্ত, সংসার, কুল শীল, মান লাজ ভয় সকল পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণগত-প্রাণ হইরাছেন। ইহার এক একটি স্তর ব্যাখ্যা করিতেই পণ্ডিতদিগের বহু গবেষণা ও

শাস্ত্র-কথার প্রয়োজন হয়। এই সকল স্তরের পর রামরায় গৌরবিকুপ্রিয়া-বৃন্দ দর্শন করিলেন। সকল বুদ্ধি বিবেচনা, সকল শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য-বিচারের পর, প্রেমভক্তির সাধন-রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের পর, সর্বশেষ দর্শন হইল—নদীয়ার নিত্য-বৃন্দ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রূপায় আমরা রামানন্দের এই দর্শন-বৃত্তান্ত পাইলাম। সুতরাং রামরায়ের এই দর্শন বা দেখার ফলে আমরাও এই গৌরবিকুপ্রিয়া-ভজনের পরম সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

এইরূপে বহু পণ্ডিত প্রামাণ্য ব্যক্তি মহাপ্রভুকে যে স্বরূপে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন, তাহাই হইল সর্বাপেক্ষা বড় দর্শন,—এ দর্শন দার্শনিক তত্ত্ববিচারের অতি উর্দ্ধে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বড় বড় জ্ঞানগর্ভ কথাও বলিয়াছেন বটে, আবার এই সহজ দর্শনের কথাও স্মরণিত ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, সে ভাষা সকলের বোধগম্য, সে ভাব সকলেরই প্রাণস্পর্শী। কানীমিশ্র ছিলেন মহারাজা প্রতাপ-রত্নের গুরু। জগন্নাথের সেবা সুচারুরূপে হয় কিনা তাহা তিনি পর্যবেক্ষণ করিতেন। দোদীপ্তপ্রতাপ স্বাধীন নৃপতি উড়িষ্যা-রাজ্যের গুরু হইয়া এবং পুরীতে সমাগত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকের শ্রদ্ধা ও সম্মানার্থ হইয়াও মহাপ্রভুর পদতলে পড়িলেন, এবং প্রভুকে চতুর্ভূজ-মুর্ত্তি স্বরূপে দর্শন করিলেন।

রথাগ্রে সাত সস্ত্রদায় কীর্তন করিতেছিলেন। রাজা প্রতাপরত্ন দর্শন করিলেন প্রভু “এককালে সাত ঠাকুর করেন বিলাস”। ইহার পর আবার প্রভু বিশ্রাম করিতে ছিলেন। তখন রাজা প্রভুর পাদসেবা করিতে করিতে সুকণ্ঠে রাসপঞ্চাখ্যায়ের ‘তব কথামৃত’ শ্লোক গান করিয়া প্রভুকে শুনাইতেছিলেন। তখন প্রভু তাঁহাকে ঐশ্বর্য দেখাইলেন। রাজা প্রভুকে ষড়ভূজমূর্ত্তিরূপে দর্শন কবিলেন—উর্দ্ধ দুই বাহুতে ধনুর্ধার, মধ্যে বকঃশুলের কাছে দুই বাহু বংশী বাজাইতে রত, অন্ত দুই বাহু নৃত্যভঙ্গী প্রকাশ করিতেছিল।

এইরূপ বহু দর্শন বা দেখার কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বর্ণনা করিয়াছেন,—সেই দর্শনই সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন। সুতরাং এই গ্রন্থখানি যে কেবল স্বয়ীজনের জন্য তাহা নহে। সর্বোচ্চর শ্রীগৌরানন্দন্বরের কথায়—সকলেরই তুল্য অধিকার।

গৌরভঞ্জে ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মুখ, ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই তুল্য অধিকারী। এই মহাগ্রন্থে এইরূপ পরম আশ্বাসের বাণী আমরা পাইতেছি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ নারীকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। মানব-সমাজ দুইটা জাতি লইয়া গঠিত—পুরুষজাতি ও নারীজাতি। উভয়ের তুল্য প্রয়োজন। নারীজাতি মাতৃজাতি। মাতৃস্নেহের পুত্র মন্যাকিনী ধারায় জগতখানি সম্ভাবিত রহিয়াছে। যে নারীজাতির কথা মনু বলিয়াছেন “নার্য্যস্ব যত্র পূজ্যন্তে, প্রীয়ন্তে তত্র দেবতাঃ”। নারীগণ যেখানে পূজিত হন, দেবতাগণ সকলেই সেখানে প্রীত থাকেন। যে নারীগণ নারায়ণীর অংশভূতা, জানিনা সেই নারী সম্বন্ধে অবশুত দত্তাত্রেয় কেন তাক্ষিল্যভাবে বলিলেন— “কেনাপি নির্মিতা নারী” ইত্যাদি, জানিনা সেই নারীকে মহাজন-পদবীতে আরাঢ় কোন কোন ব্যক্তি বাধিনী বলিয়া পরিহারের কথা কহিলেন, জানিনা কোন্ দৈব-চুর্কিপাকে সেই নারীকে শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক প্রবর্তিত সন্ন্যাসীর দল পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া সন্ন্যাসধর্ম্মদ্বারা সোনার সংসারকে শ্মশানে বা মরুভূমিতে পরিণত করিতে উত্তত হইতেছিলেন,—সেই শ্মশানে ফুলের বাগান স্বপ্নন করিতে শ্রীগৌরানন্দমন্দের আসিলেন। ইহাই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-গ্রন্থ বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীরাধার অমুগত হইয়া সখী-ভাবে ভক্তনের কথা অনেকে বলেন বটে, কিন্তু মাতৃভাবে উদ্বেষ না হইলে সখীভাবে ভজন সম্পূর্ণ অসম্ভব, সে কেবল আকাশকুসুমের স্নায়-অলীক কল্পনা মাত্র। এই জন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীরাধা সম্বন্ধে বলিলেন যে তিনি সর্বপূজ্য পরম দেবতা।

সর্বপালিকা সর্ব জগতের মাতা ॥

শ্রীরাধার এই পরিপূর্ণ মাতৃত্ব গৌরলীলায় দেবী বিষ্ণু-প্রিয়াতে পরিপূর্ণ প্রকাশিত। যিনি মান বা পরিমাণ করেন তিনি মাতা। পিতা পরিবার পরিজনের জন্ত দ্রব্যাদি অর্জন করিয়া আনেন, মাতা তাহা পাত্রাহুরূপ পরিমাণ করিয়া বণ্টন করেন, তাহাতেই পরিবার সুখে সমুদ্র প্রাপ্তি-

পালিত হয়। মাতা কখনও নিজের ভোগবাঞ্ছা করেন না। শ্রীগৌরানন্দ মহাপ্রভু বিশ্ব-পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্ত হরিনামসংকীর্তন ও প্রেম অর্পণ করিয়া গচ্ছিত রাখিলেন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট,—দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার উপর বটনের ভার রহিল। এই হরিনাম ও প্রেম জগদ্ব্যবহিতরণ করিয়া বিশ্বপরিবার পালন করিবার জন্ত দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া নিজের সুখবাঞ্ছার দিকে বিন্দুমাত্র না চাহিয়া অশেষ রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের ঘনবিগ্রহ স্বীয় প্রাণবল্লভ শ্রীগৌরানন্দমন্দেরকে জগতে বিলাইয়া দিলেন। যে সন্ন্যাসিগণ সংসারখানি শ্মশানে পরিণত করিতেছিলেন, প্রেম-ভক্তির বিরোধী সেই সন্ন্যাসি-বৃন্দকে আশ্বাস করিতে হইবে, প্রেমভক্তিসমুদায় আশ্বাদ পাইলে সন্ন্যাসিগণ নাচিয়া উঠিবে, তাহা হইলে সমস্ত বিশ্বই নাচিয়া উঠিবে। এই জন্ত সেই সন্ন্যাসীর দলের মধ্যে শ্রীমতী স্বীয় প্রাণনাথকে সন্ন্যাসীর সাজে পাঠাইলেন। নিজে যে বিরহের দাবদাহে সতত দগ্ধ হইবেন, বৃদ্ধা মাতা যে এই বিরহের আগুণে জলিয়া পুড়িয়া মরিবেন,—এ কথা তাঁহার ভাবিবার অবসর হইল না। এই ভাবী বিরহদুঃখের কথা কখন মনে উদিত হইলেও বিশ্বপরিবারের পালনের চিন্তা তাঁহার এতই প্রবল হইয়াছিল, যে তাহার কাছে স্বীয় দুঃখের চিন্তা স্থান পাইলনা। প্রেমে বিশ্ব ভরিয়া মহাপ্রভুর বিশ্বস্তর নামের সার্বকতা করিলেন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। আত্মার প্রকৃত ধাতু হরিনাম ও প্রেম। এই ধাতু বিতরণ করিতে শ্রীমতী গৌরানন্দমন্দের পূর্ণদায় হইয়া প্রকৃতই সর্বপালিকা জগতের মাতা হইলেন—অথবা তিনি মাতা বলিয়াই এই মহৎ কার্য্যদ্বারা জীবের কল্যাণ সাধন করিলেন। নারীর পরিপূর্ণ আদর্শ এই দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। জগতের ইতিহাসে এরূপ আদর্শ আর কখন প্রকাশিত হয় নাই। আত্মন আমরা বিষ্ণুপ্রিয়ার জয়ধ্বনি দিয়া, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার ভজন পূজন করিয়া তাঁহারই রূপাশঙ্কিতে নারীজাতির বিশ্বপ্রসারী মাতৃত্ব স্বপ্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হই।

জয়তু সর্বতো দেবী গৌরানন্দপ্রাণবল্লভা।

রাজরাজেশ্বরী গৌরী জীবানাং ক্ষেমকারিণী ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বৈভবমধুরিমা ।

(ঢাকা জয়ন্তীউৎসবে পঠিত)

আজ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের জয়ন্তী উৎসব হচ্ছে । জয়ন্তী উৎসব আর কিছুই নয়, কাহারো গুণবাশির জয় জয়কার করা, এবং সেই গুণবাশির আলোচনা দ্বারা নিজের জীবনে উহার অনুশীলন ক'রতে সাধু চেষ্টা করা । তাতে নিজেদের জীবনও ধন্য হয়, অপরকেও অনুপ্রেরণা দিয়ে ধন্য কবে । এ পর্য্যন্ত মানুষের জয়ন্তী শুনে আসছি, সে ভাল বটে, মানুষ দোষনিম্মুক্ত নয়, গুণবাশিদ্বারা সে দোষ ঢাকা পড়ে যায়, আর সেই দুর্বলতার দিকে নৃষ্টি পড়ে না । কিন্তু এই মহাগ্রন্থখানি—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি নিখুঁত—দোষের লেশাভাস নেই—শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভুর অমৃতময়ী কাহিনী জীবের কল্যাণের জন্য শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী এই মহাগ্রন্থে সুললিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন । এ হেন গ্রন্থখানির জয়ন্তীউৎসব যে কত আদরের, কত আনন্দের, কত মহাপ্রাণতার—তা একমুখে ব'লে শেষ করা যায় না । এ বাক্তী শুনে প্রাণটা আনন্দে নেচে উঠেছে । বৈষ্ণব-জগতে কেন, সমগ্র জগতে এ একটা নতুন তরঙ্গ সৃজন ক'রবে, যাতে ক'রে বিশাল বিশ্বের মহাকল্যাণ সাধিত হবে—একটা নতুন জগৎ গ'ড়ে উঠবে—মানবজীবনের প্রধান সম্পদ যে প্রেম, তার অধিকাবী হবে—হিংসাধ্বংস কলুষভরা পুরাণো জগৎ অতীতের গর্ভে ডুবে যাবে, চিরবিদায় গ্রহণ করবে । শ্রীগোরাঙ্গ-স্ববক-সমিতির সাধু প্রচেষ্টায় আজ এই একটা বস্তুর—ঐ মহামূল্য গ্রন্থের জয়ন্তী উৎসব পড়ন হ'ল । শ্রীগোরাঙ্গ-স্ববক-সমিতির কাছে আজ একজ্ঞ আনন্দ চিরঞ্জয়ী । এই নবীন-বস্তুর চির-নবীনতা উত্তরোত্তর বেড়ে যাক্, এরই আব'হাওয়ায় মানব-জীবন চিরনবনবায়মান হোক্, শ্রীভগবানের পাদপদ্মে এই আমাদের কায়মনে প্রার্থনা ; তাঁর শ্রীচরণে যুক্তকরে আমাদের আর একটা প্রার্থনা জানাচ্ছি—এই স্ববক-সমিতি যে বস্তুর নাম তাঁদের সমিতির সঙ্গে যুক্ত ক'রে কার্যক্ষেত্রে নেমেছেন, সেই অশেষ শক্তিশালী অপার করুণানিধান শ্রীগোরাঙ্গসুন্দর তাঁহাদিগকে বিশ্বপ্রসারী করুণ-শক্তি দান করুন, যেন এই শ্রীগোবাঙ্গ-স্ববক-সমিতি আত্ম-

প্লাবার দিকে তিলমাত্র দৃষ্টিপাত না ক'রে অব্যাহত ভাবে বিশ্বপরিবার গঠনকার্যে আত্মনিয়োগ করতে সমর্থ হন ।

দৈন্তবিনয়ের খনি শ্রীপাদ কবিরাজ-গোস্বামী গ্রন্থ-সমাপ্তিকালে বলেছেন—

আমি অতি ক্ষুদ্র জীব—পক্ষী রাক্ষা টুনী ।

সে বৈছে তৃষ্ণায় পিবে সমুদ্রের পানি ॥

তৈছে আমি এক কণ ছুঁইল লীলার ।

এই দৃষ্টান্তে জানিহ লীলার বিস্তার ॥

এ দৈন্তের কণাও আমার নেই । মানুষের ষথন সত্যি-কারের দৈন্ত বা দারিদ্র্যবোধ জন্মে, যখন সে সত্যি সত্যি বোঝে সে দীন দরিদ্র, তখন দরিদ্রতা মোচনের জন্য সজাগ চেষ্টা হয়, তখন ভগবদন্ত শক্তির যথোপযোগী প্রয়োগে দৈন্ত দশা দূর করে, অর্থবান্ হয়, সুখে সচ্ছন্দে থাকে । মানুষের প্রকৃত দৈন্ত প্রেমের । প্রেম পরম অর্থ—সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থ । অপবাণের অর্থ এবই অন্তর্বর্তী । এই বস্তুটা পেলে অপরাপর বস্তুর আনুমানিক প্রাপ্তি সহজ সূগম হ'য়ে যায় । এই বস্তু-বিষয়ক দৈন্তের বোধ জন্মিলে শতমুখী চেষ্টা স্বাভাবিক । তখন দৈন্ত থাকা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে । শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীই সে দৈন্তবোধ ছিল ব'লেই তিনি এই বিরাট বস্তু—সেই ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের সিদ্ধ শ্রীগৌরলীলা বর্ণনা করতে পেরেছেন । এ দৈন্তের আর একটা অপূর্ণ বিশেষত্ব এই, এ দৈন্ত আব ক্ষুরায় না ; মানুষ এ বস্তুটা যত পায় ততই চায় । আরো চায়, আরো চায় ; লীলামৃতসায়রে ডুব দিয়ে সুধারস পান করে, তখন সে 'হস্ততি চ মুহুমুহঃ ক্ৰস্যাতি চ পুনঃ পুনঃ' সেই সঙ্গেই সে আবার 'বাচতে চ মুহুমুহঃ বাচতে চ পুনঃ পুনঃ' । আর দাতাও কি বদান্ত ;—দদাতি চ মুহুমুহঃ দদাতি চ পুনঃ পুনঃ ; যেমনই দাতার ভাণ্ডার অক্ষুরন্ত, তেমনই গ্রহীতার পাত্র ক্রমেই বড় হ'তে আরো বড় হ'য়ে যায় । কবিরাজ গোস্বামীর ঐ দৈন্তবশতঃই তাঁর পাত্র-ধারণ যোগ্যতা অর্জন করেছে, আর শ্রীগোবাস্কের অক্ষুরন্ত ভাণ্ডার থেকে অপ্রাকৃত অপার্ণিব প্রেমসুধারস আশ্বাদন করতে

সামর্থ্যলাভ করেছে। সেই আশ্বাদনের অভিযাজ্ঞিই হচ্ছে এই বিরাট মহাগ্রন্থ। সেই দৈন্তের কণাও যদি আমাদের থাকত, তা হ'লে তাঁর পদধূলি শিরে নিয়ে তাঁরই আনুগত্যে তাঁর বর্ণিত বিষয়ের কথঞ্চিং আশ্বাদনে সমর্থ হ'তাম।

আমরা অনেক সময়ই বোঝার বোঝা বয়ে যাচ্ছি, সেই বোঝার ভারে ভারাক্রান্ত হ'য়ে ছু'য়ে পড়ছি, হুজু কুজু হ'য়েও বোঝার বোঝাটা ফেলে দিচ্ছি না; সেই অবস্থায়ই লম্বা চোড়া কথা ব'লে, সারগর্ভ কথায় অর্থহীন ব্যাখ্যা ক'রে জবের হাটে কেনা বেচা কচ্ছি, তাই দিয়েই উদর-বাত্তা চলছে, শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য দেহের পুষ্টি সাধনে নিলজ্জ চেষ্টা চলছে; সেই বোঝার ভারে যে আমরা আরো ছু'য়ে পড়ে অকর্মণ্য হ'য়ে যাচ্ছি, বুকটান ক'রে আটোপটকারে জগতের কাছে সত্য ঘোষণা করতে সাহস পাচ্ছি না! ব্রহ্মা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন—

জানন্ত এব জানন্ত কিং বহুজ্ঞা ন মে প্রভো।

মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥

তিনি বললেন—যারা তোমায় জানে ব'লে অভিমান করে, তারা জাহ্নুক; কিন্তু আমার আর বেশী কথায় কাজ কি প্রভু। আমি দেখছি—তোমার বৈভব আমার দেহ মন বাক্যের অগোচর।

ব্রহ্মা কখন বললেন এই কথা? না—কৃষ্ণ একজন গোপশিশু, সাধারণ গোপবালক, অপরাপর গোপবালক নিয়ে গরুর রাখালি করেন, বাঁশী বাজিয়ে গরু সংহত করেন, আব বনে জঙ্গলে কত রকম খেলাই খেলেন। দেখে শুনে ব্রহ্মার ভুল হ'য়ে গেল, তিনি ব্রজবালক ও গোবৎসাদি চুরি ক'রে নিলেন। কৃষ্ণের ত আর খেলার বিরাম নেই, সেই ব্রজবালক, সেই গোবৎসাদি নিয়ে তাঁর খেলা চলতে লাগল। ওদিকে ব্রহ্মার অপহৃত গোপবালকাদি রয়েছে, এদিকে কৃষ্ণের খেলার সাথী সেই গোপবালকই রয়েছে। ব্রহ্মার ভুল ভাঙ্গল। লজ্জায় কৃষ্ণের কাছে এসে অপরাধ ক্ষমা চাইলেন। সেই সময় তিনি ঐ কথা বললেন। ব্রহ্মারই ভুল, আর ক্ষুদ্রজীব আমাদের ত কথাই নেই। গৌর এলেন। শ্লোকে শাস্ত্রে আকৃতি প্রকৃতিতে বলে দেয় ইনি সেই স্বয়ং, বস্তু-স্বয়ং ভগবান কিন্তু সাধারণ বালকের ছায়া

তিনি গঙ্গার ঘাটে কত চঞ্চলতা কল্লেন, 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে সমবয়স্ক শিশুদের নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় কত রকমের খেলা খেললেন, মুরারিকে ভ্যান্টিচাইলেন, মুরারির পাতে প্রস্তাব করে দিলেন, আবার বড় হ'য়ে বিয়ে কল্লেন, পণ্ডিত কল্লেন, অর্থ রোজগার কল্লেন, আবার গয়া থেকে ফিরে এসে তুমুল কীর্তন আরম্ভ কল্লেন, লোককে কৃষ্ণভক্তনের উপদেশ দিলেন; নিজেও কৃষ্ণ বলে কাঁদলেন, অপরকেও কাঁদালেন; কৃষ্ণকেই পরতত্ত্ব স্থাপন কল্লেন—তার জ্ঞাত্য শ্রুতি স্মৃতি ভাগবতাদির কত শ্লোক প্রমাণ। গৌরান্দ পণ্ডিত 'ত ছিলেন, সেও ধে-সে পণ্ডিত নয়! অত বড় পণ্ডিত জগতে জন্মায়নি। মোটকথা গৌরান্দ ভক্তের মত আচরণ কল্লেন। এই সব দেখে শুনে পণ্ডিতাভিমानी ব্যক্তিগণ স্থির করে বসলেন গৌরান্দ সাধন, কৃষ্ণ সাধ্য। মুখে অবশ্য শ্লোক প্রমাণ দিতে কম্বর নেই যে গৌরান্দ স্বয়ং ভগবান, কলিযুগে তিনিই উপাশ্র। সেই সময়ের পণ্ডিত-গোস্থামিগণ ও পণ্ডিত-ভাগবতগণ বলে গেলেন গৌর-ভক্তনের কথা, তথাপি পরবর্তী লোকে গৌরান্দকে সাধন ও কৃষ্ণকে সাধ্য করে ভজন করতে লাগলেন, আর গোস্থামীর বংশধরগণও এই রকম ভজন দিতে লাগলেন। এতাদৃশ লোকের ভুল ভাঙ্গবার জন্তই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উদয় হ'ল। গ্রন্থখানির নাম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। গ্রন্থের প্রতিপাত্ত বিষয়ই হইলেন শ্রীগৌরান্দ। কৃষ্ণ-কথাও বিস্তার ক'রে গ্রন্থে বলা হয়েছে বটে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য গ্রন্থকার নিজেই বলেছেন—

চৈতন্যপ্রভুর মহিমা কহিবার তরে।

কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে॥

আদিধণ্ডের বহুস্থানেই শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিস্তৃত ভাবে কৃষ্ণ-কথা বলেই পররূপে বলেছেন,—

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাক্রি

কখন বলেছেন—

সেই ত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য গোসাক্রি।

কখন বলেছেন—শ্রীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ রাম।

গ্রন্থকার যে এই কথা লিখলেন, সেই লেখার ভঙ্গী ও মাধুর্য্য বড়ই অপূর্ণ। আদিধণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি কৃষ্ণ ও ব্রহ্মার মধ্যে কথোপকথন বর্ণনা কল্লেন। ব্রহ্মা শিশু বৎস হরণ

করে নিজকে অপরাধী মনে করে কৃষ্ণের কাছে এসে এই বলে ক্ষমা চাইলেন—“কৃষ্ণ তুমি আমার পিতামাতা, আমি তোমার তনয়, তোমার নাভিপুত্র থেকেই আমার জন্মোদয় হয়েছে। পিতামাতা বালকের অপরাধ গ্রহণ করেন না। আমি তোমার বালক, আমায় ক্ষমা কর।”

কৃষ্ণ বল্লেন—“সে কি কথা! তোমার পিতা নারায়ণ। আমি যে গোয়াল। তুমি কিরূপে আমার ছেলে হলে?” কৃষ্ণ পরিষ্কার বল্লেন যে তিনি নারায়ণ নহেন, তিনি গোয়াল। কৃষ্ণ চাইলেন আত্মগোপন করতে। কিন্তু তা পাল্লেন না; ব্রহ্মা যখন শাস্ত্র যুক্তি প্রমাণ বহুবিধ ভাবে কৃষ্ণকে বুঝিয়ে বল্লেন,—তুমি মূল-নারায়ণ, তুমি সর্ব দেহিগণের আত্মা, তুমি অধীশ, তুমি অখিললোকসাক্ষী ইত্যাদি, তখন আর কৃষ্ণ ব্রহ্মার কথায় প্রতিবাদ করতে পারলেন না। গ্রন্থকার এই সব বিস্তার করে বর্ণনা কল্লেন। শুধু তাই নয়, তার পর শ্রীমদভাগবতের—“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং” এই শ্লোকটি ব্রহ্মার মুখ দিয়ে ব্যাখ্যা করাইয়া সাব্যস্ত করিলেন—“কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং,” অর্থাৎ কৃষ্ণের ভগবত্বাই তিনি প্রতিপন্ন করিলেন, ভগবানের কৃষ্ণত্ব শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নহে বলিয়া তিনি স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা কল্লেন। এবং এই সিদ্ধান্ত তিনি সমস্ত ভাগবত-গ্রন্থের পরিভাষারূপে গ্রহণ করার জন্তে সকলকে বিধি দিলেন, অর্থাৎ গ্রন্থের এক কোণে একটি আলো জালিয়া রাখলে যেমন সমস্ত গৃহস্থানি আলোকিত হয়, তেমনি ভাগবতের এই সিদ্ধান্তটি বর্ষিকাস্বরূপ সর্বদা সন্মুখে রেখে দিলে সমগ্র গ্রন্থের অর্থ পরমপ্রোজ্ঞস্বরূপে বোধগম্য হয়, নতুবা অধ্যয়ন ব্যাঘাত হবে। ঠিক এই সব বর্ণনার পরই কবিরাজ গোস্বামী গৌরতত্ত্ব স্থাপন কল্লেন। কৃষ্ণ যেমন নিজকে গোপশিশু ব’লে পরিচয় দেওয়ায়ও ব্রহ্মার কৃষ্ণের নারায়ণত্ব বা ভগবত্ব স্থাপনে কোন বাধা জন্মায়নি, তেমনি গৌর নিজকে ভক্ত, ব্রাহ্মণকুমার বলে পরিচয় দেওয়ায় এবং ভক্তভাবে তাঁর আচরণ করায়ও কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীগৌরানন্দনের ভগবত্ব স্থাপনে বাধা জন্মায়নি। ব্রহ্মা কর্তৃক বর্ণিত নারায়ণতত্ত্ব ব’লে, সেই নারায়ণই যে কৃষ্ণের বিলাসমূর্তি এবং নারায়ণ-অংশ কৃষ্ণ-অংশী এই সব ব’লে, মোট কথা কৃষ্ণই যে পরতত্ত্ব এই কথা বিস্তৃত করে ব’লে গ্রন্থকার বল্লেন—

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রহ্মেন্দ্রকুমার।

আপনে চৈতন্তরূপে কৈল অবতার ॥

অবতারী মানে, যার কাছ থেকে সব অবতাব হয়েছে। তিনি হ’লেন ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ। তিনিই নিজ চৈতন্তরূপে অবতীর্ণ হ’লেন—এই কথায় পাছে বা মুখলোকে মনে করে যে কৃষ্ণ গৌররূপে অবতীর্ণ হ’লেন, আবার গৌরলীলা সমাপনান্তে যেই কৃষ্ণ সেই কৃষ্ণ হ’লেন, গৌর আর নিত্যবস্তুরইলেন না, গৌর বড় জোর সাধন, কৃষ্ণ সাধ্য। এই কুতর্ক না উঠতে পারে এই জ্ঞান কবিরাজ-গোস্বামী ইহার পূর্বেই নিজেই কৃষ্ণ ও নারায়ণ সম্বন্ধে কুতর্ক উঠালেন এবং নিজেই তা খণ্ডন ক’রে স্থাপন করলেন। কৃষ্ণ অংশ নহেন, তিনি অংশী। নারায়ণ অংশী নহেন, তিনি অংশ। এখানে তিনি যখন বল্লেন যে, সেই কৃষ্ণ

আপনে চৈতন্তরূপে কৈল অবতার ॥

অর্থাৎ সেই অবতারী-কৃষ্ণ নিজেই এলেন। এ কথায়ও যদি কাহারো জ্ঞানোদয় না হয়, সেই ভয়ে গ্রন্থকার তাঁর পরসংখ্যক পরামর্শেই তারত্বের বল্লেন—

অতএব চৈতন্তগোসাঞি পরতত্ত্ব-সীমা ॥

যেমনই পাণ্ডিত্যপূর্ণ শাস্ত্রযুক্তিধারা সূনিপুণভাবে শ্রীমদভাগবতের পরিভাষা নির্ণয় কল্লেন—“কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং,” তেমনি ভাগবতজ্ঞানোচিত একনিষ্ঠার সহিত শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতের ও গৌরলীলাবিষয়ক সমস্ত গ্রন্থের পরিভাষা শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা নির্ণয় কল্লেন—“চৈতন্তগোসাঞি পরতত্ত্ব-সীমা”।

শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতকারের এতই দৃঢ় গোবৈকনিষ্ঠা, গৌর-লীলার অমোঘ শক্তির উপর তাঁহার এমনই অবিচলিত বিশ্বাস যে, তিনি অতি সরলভাবে বলিয়া ফেলিলেন—

যদি নাহি বুঝে কেহ শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্তচরিত!

কৃষ্ণ উপজিবে প্রীতি বুঝিবে রসের রীতি
শুনিলেই হয় বড় হিত ॥

উদ্ধার এক কথা, রস আশ্বাদন করা আর এক কথা। উদ্ধারের কথা—ইহার সহজ উপায় তিনি বলেছেন বটে, কিন্তু সে যে নিম্নস্তরের কথা। শ্রীভগবানেব সহিত রসল করা অতি উর্ধ্বস্তরের কথা এবং এই রসআশ্বাদন কবাই মানব-জীবনের চরম সৌভাগ্য। জীবকে এই সৌভাগ্য দান করা চরিতামৃতের একটা প্রধান উদ্দেশ্য। জীবের সর্বাপেক্ষা বড়

হিত হচ্ছে ভগবানকে শ্রীতি করা—রসের রীতি হৃদয়ঙ্গম করা। এই হিতসাধনের জন্ত তিনি অকুণ্ঠিত চিন্তে অতি সরলভাবে অতি সহজ উপায় নির্দ্ধারণ করেন—কি? না—গৌরলীলা পাঠ, গৌরলীলা শ্রবণ। তাঁহার উপরিউক্ত কথার সংক্ষিপ্ত সার-মর্ম এই ব'লে মনে হচ্ছে—তিনি বলেন,—“ভাই সব! গৌরলীলায় তোমরা আপাত-বিরোধ দেখতে পাবে। যিনি স্বয়ং ভগবান, তিনি ভক্তভাবে আচরণ করেছেন। যাঁহার কেহ ভজনীয় নেই, যিনি নিজেই সকলের ভজনীয়, তিনি ভক্তভাবে অবলম্বন ক'রে ভগবানকে ভজন করেছেন—নিজে হরি হ'য়ে ‘হরি’ ‘হরি’ বলছেন, ‘হরি’ ব'লে কান্দছেন, কখন ধূলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছেন। যিনি স্বয়ং বস্তুরূপে প্রকাশিত হ'য়ে নিজমুখে স্বীয় তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন, এবং তুলসী-চন্দনে সকলের পূজা গ্রহণ করেছেন, তিনিই আবার সাধারণ মানুষের জায় তুলসী-সেবা করেছেন এবং সে-ও কিরূপ সেবা? না—তুলসীকে স্নান করা'তে করা'তে আঁধির জলে ভেসেছেন। গৃহের সেবিত বিগ্রহের অর্চনা করবার সময় নয়নজলে পরিহিত বস্ত্র পর্য্যন্ত ভিজিয়েছেন, বারংবার কাপড় ছেড়ে, বারংবার অর্চনা'য় ব'সেও নয়নজল বাবণ করতে না পেয়ে অবশেষে গদাধরকে বলেছেন,—‘ভাই গদাধর, আমাধারা আর সেবা পূজা হ'লনা। তুমি, ভাই, মন্দিরে যেয়ে সেবা পূজা কর। শুধু তাই নয়। যিনি সর্বোৎকৃষ্ট, তিনি কৃষ্ণ পাণ্ডরায় জন্ত আকুল ক্রন্দন ক'রে সকলের চিন্তা দ্রব করেছেন। শুধু তা-ও ত নয়। তিনি জনে জনের পায়ে ধরেছেন। গৌর-লীলায় এ যে মস্ত বড় একটা বিরোধ। শুধু তা-ও ত নয়। যিনি পরম পুরুষ, সমস্ত দেবদেবী তাঁহার শক্তিবিশেষ, তিনি স্বয়ং দেবীভাবে নৃত্য করেছেন। এ নৃত্য যে যাত্রাগানের বা থিয়েটারের অভিনয় নহে। সত্যি সত্যিই তিনি দেবী হয়েছেন এবং ভগবতীভাবে অপরকে স্তনপান করিয়েছেন। যিনি রক্ত-মাংসের দেহধারী ব'লে বাইরে প্রতীয়মান, তিনি যে পরিপূর্ণ চিন্ময়। যিনি বাহিরে স্নানাত্মকশরীর, তিনি পরিপূর্ণ চিদানন্দধনবস্তুরূপে প্রকাশমান, সেই চিদানন্দধন-বস্তুরূপে বিভিন্ন চিন্ময়ী শক্তির সহজ বিনাশ দেখা গিয়েছে। এ সবই আপাত বিরোধ। অথচ এ ভেদী নয়! এ

ইজ্ঞান নয়! পূর্ণ সত্যের প্রকাশ! এ সব লীলার গান্ধীর্ঘ্য-পূর্ণ রহস্য অনেকেরই বুঝিতে কঠিন মনে হবে। হে ভাই সব! এ বুঝতে না পেয়ে তোমরা নিরাশ হ'য়োনা। লীলা পাঠ কর, লীলা শ্রবণ কর। রসের সন্ধান পাবে। ঐ চারি পংক্তি ত্রিপদী মধ্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার এত কথা ইঙ্গিতে বলে রেখেছেন। কি সহজ কথায়ই তিনি বলেন—

যদি নাহি বুঝে কেহ শুনিতে শুনিতে লেহ

কি অজুত চৈতন্যচরিত!

কৃষ্ণ উপজিবে শ্রীতি বুঝিবে রসের রীতি

শুনিলেই হয় বড় হিত ॥

ঠিক এইরূপ কথা মহাত্মা শিশিরকুমারের মুখেও শুনেতে পেয়েছি। তিনি বলেছেন,—গৌর এমনই বস্ত্র, গৌরলীলা এমনই শক্তিশালী যে, যে কেহ এই লীলা পাঠ করবেন, কি কেহ যদি বিরুদ্ধ ভাব নিয়েও সমালোচনা বা নিন্দা প্রবর্তি নিয়েও এই লীলা পাঠ করেন, তিনিও গোরে আকৃষ্ট না হ'য়ে পারবেন না, তিনিও এই অপ্রকৃত অদুরন্ত লীলারস চুমুকে-চুমুকে পান করে, কেবলই ঐ রস পান করতে সমুৎসুক হবেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনার গান্ধীর্ঘ্য ও সরসতার আর একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সাধারণ জীব মনে করে ভগবানের নিকট যদি বর পাওয়া যায়, ভোগস্বখের সামগ্রী যদি তাঁহার নিকট হইতে লাভ করা যায়, তবে তাহাই ভগবানের কৃপা। আর তাও যদি না হয়, তবে ভগবানকে পেলেই বুঝি তাঁর বড় কৃপা হ'ল। এই গ্রন্থখানি তা বলেন না। গ্রন্থকার বলেন—

* * বস্ত্র-বিষয়ে হয় বস্ত্র-জ্ঞান—

বস্ত্র-তত্ত্ব জ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ ॥

যে বস্ত্র স্বরূপত যাঁহা, সেই বস্ত্রকে ঠিক তাই ব'লে যদি জানা যায়, তবে তাই হ'ল সর্বোপেক্ষা বড় কৃপা। ভগবান কি স্বরূপ, জীব কি স্বরূপ, জীবে ভগবানে ও জীবে জীবে সহজে কি, গৌর কি বস্ত্র, গৌর এলেন কেন, গৌরের ভজন কিরূপ, রস বস্ত্রটী কি, জীবের চরম লক্ষ্য কি,—এই সব জ্ঞান, অর্থাৎ এক কথায়, ভগবান ও তদন্তর বস্ত্র যথাযথ জ্ঞানই হচ্ছে কৃপার প্রকৃত নিদর্শন। এ একটা নূতন কথা। এত বড়

কথা এইরূপ সহজ ভাষায় অল্প পর্য্যন্ত আর কেহ বলেছেন।
কি না আমরা জানি না !

মোট কথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রত্যেক কথাই
গভীরার্থব্যাঞ্জক। অতীত গ্রন্থ দু'একবার পড়লেই আর
বেশী পড়বার বাসনা হয়না, কেননা তাহাতে নিত্য নূতন
পাওয়া যায়না। অপিচ, এই গ্রন্থ যতই পাঠ করা যায়,
ততই নিত্য নূতন বলে বোধ হয়। শ্রীভগবান্ যেমন নিত্যই
নূতন—চির নবনবায়মান, এই গ্রন্থের ভাব ও ভাষাও ঠিক
তদ্রূপ। এই গ্রন্থের ভাষা ভাবের অল্পকূল, ভাব ভাষার
অল্পকূল নহে। ভাষার ক্ষুদ্র গ্রন্থের ভাব কোথাও ধর্ম হয়
নি। ভাব যেমন সরল, উদার ও রসপূর্ণ, ভাষাও ঠিক
তদ্রূপ অতি প্রাঞ্জল ও রসাত্মক। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বা অল্প
সময়ের বক্তৃতায় তাহা সম্যক পরিষ্কৃত করা অসম্ভব। কৃপা
ক'রে এই গ্রন্থখানি পড়লেই সকলের ইহা হৃদয়ঙ্গম হবে।

কাব্য হিসাবে এই গ্রন্থখানি অতি উচ্চ অঙ্গের। গ্রন্থকার
সত্যই কবিরাজ বা কবিশ্রেষ্ঠ আখ্যা পাওয়ার যোগ্য ;
কেননা, তাঁহার রসবোধ ও রসবিচার অতুলনীয়, উহার
চিত্তীকরণেও তিনি সিদ্ধহস্ত। অতি স্ননিপুণ হস্তে অতি
সুন্দর তুলিকা নিয়ে সেই রস তিনি এই মহাগ্রন্থে চিত্রিত
করেছেন। এই গ্রন্থে প্রথমতঃ ব্রজধামের দান্ত, সখ্য,
বাৎসল্য ও মধুর রসের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে,
সেই সঙ্গেই পবনমুখের এক নিঃশ্বাসে গ্রন্থকার ঐ রস-
চতুষ্টয়ের পূর্ণ-প্রকাশ গৌরলীলায় নদীরা-যুগলে এমনই-সুস্পষ্ট
ঈদ্রিতে ব্যক্ত করেছেন যে, তা পড়ে গ্রন্থখানিকে বারংবার
মস্তকে ও বক্ষে ধারণ করতে সাধ হয়। আদিখণ্ডে পঞ্চম
পরিচ্ছেদে তিনি ব্রজসংহিতার পঞ্চাধ্যায়ের উনচতুর্বিংশ
শ্লোকটি বল্লেন ; শ্লোকটি এই :—

রামাদিমুক্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোং ভুবনেষু, কিন্তু ।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পূমান্ বো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অর্থাৎ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ অংশশক্তি নিরঞ্জিত করে
রামাদিমুক্তিতে পৃথিবীতে নানা অবতার করেছিলেন বটে,
কিন্তু তিনি যে পূর্ণশক্তি নিয়ে স্বয়ং অবতীর্ণ হলেন, সেই
আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। শ্লোকের সার
মর্ম হচ্ছে এই,—অংশশক্তি নিয়ে কৃষ্ণ নানা অবতাব করেন
বটে, কিন্তু তিনি যখন স্বয়ং অবতীর্ণ হন তখন পূর্ণশক্তি
নিয়ে প্রকাশিত হন। সেই পূর্ণশক্তিই হচ্ছে তাঁর হ্লাদিনী

শক্তি। ইনিই ব্রজধামে শ্রীরাধা। এই শ্লোকটি বলে গ্রন্থকার
বল্লেন—“শ্রীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ”। সেই কৃষ্ণ—কোন কৃষ্ণ ? না—
যিনি রামাদিমুক্তিতে অংশে নানা অবতার কর্জেন, কিন্তু পূর্ণ-
শক্তি নিয়ে ব্রজে স্বয়ং অবতীর্ণ হলেন সেই কৃষ্ণ। এই একটি
কথার কি নিগূঢ় ভাব তাহা বুঝিবে রসিক ভক্ত—না বুঝিবে
মূঢ়।”

নিগূঢ় ভাবটি হচ্ছে,—এই-কৃষ্ণ যেমন পূর্ণ অবতীর্ণ হ'তে
হ্লাদিনী শ্রীরাধা সহ প্রকাশিত হন, শ্রীগৌরানন্দও তদ্রূপ অবতীর্ণ
হ'তে তাঁর পূর্ণ হ্লাদিনী,—শক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ প্রকাশিত
হয়েছেন। ‘শ্রীচৈতন্য’ বলে কথাটা আরো দৃঢ় ক'রে বলেছেন।
গৌরচন্দ্র বিষ্ণুপ্রিয়া-বিহীন হ'লে যে শ্রীহীন এবং বিষ্ণুপ্রিয়া-
যুক্ত হ'লেই তিনি শ্রীযুক্ত একথা বলাই বাহুল্য। চৈতন্য
বললেই এই অর্থ পরিষ্কৃত হ'ত বটে, কেননা কৃষ্ণ বলতেই
রাধাকৃষ্ণ বুঝায়,—শক্তি ও শক্তিমান্-অভেদতত্ত্ব। সেইরূপ
‘চৈতন্য’ বলতেই বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরানন্দযুগল বুঝায়। তথাপি
আরো দৃঢ়তার জন্য ‘শ্রীচৈতন্য’ বলা হ'ল, যেন কেহ ভ্রান্তিতে
না পড়েন। গ্রন্থের এই রসবোধ ঠাকুর নবোক্তমের চিন্তে
সুন্দর স্মরণ হয়েছিল।

তাই তিনি বল্লেন—কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিকভক্ত মাঝ।

কেন ? যেহেতু—যিহো কৈল চৈতন্যচরিত। কেন ?
চৈতন্যচরিতামৃতে রসিকতা কোথায় ? না—

গৌর-গোবিন্দলীলা শুনিতে গলয়ে শিলা।

তারপর ঠাকুর নরোত্তম মৈত্র করে বল্লেন—

তাহাতে না হৈল মোর চিত।

এখানে “গৌর-গোবিন্দ” কথাও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের
“শ্রীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ” এই বাক্যের সমানার্থ-বোধক। গোবিন্দ
বলতে যেমন রাধা-গোবিন্দ বুঝায়, রাধা না হ'লে গোবিন্দ-
লীলার মাধুর্য্যই হয়না, মাধুর্য্য কেন ? লীলাই হয় না।
তদ্রূপ গৌর বলতে বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরানন্দ বুঝায়। বিষ্ণুপ্রিয়াই
গৌর-লীলার ধাম। ঠাকুরমহাশয় ঐ চৈতন্যচরিতামৃতের
ভাব নিয়েই ঐ উপরিউক্ত কথারই প্রতিধ্বনি ক'রে চৈতন্য-
চরিতামৃতকে একটি মহারসাত্মক গ্রন্থ বলেছেন। নদীরা-
যুগল ভজনেই এই গ্রন্থের সারসিদ্ধান্ত। রসিককবি কখন
কোন রস একেবারে নয় করে দেখান না। ঈদ্রিত করে
যান—সুস্পষ্ট ঈদ্রিত পাঠক পূর্বাধিকার দেখে ঐ রসসায়রে
প্রবেশ করেন। কৃষ্ণলীলার অন্ত্যলীলা বা বিরহলীলার
মধ্য হ'তে যেমন রাধাকৃষ্ণযুগল ফুটে উঠেছে, ঠিক তেমনই
শ্রীগৌরানন্দের শেষলীলা বর্ণনা করতে করতে শ্রীচৈতন্যচরিতা-
মৃতগ্রন্থ গোবিন্দবিষ্ণুপ্রিয়াযুগল প্রস্ফুট করেছেন, অলমতি
বিস্তারণ।

মহাত্মা শিশিরকুমার স্মরণে

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

মহাত্মা শিশিরকুমারের ত্রিংশতিতম মৃত্যুবার্ষিকী উৎসব কলিকাতায় ও কলিকাতার বাহিরে নানাস্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জাতীয় জীবনে যাহাদের দান অপরিমেয়, বিশিষ্ট এক পুণ্য-প্রভাতে বিশেষভাবে তাঁহাদের স্মরণ কবিবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের স্বাভাবিক। স্বভাবের দাবীতেই তাই এই শ্রেণীর উৎসব আপন স্বকীয়তা লইয়া সার্বিকতার পথে আগাইয়া চলে। এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। উৎসব-প্রাক্কণের সমাহিত পরিবেশ তাহার সাক্ষ্য দিয়াছে।

সিঁথি-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর উত্তোগে বাগবাজারে অনুষ্ঠিত বিরহ-বাসরে সভাপতি পণ্ডিত শ্রীমৎ রসিকমোহন বিজ্ঞানভূষণ মহোদয় শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে মহাত্মা শিশিরকুমারের কর্মধারার প্রতি সমগ্র জাতির সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রদীপ্ত ভাষণে বলেন, “মহাত্মা শিশিরকুমার ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয়দের অম্মতম ছিলেন। তাঁহার প্রগাঢ় দেশ-প্রেম বহুমুখী কর্মধারার মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল।” বরগীষকে স্মরণ করিবার, লোকচক্ষে মুর্ত্ত করিয়া তুলিবার সহজাত প্রেরণা হইতেই পণ্ডিতপ্রবরের ভাষণে সেদিন মহাত্মা শিশিরকুমারের যে রূপটি উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহাতে বৃহত্তর জীবনের পূজারী শিশিরকুমারের সমাজসেবার সহিত জনগণ পবিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। জাতির বরগীষ যাহারা, তাঁহাদের জীবনকথা, কর্মনীতি ও আদর্শ-নিষ্ঠা বারংবার আলোচনার মধ্য দিয়া জাতীয় জীবনে সঞ্চারিত হইলে জাতীয় জীবনের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়,—জাতি মহতের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া জীবনের জয় প্রতিষ্ঠার উদ্বুদ্ধ হয়। পণ্ডিতপ্রবরের উদাত্ত ভাষণে মহাত্মা শিশিরকুমারের জীবন-আলেখ্য ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে, জনগণের তিনি কত আপনাত্ম ছিলেন, সেই সত্য সুপরিষ্কৃত হইয়াছে। এই ধরণের অত্যাবশ্যক অনুষ্ঠান সর্বকালে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য।

ব্যক্তির জীবনের দুঃখ মোচনের, শোকার্তকে সাহস দানের, নিপীড়িতের কল্যাণ সাধনের ক্ষুদ্রতম সুযোগটীও

শিশিরকুমার যেমন গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনই অমৃতবাজার পত্রিকার মাধ্যমে স্বদেশ, স্বজাতি তথা বৃহত্তর জাতির সেবার আত্মনিয়োগ করিয়া অপূর্ণ নিষ্ঠার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রস্থানের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত আদর্শ-নিষ্ঠ মহাপুরুষ নিরলস-ভাবে জাতির সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লেখনীগুণে জাতীয় জীবনের সুখ-দুঃখের, নিষ্ঠাতন-নিষ্ঠাহের কাহিনী ভাষা পাইয়াছে,—জীবন্ত হইয়া জাতীয় জীবনে জোয়ার বহাইয়াছে। মানুষ শিশিরকুমার মানুষের সেবায় মহামানবের আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

উত্তরকালে মহাত্মা শিশিরকুমারের এই সুগভীর স্বদেশ-প্রেম ভগবৎ প্রেমে পর্যাবসিত হয়। সাধকের তন্ময়তা তাঁহার ধর্ম্মানুশীলনে সর্বব্যাপী হইয়া উঠে। শ্রীগৌরধর্ম্ম অর্থাৎ প্রেম-ভক্তিধর্ম্মের স্নিগ্ধ সায়রে অবগাহন করিয়া পুতচরিত্র শিশিরকুমার এই ধর্ম্মচেতনাকে সর্বসাধারণে প্রচারে ব্রতী হন। শ্রীগৌরধর্ম্ম শিশিরকুমারের ঐকান্তিক প্রযত্নে সুদূরপ্রসারী হইয়া উঠে। ‘অমিয় নিমাই চরিত’ এবং তাঁহার অন্ত্যস্ত বৈষ্ণব সাহিত্যের রচনাবলী নিগূঢ় ভক্তিরসের শ্রেষ্ঠ অবদান। অপূর্ণ মানুষ পূর্ণের চরণস্পর্শে দিব্যজ্ঞান লাভ করুক, সার্বিকতার আনন্দে উদ্ভাসিত হউক—এই ছিল শিশিরকুমারের শেষজীবনের সাধনা। গৌরধর্ম্মের দিব্য বিভাগ মহিমান্বিত শিশিরকুমার মহাপ্রভুর বাণী শুনাইয়া মানবজাতিকে মুক্তি-তীর্থে আহ্বান করিয়া গিয়াছেন :—‘হে জীব! তোমরা শ্রীভগবানের দাস। তোমরা আর কাহারো দাস নও। তোমরা স্বাধীন। তোমরা মুক্ত। তোমরা কাহারো পদানত নও। তোমরা কেহই যখন অপরের দাসত্ব করিবে না, তেমনই আবার অপরকে দাস করিবার স্পৃহাও রাখিও না। একমাত্র প্রভু—শ্রীভগবান। তোমরা সকলে ভাই ভাই। তোমরা সকলেই এক বিশাল পরিবারের লোক।’

এই আদর্শনীতির পরিপূর্ণ রূপ তাঁহার সমগ্র জীবনকে উদ্ভাসিত করিয়াছে—পশ্চাদবর্ত্তীদের সংগ্রাম বিজয়ের প্রেরণা

দিয়াছে। প্রতি দিবসের ধূলিমলিন জীবনের সুখ দুঃখ হইতে স্বীয় চিন্তাবৃত্তিকে বিমুক্ত রাখিয়াও তিনি দুঃখ-বিড়ম্বিত বাস্তবকে অস্বীকার করিতে চাহেন নাই—জীবনের দুঃখ দারিদ্র্য, অভাব বেদনা ও পরাধীনতার অবমাননাকে তিনি মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই, নিষ্কর্ম নৈরাশ্রকে প্রশ্রয় দেন নাই। কর্মের ও জ্ঞানের সাধনায় জীবনের জয় প্রতিষ্ঠার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। ত্যাগব্রতী শিশির-কুমার মাটির মাছুষের দুঃখ-শোক আপন বুক দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, জ্ঞান ও কর্মের একনিষ্ঠ সাধনায় আজীবন

নিরলসভাবে ব্যাপৃত থাকিয়া, কর্মসাধনার মধ্যেই যে জীবনের সার্থকতা, তাহাই প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। সেবা ও প্রেমের মধ্যদ্বারা মানুষকে সার্থক করিয়া তুলিবার ব্রত উদ্‌যাপনে তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনাই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। যে অভয়বাণী মহাত্মা শিশিবকুমারকে নির্ভীক ও অপরাধের করিয়াছিল, সেই বাণীই মাছুষের যাত্রাপথ নিষ্কর্ষক করিতে, উজ্জীবিত করিতে, একমাত্র সহায় আমাদের প্রণাম নিবেদনের মধ্যে শিশিরকুমারের স্মরণক্ষণটি সার্থক হউক। মহাত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া আমরা ধন্য হই।

জয় সে গৌরহরি

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী এম-এ, বি-এল, বি-টি, এল-সি-পি. (লণ্ডন)

যাঁর পদতল মানে দুর্গম ইন্দ্র অমরাপতি,
বেদোপনিষদে যাঁহার শ্রীপদে অতিক্রমণে করে গতি,
সুবে যাঁর রত মহা দৈবত ব্রহ্মা মহেশ্বর,—
শ্রুতিতে সেজন স্বীয় প্রেমসুগন্ধ আসিল অবনী'পর।
অমল যাঁহার চরণ-কমলে অধম পতিত যারা,
শরণ মাগিছে ধরণীর শত অভাগা নর্বহারা,
প্রণত প্রেমিক জনের জীবন যে করে মাধুরীময়,
সে গৌরের জয়,
পতিত পাবন অধম তারণ সেই গৌরের জয়।
যাঁর অঙ্গের উজ্জল আভায় দিনের শোভা স্নান,
কণ্ঠে যাঁহার গুঞ্জরে সদা কুঙ্করে গুণ-গান,
বিশাল যাঁহার দীর্ঘ যুগল সতত সজল চোখে
করুণা ছড়ায় মায়া-চঞ্চল পিপাসা-কাতর লোকে,
যাঁর স্নানময়ী তল্লর কিরণে ধরণীর তম হবে,

সদয় পরশে মরু-সম-হিয়া সরস শ্রামল করে,
বহিল যাঁহার রূপের লাবণি নিখিল অবনী ভরি
জয় সে গৌরহরি,—
স্বীয় কান্তার কান্তি-মধুর জয় সে গৌরহরি।
যাঁহারে যতনে হৃদয় রতনে মুনরা পুজিতে চায়,
যাঁর ভালোবাসা লভিতে কমলা লোলুপা হইয়া ধায়,
অধুনা জাঁখি নিখিল-গোপীর ঘনীভূত প্রেমরাশি
যাঁর করুণায় বিনা সাধনায় হেরিল বিশ্ববাসী,
ব্রজ-মুণ্ডীর আবেগ-অধীর প্রেমের আশ্বাদন,
চাতুরীতে ভরা লীলার মাধুরী জানিত না কোন জন
যে মেঘে ছড়াল সে রস-বাদের অখিল ভুবন ভরি
জয় সে গৌরহরি,
অসাধন-ধন-বিতরণ-কারী জয় সে গৌরহরি।

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীজীব

(পূর্বাহ্নসংগ)

শ্রীবিষ্ণুভূষণ সরকার

রূপ-শিক্ষা

‘জীব চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। নিম্নস্তরের জীব হইতে ক্রমে মানুষ হইয়াছে, একথা প্রভু শ্রীরূপকে কহিলেন না। আজ যে জীব সাপ বা ব্যাঙ, সে-ই বহুজন্ম পরে মানুষ হইবে? না,—ঐ নিম্নস্তরের জীবসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মানুষাদিও সৃষ্ট হইয়াছে? অথবা কৰ্ম্মফলাভ্যুপেক্ষা জন্মজন্মান্তর হইতেছে? এ সব সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভু শ্রীরূপকে কহিলেন না, সুতরাং ধার করিয়া এ-সব কথা আনিয়া মতবাদ সৃজন করা অনাবশ্যক। আমরা মানুষ, মানুষহিসাবে আমাদের কি কর্তব্য তাহাই প্রভু বলিয়াছেন; তাহাই আমাদের আলোচ্য।

প্রভু কহিলেন, জীব বিবিধ—স্বাবর ও জঙ্গম; যেমন বৃক্ষলতা, পাহাড়পর্বত প্রভৃতি স্বাবর বা স্থিতিশীল জীব, এবং পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ মানুষ গমনশীল জীব। জঙ্গম জীব ত্রিবিধ—তীর্থক (কৃষি, কীট প্রভৃতি), জলচর ও স্থলচর। তার মধ্যে মানুষ অতি অল্পসংখ্যক। এই মনুষ্যজাতির মধ্যে বেদ-বহির্ভূত লোকই বেশী। বেদবহির্ভূত অর্থ শাস্ত্রবহির্ভূত। যাহারা শাস্ত্রাদি মানে, তাহারও অর্ধেক মুখে মানে, কার্যতঃ শাস্ত্রনিষিদ্ধ পাণাচার করে। যাহারা শাস্ত্র মানিয়া চলে, তন্মধ্যে কাম্যকৰ্ম্মনিষ্ঠ লোকই অনেক। জ্ঞানী খুব কম। প্রকৃত জ্ঞানী লোক যত, তন্মধ্যেও মুক্ত খুব কম। কোটি মুক্তमध्ये কৃষ্ণভক্ত অতিশয় চুল্লভ। যেহেতু কৃষ্ণভক্ত নিকাম ও শাস্ত। যাহারা দৈহিক সুখভোগ বা মুক্তি অথবা বিভিন্ন সিদ্ধি কামনা করে, তাহাদের সংখ্যাই বেশী, তাহারা সকলেই অশাস্ত। এই সকল অশাস্ত বা বিক্ষিপ্তচিত্ত, সুতরাং নানাবিধ দুঃখতারে আক্রান্ত মানুষের জন্তই প্রভুর উপদেশ।

দশদিন ধরিয়া প্রভু যে শিক্ষা দিলেন, তাহার সারমর্ম এই,—গুরু ও কৃষ্ণের প্রসাদে মানুষ যখন ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। কৃষ্ণই গুরুরূপে

জীবগণকে রূপা করেন। গুরু ও কৃষ্ণ অভেদতত্ত্ব হইলেও, উভয়ে ভেদ রহিয়াছে। গুরু কৃষ্ণের অতিপ্রিয় ভক্ত, তাঁহার মধ্য দিয়া কৃষ্ণশক্তি প্রকাশিত হইয়া জীবকে রূপা করা হয়। সুতরাং গুরু ও কৃষ্ণ একই বস্তু নহেন; তিনি কৃষ্ণের স্রাব্য পুণ্য। গুরুর সেবা করিতে হয়, কৃষ্ণের ভজন করিতে হয়। শ্রবণকীর্ত্তনরূপ জলসিঞ্চন দ্বারা ভক্তিলতাবীজকে অঙ্কুরিত, পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিতে হয়। এই লতার আশ্রয়স্থল প্রাকৃতব্রহ্মাণ্ডে, বা ব্রহ্মলোকে, বা পরব্যোমও নাই। কারণ প্রাকৃতব্রহ্মাণ্ড মায়িক বাসনাময়, ব্রহ্মলোক বা সিকলোক বা নিরাকার জ্যোতির্ময় দেশ নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানিগণের ও শ্রীহরিকর্তৃক নিহত দৈত্যগণের গম্যস্থল, পরব্যোম ঐশ্বর্যময় নারায়ণের লীলাস্থল, বিরজা-নদী বা কারণ-সমুদ্র কৰ্ম্মবাদিগণের হুম্মভাবে অবস্থিতিস্থল। প্রাকৃতব্রহ্মাণ্ডের ভৌগোলিক অবস্থান আছে, অপর কয়টির তাহা নাই। উহার চিম্ময়, কারণ-সমুদ্র চিং ও জড় উভয়ের মিশ্রণস্থল, জড়ের সেখানে হুম্মভাবে অবস্থিতি। শ্রবণকীর্ত্তন-জলে যত্নে বর্দ্ধিত লতা এই সব স্থান পার হইয়া প্রেমময়ধাম গোলোকে যাইয়া কৃষ্ণ বা গৌরচরণ-কল্পবৃক্ষ প্রাপ্ত হয়। তখন সেই লতায় প্রেমফল ফলে ও ভক্ত তাহা আশ্বাদন করে। ভক্তিবাদীদের কৰ্ম্মফল সম্বন্ধে আলোচনা নিম্নয়োজন, কেননা ভক্তিলতাবীজ পাইলেই শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তির অঙ্গ সাধনা করিয়া প্রেম পাওয়ার জন্ত সতত চেষ্টা হয়, তাহাতে কৰ্ম্ম, কৰ্ম্মফল ইত্যাদি ভাবিবার তাঁহার অবসর কোথায়? মোট কথা তাঁর কৰ্ম্মফল কাটিয়া যায়। এই প্রেম দাস্তসখ্যাদিভাবে চতুর্বিধ। এই রস স্বভাবে কেবলই আশ্বাস্ত, কেবলই উপভোগ্য।

এই উপদেশের মাঝখানে প্রভু একটু কঠিন কথা বলিলেন বলিয়া বাহুতঃ দেখা যায়। ভক্তিলতাকে বৈষ্ণবা-পরাদ্যরূপ মন্তহস্তী হইতে রক্ষার নিমিত্ত আবরণ দিয়া

রাখিতে হইবে, যেন অপরাধ-হস্তী লতা ছিঁড়িয়া না ফেলে, এবং লাভপূজাপ্রতিষ্ঠাদিরূপ উপশাধা বাহাতে না জন্মে বা দৈবাবীন জন্মিলেও তাহা তৎক্ষণাৎ ছেদন করার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বৈষ্ণব ত সাধারণ ভাবে সকলেই। প্রভু বলিয়াছেন—‘অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যত সবই মোর দাস।’ কাহারো মনে ব্যথা দিতে হবে না। আবার লাভপূজা-প্রতিষ্ঠাদি চিন্তে একবারে স্থান পাইবেনা, এ-ও বড় কঠিন কথা। প্রভু সনাতন-শিক্ষায় ইহার সহজ নীমাংসা করিয়া অভয় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—যদি অজ্ঞানেও ভক্তের চিন্তে কোন বিকল্প উপস্থিত হয়, ভগবান তাহা বিনা প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধ করিয়া লয়েন, এবং মূর্খতাবশতঃ ভক্ত যদি বা কখন বিষয়মুখ চায়, বিজ্ঞ ভগবান তাহা না দিয়া স্বচরণামৃত দিয়া বিষয়মুখ তুলাইয়া দেন। শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী এই সব দেখিয়া শুনিয়া এবং গৌরলীলার ইহার বহু দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়া এই রূপ-শিক্ষা ও সনাতন-শিক্ষা বিস্তার করিয়া বর্ণনার বহু পূর্বেই মুখবন্ধে আদিখণ্ডে অষ্টম পরিচ্ছেদে বলিয়া রাখিয়াছেন,—কৃষ্ণনামে বা কৃষ্ণভজনে অপরাধের বিচার করিতে পারে, কিন্তু গৌর-নিত্যানন্দে সে সব বিচার নাই, অর্থাৎ গৌর-নিতাই-নামে ও গৌর-নিতাই-ভজনে অপরাধের বিচার নাই। থাকিবেই বা কিরূপে? বরাবর ছিল, জীব ভগবানকে সাধে—এস প্রভু, এস ইত্যাদি। এবার গৌর আসিলেন জীবকে সাধিতে—এস জীব, এস ইত্যাদি। নিতাইর ত কথাই নাই। ‘যারে দেখে তারে বলে দস্তে তুল ধরি। আমরা কি নিয়া লহ ভজ গৌরহরি।’ পাত্রাপাত্র বিচার নাই। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া-র কথা ত কহিবার নয়—জীবোদ্ধারের জন্ত—শুধু উদ্ধার নয়, উদ্ধার ত সামান্য কথা, জীবকে প্রেম দেওয়ার জন্ত স্বীয় প্রাণবল্লভকে জগতে বিলাইয়া দিলেন। কৃষ্ণ ব্রজে প্রেমের লীলা করিলেও বাহিরে তিনি দণ্ডধারী রাজা বা বিচারক হইলেন, হইয়া অনুর-নিধনাদি করিলেন। গৌর নদীয়ায় প্রেমের লীলা করিয়া দণ্ড লইয়া বাহির হইলেন বটে, নিতাই সে দণ্ডটিকে ভাঙ্গিয়া দণ্ডভাঙ্গার স্রোতজলে ভাসাইয়া দিলেন। গৌর আর দণ্ডধারী-বিচারক রহিলেন না। আর নিতাই প্রেমের পাণ্ডারে বিশ্ব ভাসাইলেন। তাই নিতাইর শক্ত্যবেশাবতার

ঠাকুর নরোত্তম কহিলেন—‘গৌরা সম কেহ নয়, না ভজিতে দেয় প্রেমধন।’ আবার কহিলেন, ‘যে গৌরাস্ত্রের নাম লয়, তার হর প্রেমোদয়, তারে মুই যাই বলিহারি। গৌরাস্ত্রের মধুরলীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় নির্মল ভেল তার।’ ইত্যাদি। মধুরলীলা বলিতে দাস্ত-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর এই ভাব-চতুষ্টয়ের মধুর ভাবের কথা, অর্থাৎ গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার কথাই বলা হইয়াছে। তাই তিনি গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-সেবা প্রকাশ করিলেন। গৌরনামে-প্রেমোদয় হয়, গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-লীলা আশ্বাদনে হৃদয় নির্মল হয়, স্মৃতির সেই হৃদয়ে লাভ পূজাপ্রতিষ্ঠাদিরূপ মলিনতার স্থান কোথায়? ভুক্তিমুক্তিপিশাচী নির্মলচিন্তে স্থান পায় না। উপশাধার আর আশঙ্কা নাই। প্রেম পাইলে অপরাধের উদ্বেকেরই আশঙ্কা নাই, বিচার হইবে কিসের? বৈষ্ণবাপরাধ কি? না—বৈষ্ণবকে গ্রহণ করা, তাঁর নিন্দা করা, তাঁকে দেখিয়া ছষ্ট না হওয়া ইত্যাদি ছয় রকম। গৌরনামে প্রেমোদয় হইলে গৌরগণের উপর—বিশ্বব্যাপী জনগণের উপর স্বতঃই ভালবাসা জন্মিবে। অপরাধের অবসর কোথায়? স্মৃতিতে গৌরভজন করাই কবিরাজ গোস্বামীর সারসিদ্ধান্ত। মহাপ্রভু যে শ্রীরূপকে ও সনাতনকে শিক্ষা দিলেন, কবিরাজ গোস্বামী তাহা বিস্তার করিয়া বর্ণনার উদ্দেশ্যে তিনি তৎপূর্বেই বলিয়াছেন যে, মহাপ্রভুর মহিমা কহিবার জন্তই তিনি কৃষ্ণলীলা বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন। তিনি পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন, এই যে বস্তুটা কৃষ্ণভজনের কথা এত বিস্তৃত করিয়া রূপসনাতনকে কহিতেছেন—‘সেই ত গোবিন্দ-সাক্ষাৎ চৈতন্ত গোসাক্ষি।’

শ্রীরূপকে মহাপ্রভু কৃষ্ণভজনের কথা বহু শিক্ষা দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিজের ভজন অর্থাৎ গৌরভজন কার্যতঃ প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণলীলা এবং কৃষ্ণলীলাস্থলী প্রকাশের জন্ত শ্রীরূপ বৃন্দাবন বাইয়া অপ্রাকৃতভাবে শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ পাইলেন। তিনি একদিন যমুনাতীরে বসিয়া ভাবিতেছেন, ‘প্রভু ত আমাকে পাঠাইলেন। এখানে গোবিন্দদেবও আছেন। কিরূপে তাঁহার দর্শন পাইব?’ এমন সময় ব্রজবাসীর আকৃতি ধরিয়া একটা সুন্দর পুরুষ আসিয়া কহিলেন, ‘গুমাটীলা নামক স্থানে

গোবিন্দদেবের শ্রীবিগ্রহ আছেন, সেখানে প্রত্যহ পূর্বাঙ্কে একটি গাভী আসিয়া তাঁহাকে দুগ্ধ পান করাইয়া যায়।’ ইহা কহিয়া তিনি অপ্রাকৃতভাবে অদৃশ্য হইলেন। শ্রীরূপ ব্রজবাসিগণের সহিত সেখানে যাইয়া শ্রীমূর্তি আনয়ন করেন ও সেবা স্থাপন করেন। এই সংবাদ শ্রীরূপ পত্রদ্বারা প্রভুকে জানাইলেন। প্রভু তখন কাশীশ্বরকে কহিলেন, ‘তোমার বৃন্দাবন যাইতে হইবে।’ কাশীশ্বর প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন, আত্মা লজ্জন করিতেও পারেন না, প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতেও মন উঠেনা। ঈশ্বরপুরী কাশী-শ্বরকে গৌরসেবার জন্তই পাঠাইয়াছিলেন, গৌরসেবা করিয়াই কাশীশ্বর কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন, পূর্ণ হইয়াছেন, গৌরভজনই জীবনের সারসর্কস্ব করিয়াছেন। তাঁর কৃষ্ণ বিষ্ণু সকলই গৌর। তাই তিনি একটু আনমনা হইলেন। প্রভু তাঁহার হৃদয় বুঝিয়া তাঁহাকে গৌরগোবিন্দ বিগ্রহ দিয়া কহিলেন,— ‘আমাতে ও এই বিগ্রহে কোন ভেদ নাই, গোবিন্দের দক্ষিণে এই বিগ্রহটী রাখিয়া তুমি আমার সেবা করিও।’ ইহা কহিয়া প্রভু সেই বিগ্রহটী লইয়া একসাথে ভোজন করিলেন। কাশীশ্বরের আর বিধা রহিলনা। তিনি এই গৌরগোবিন্দবিগ্রহ লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপের সন্নিধানে গেলেন। শ্রীরূপও প্রভুর আত্মায় গোবিন্দের দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীগৌরগোবিন্দবিগ্রহ-সেবা স্থাপন করিলেন। এই ভাবে শ্রীগৌরানন্দসুন্দর কার্য্যতঃ স্বীয় ভজন প্রকাশ করিলেন।

প্রভু দশদিন ধরিয়া শ্রীরূপকে শিক্ষা দিলেন বটে, কিন্তু একটি কার্য্য তাঁহার বাকী রহিল। রস বস্তুটি কি, তাহা প্রভু বলিয়াছেন, মধুর রস যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—নিজাঙ্গ দিয়া সেবা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা, তাহাও বলিয়াছেন। সকল বলা শেষ হইলে প্রভু তাঁহাকে কহিলেন—

ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ ক্ষুরে অস্তরে।

কৃষ্ণ-কৃপায় অস্ত পায় রসসিদ্ধিপারে ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ১৯শ, ১৯২

অর্থাৎ, প্রভু কহিতেছেন, আমি যাহা কহিলাম, তাহা ভাবিতে ভাবিতে হৃদয়ে কৃষ্ণক্ষুণ্টি প্রাপ্ত হইবে, এবং কৃষ্ণের কৃপায় রসসিদ্ধিব সীমায় পৌছিবে। অস্ত ব্যক্তিই কৃপা প্রভাবে সেই সীমায় পৌছান, আর তুমি ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। এই

বলিয়া প্রভু রূপকে আলিঙ্গন দিয়া শক্তিসংকার করিলেন। প্রভুর এই কথার তাৎপর্য্য কি? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকাব বলিয়াছেন, শ্রীগৌরান্দ “পরতত্ত্বসীমা,” সুতরাং শ্রীগৌরই যে রসতত্ত্বসীমা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ‘পর’ বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তুটী হইলেন ভগবান্, তিনি রসস্বরূপ—রসো বৈ সঃ। সুতরাং পরতত্ত্ব বলিতে রসতত্ত্বসীমাই বুঝায়। আবার “আত্ম এব পররসঃ।” সুতরাং মধুর রসময় মূর্তিই হইলেন শ্রীভগবান্। মহাজনগণ বলিয়া থাকেন—কৃষ্ণই গোরে পূর্ণপ্রকাশমান, ব্রজলীলা নবদ্বীপলীলায় পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত। সুতরাং ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণক্ষুণ্টি হইলে শ্রীকৃষ্ণেরই কৃপায় রূপ সেই রসসিদ্ধির সীমা রসরাজ শ্রীগৌরানন্দসুন্দর যাইয়া পৌছিবেন, ইহাই শ্রীগৌরানন্দের উপরিউক্ত কথার নিগূঢ় অর্থ বলিয়া মনে হয়। প্রভু ইহা কহিলেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ উপলব্ধি করান বাকী রহিল। বিপ্রলস্ত ব্যতিরেকে রসের প্রকৃত উপলব্ধি হয় না, রস পূর্ণ উপভোগ্য হয় না। এই বিপ্রলস্তের মধ্য দিয়া শ্রীরূপকে রাখাক্ষ মিলন ও বিরহ এবং তাহারই পূর্ণপ্রকাশ গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার মিলন ও বিরহ বুঝাইতে হইবে। তাই পরদিন প্রভাতে প্রভু শ্রীরূপকে কহিয়া বারান্দায় চলিতেছেন। রূপ নিবেদন করিলেন, ‘প্রভু, আত্মা দেও, আমিও শ্রীচরণ সঙ্গে আসি। তোমার বিরহ আমি সহিতে পারিব না—

সহিতে না পারি মুক্তি বিরহতরঙ্গে ॥

প্রভু কহিলেন, ‘না, রূপ, আমার কথা শোন, বৃন্দাবনের কাছে আসিয়াছ, এখন শ্রীবৃন্দাবন যাও। সেখান হইতে গোড়দেশ দিয়া নীলাচলে যাইয়া আমার সহিত মিলিত হইও।’ কি গম্ভীর প্রভুর কথা! কি নিষ্ঠুর-দরাল আমাদের গৌর! কি গভীরার্থব্যঞ্জক প্রভুর শ্রীমুখের বাক্য! মস্তিষ্ক ছাড়িয়া রাজার মত ভোগৈশ্বর্য্য তৃণবৎ ফেলিয়া তদপেক্ষা অনন্তকোটিগুণে সুখসিদ্ধ শ্রীগৌরচরণে স্থান লইয়াছেন। সেই গৌরও শ্রীচরণে স্থান দিয়া আমার সঙ্গে রাখিতে চাহিতেছেন না! বাস্তবতঃ দেখা যায় কি নিষ্ঠুররালী! বস্তুতঃ এ যে দয়ার চরম! গৌরবিরহ যে কি বিষম বস্তু—‘তপ্ত ইক্ষু চর্কণ, অখচ না যায় ত্যজন,’ ইহা রূপকে বুঝাইতে হইবে। নহিলে গ্রেস বুঝিবে কিরূপে! ব্রজলীলারসই বা জীবকে পরিবেশন করিবে কিরূপে! বস্তুতঃ তাহাই হইল। প্রভু রূপকে আলিঙ্গন করিয়া নোকায়

চড়িলেন, আর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তীরে মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন।
নিরপেক্ষ প্রভু না থামিয়া চলিয়াই গেলেন। দাক্ষিণাত্য
বিপ্র অতি সন্তপনে তাঁহা চেনন করাইয়া গৃহে লইয়া গেলেন।
তদনন্তর দুই ভাই শ্রীকৃষ্ণ ও বল্লভ বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন, গোরের বিরহে তাঁহারই এই অবস্থা!
আর যিনি নিজাঙ্গ দিয়া প্রভুর সেবা করিয়াছেন, সেই
শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ায় অবস্থা ত ধারণার অতীত! প্রভু
শ্রীকৃষ্ণকে মধুর রসের কথা কহিতে বাইয়া কহিয়াছেন—
কাস্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।

অন্তএব মধুর রসে হয় পঞ্চগুণ ॥

এই কথা কহিয়াই প্রভু মধুর রসের বর্ণনা সমাপ্ত
করিয়াছেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণের মনে পড়িল, সেই সঙ্গে তিনি

ভাবিলেন,—দেবী-বিষ্ণুপ্রিয়া না জানি কি বিষম দাবদাহে
সতত জলিতেছেন। শচীদেবী ও দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া এই
দুইটা দেবীর কথা স্বতঃই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তে উদ্ভিত হইতে
লাগিল। এবং তিনি আরো ভাবিলেন,—এই জন্মই বুঝি
প্রভু এই দেবীদ্বয়ের বিরহকাতর দশা সম্যক জানিবার
জন্ম তাঁহাকে গোড়দেশ দিয়া নীলাচলে বাইতে বলিয়াছেন।
বস্তুতঃ এই গোরবিরহই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরস আশ্বাদনের ভিত্তি
হইল। শ্রীবৃন্দাবনে বাইয়া রাধাকৃষ্ণবিরহরস ও গোর
বিষ্ণুপ্রিয়াবিরহ-রস মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া ‘রস’ বস্তুটী
কি তাহা প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন। ইহাই তিনি ভজনে ও
লেখায় ব্যক্ত করিয়াছেন

ক্রমশঃ

গৌরনারায়ণ

জানদা—রংপুর

কীরোদ অনন্ত’পরি আছ নারায়ণ।
রত্নাকর পূজিয়াছে দিয়া রত্নগণ ॥
লক্ষ্মীদেবী রূপে শুণে তোষণে তোমায়।
গীতবাস্তে সরস্বতী যোহিত করয় ॥
ফলফুলে পূজা করে মুনিঋষিগণ।
ফলের অভাব তব না হয় কখন ॥
মোক্ষ-ফল নারায়ণ দান কর সবে।
কতজন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়ে তোমা সেবে ॥

দুর্কীও যে তব লোশ কিসে পূজি হয়।
গঙ্গাঙ্গল সেও তব চরণেতে হয় ॥
কি অভাব আছে তব কি দিব হে হবি।
আমার এ মন প্রাণ শুধু দিতে পারি।
দেহ স্থান শ্রীচরণে ওহে নারায়ণ।
আর যেন অন্ত দিকে নাহি ধায় মন ॥

শ্রীভগবানে নির্ভরতা ও পরলোকে বিশ্বাস

শ্রীমণ্ডলকান্তি ঘোষ ভক্তিবৃন্দ

প্রিয়জনের বিরোধের দ্বারা দুঃখ বোধ হয় আর নাই। তবে যিনি শ্রীভগবানকে দীনদয়াদ্র'নাথ, পতিত-পাবন, কাকালের ঠাকুর বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন, এবং মৃত্যুর পর পরলোকগত প্রিয়জনের সহিত আবার মিলিত হইব—এই বিশ্বাস বাহার বন্ধনুল, তাহাকে প্রিয়জনের বিরোধজনিত শোকদুঃখ বিচলিত করিতে পারে না। সংসারে এইরূপ ঘটনার অভাব নাই। নিম্নে একটা বিবৃতি করিতেছি :—

ফরিদপুর-নিবাসী (বর্তমানে নিত্যানামপ্রাপ্ত) জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্যসমাজে, এবং বিশেষতঃ আধুনিক গোড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীমধ্যে বিশেষভাবে জানিত ও সমাদৃত। জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন,—“আমার সোদরোপম ভ্রাতা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের রাজনৈতিক শিল্পরূপে অমৃত-বাক্সার পত্রিকায় লিখিতাম।” রাজনীতি-সম্বন্ধে এই তাঁহার হাতে খড়ি হইলেও তিনি সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়েই বেশী লিখিতেন। ব্যঙ্গকাব্য লিখিতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এই সময় মাইকেল মধুসূদনের ‘মেঘনাদ-বধ কাব্য’ প্রকাশিত হয়। মাইকেলই প্রথমে অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাঙ্গলা কবিতা লেখেন। এই ছন্দ লইয়া সে সময় বাঙ্গলা-সাহিত্যিকদিগের মধ্যে আন্দোলন আলোচনা চলিতেছিল। এই মেঘনাদ-বধের অনুকরণে জগদ্বন্ধুবাবু অমিত্রাক্ষর ছন্দে ‘ছুছুন্দরী-বধ কাব্য’ নাম দিয়া একটি ব্যঙ্গ-কবিতা লেখেন। এরূপ উৎকৃষ্ট বিজ্ঞপ-কাব্য বঙ্গভাষায় বোধ হয় আর বাহির হয় নাই। উহা সেই সময় অমৃত-বাক্সার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং ইহা পাঠ করিয়া অনেকেই, এমন কি, স্বয়ং মাইকেল মধুসূদন পর্য্যন্তও হস্ত সঞ্চরণ করিতে পারেন নাই।

বৈষ্ণব-সাহিত্যেও ভদ্রমহাশয় বিশেষ অগ্রগামী ছিলেন। ষষ্ঠ বর্ষের (৪১০ পৌরাষ) শ্রীশ্রীবিষ্ণুচন্দ্রিকা পত্রিকায় তিনি লেখেন,—“অন্যান্য বিংশতিবর্ষ পূর্বে মদীয় শ্রদ্ধাশ্রদ্ধ হৃদয়বদ্ধ শ্রীঅমিয়নিমাই চরিতের বঙ্গবিশুদ্ধনামা গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত

শিশিরকুমার ঘোষের উৎসাহ ও উপদেশে এই দীন বৈষ্ণবদাস কর্তৃক শিক্ষিত বাঙ্গালী-পাঠকের পাঠের উপযুক্ত আকারে ‘মহাজ্ঞান পদাবলী সংগ্রহ’ নাম দিয়া সর্বপ্রথমে বিজ্ঞাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রকাশিত হয়।”

জগদ্বন্ধুবাবু যে সময় এবং যেরূপ পাণ্ডিত্যের সহিত এই বৈষ্ণব-পদাবলী প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহাকে ইহার পথ-প্রদর্শক বলা যাইতে পারে। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলাদ্বয় পদেব সংগ্রহ-গ্রন্থ সে যুগে বিরল ছিল না বটে, কিন্তু শ্রীগৌরলীলা-বিষয়ক পদের সংগ্রহে তিনিই যে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তিনি যদি সে সময় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে ঐগুলি সংগ্রহ এবং ইহা মুদ্রিত করিবার জন্য অর্থসংগ্রহ না করিতেন, তাহা হইলে অন্তান্ত বহুপদের দ্বারা এই সংগৃহীত পদরত্নসমূহও অন্ততঃ আংশিকভাবে বিলুপ্ত হইত।

এত যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া যখন তিনি এই কার্য শেষ করিয়া সোমাস্তির নিখাস ত্যাগ করিবেন ভাবিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় তাঁহার উপর বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল।

এখন জগদ্বন্ধু বাবুর কথা শুনি। তাঁহার বৃহৎ পরিবার,—স্ত্রী পুত্র, কন্যা জামাতা, পৌত্র পৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রী প্রভৃতি লইয়া তিনি চাঁদের হাট বসাইয়াছিলেন। জগদ্বন্ধুবাবুর দ্বারা গৌরগতপ্রাণ অতি বিরল। তাই তিনি তখন বৃদ্ধ হইলেও—রসিকশেখর তাঁহাকে লইয়া রঙ্গ করিতে ছাড়েন নাই—তাই তাঁহার চাঁদের হাট ভাঙ্গিয়া, এক একটি করিয়া রত্ন লুকাইয়া, আপন প্রিয়ভক্তের, এবং সেই সঙ্গে নিজের মহিমা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ বয়সে জগদ্বন্ধুবাবু যে সকল রত্ন-হারা হইয়াছিলেন, অপর কেহ হইলে হয়ত উদ্বাদগ্রস্ত হইতেন। ভদ্র মহাশয়ও প্রথমে কিছু দিশাহারা হইয়াছিলেন। কিন্তু যিনি শ্রীগৌরানন্দসুন্দরকে মনে প্রাণে দীনজনবন্ধু, কাকালের ঠাকুর, অনাধনাথ, অগতির গতি বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি কখনই বিশ্বাস করিতে পারেন না যে,—আমরা বাহা-

দিগকে অতি প্রিয়জন বলিয়া পাইয়াছি, তাহাদিগের সহিত এই মর-জগতেই আমাদের মধুর-সম্বন্ধ শেষ হইবে। জগদ্বন্ধু বাবুর মনে অটল বিশ্বাস ছিল যে, ‘শ্রীপ্রভু’ যাহাদিগকে লইয়া গিয়াছেন, তাহারা তাঁহার শীতল চরণে স্থান পাইয়াছে, এবং সময় হইলে আমরাও সেখানে যাইয়া তাহাদিগের সহিত মিলিত হইব।’

এইরূপে উপযু্যপরি কতকগুলি শোকতাপ পাইবার পব, একদিন হঠাৎ তাঁহার অতিপ্রিয় ১৪ বৎসরের মাতৃহারা পৌত্র যতীন্দ্রকুমারকে শ্রীপ্রভু তাঁহাদের ক্রোড় হইতে আপন সুশীতল ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। এই মাতৃহারা শিশুটির শেষ মুহূর্ত্তের চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করিয়া ভদ্র মহাশয় তাঁহার কোন নিজজনকে একখানি পত্র লেখেন। ইহা পাঠ করিয়া জীবের অনেক মলিনতা দূর হইবে ভাবিয়া নিম্নে পত্রখানি প্রকাশ করিলাম।

১৪ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় আমি বাহিরের ঘরে যাইয়া একটি বন্ধুর সঙ্গে সবে মাত্র দুই একটি কথা কহিয়াছি, এমন সময় আমার জ্যেষ্ঠা-কন্যা আমাকে সম্মুখ বাটীর ভিতর যাইতে ডাকিল। আমি তৎক্ষণাৎ যাইয়া শুনিতে পাইলাম, প্রাণের যতীন তাহার পিতাকে কহিতেছে,—“দাদাবাবু আসিয়া কি করিবেন? বাবা, আমি কিছুই চখে দেখিতে পাইতেছি না।” আমি তাড়াতাড়ি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া যতীনের মুখের কাছে আলো ধরিয়া দেখি, তাহার নয়নদ্বয় অনৈসর্গিকরূপে বিস্ফারিত হইয়াছে। তখনই চখের জল চোখে সংবরণ করিয়া, যতীনের পিতা (আমার জ্যেষ্ঠপুত্র) শ্রীমান যোগেন্দ্রকে বলিলাম,—“বৎস! প্রস্তুত হও, প্রাণাধিক যতীন আর অল্প সময় মাত্র আমাদের নিকট আছে।”

আমাব পুত্র বীবের স্নায়ুমুখ সস্তানের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া কিঞ্চিদধিক চারিশত বৎসর পূর্বে মহাপ্রভুর পার্শ্বভক্ত শ্রীল শ্রীবাস-গৃহে যে চিত্রটি অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা মনে পড়িল। যোগেন শেষ কথাটি এই বলিয়া প্রাণাধিককে বিদায় দিল,—“বাও বাবা আনন্দধামে, সেখানে কোন কষ্ট নাই,—কেবলই সুখ, কেবলই ভূমানন্দ। এই ১৪ বৎসর তোমাকে যথাসাধ্য

লালন-পালন করিয়াছি; মনে হইতেছে, আমাদের কর্তব্য সুচারুভাবে সম্পাদন হয় নাই, তাই দয়াল প্রভু আপন ক্রোড়ে তোমায় লইতেছেন।”

এই ভীষণ সময়ে শ্রীমান যোগেন্দ্রের চক্ষে একফোটা জল নাই, স্বয়ং অবিকৃত। ইহা দেখিয়া আমি আপনাকে গর্বিত মনে করিলাম। আমার মত মলিন দুর্বল জীবের ঘরে এমন বীর ধার্মিক পুত্রের জন্ম পরম সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। এই সময়ে ডাক্তার সাহেবকে আনিবার জন্ত আমার জামাতা ও কনিষ্ঠ পুত্রকে পাঠাইয়াছিলাম। ডাক্তার আসিবার পূর্বেই বাছা আমার নিত্যনবদীপধামে দয়াল গৌর-নিতাইর কোমল শীতল ক্রোড়ে গৃহীত হইয়াছিল এবং শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত সজ্ঞানে ছিল। এরূপ মৃত্যু বুদ্ধেরও বাঞ্ছনীয়। অধম আমি স্বর্গযাত্রী বালকের শিরোদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, দয়াল প্রভুর নিকট তাহার ভার-গ্রহণের জন্ত প্রার্থনা করিতেছিলাম, এবং শ্রীগৌরানন্দ ও শ্রীনিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করিতেছিলাম। ধন্ত প্রভুর দয়া! আমার প্রার্থনা সে দয়ার দরবারে গৃহীত হইল! আমার পুত্রবধুর (যতীনের মাতার) মৃত্যুর পর আজ ২০ মাস যে যতীনকে পুত্রোপেক্ষা অধিক যত্নে লালন-পালন করিতেছিলাম, তাহার অমর-আত্মা দয়াময় গ্রহণ করিলেন! শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা শ্রীল শিশিরবাবু ৩০ বৎসর পূর্বে প্রেতভয়ে আমার বিশ্বাস জমাইয়াছিলেন। এ বিশ্বাস কল্পনাজনিত নহে,—ইহা প্রাণের বিশ্বাস, নিত্য বিশ্বাস—জীবন্ত বিশ্বাস, এবং এই অমূল্য বিশ্বাস-বলেই আমি তৎক্ষণাৎ উপরের ঘটনা জানিতে পারিলাম। যখন আমি প্রাণাধিক যতীনের শেষ সময় উপস্থিত জানাইলাম, তখন আমার স্ত্রী ও দুই কন্যা রোদন করিয়া উঠিলেন। কিন্তু আমি বেই তাহাদিগকে বলিলাম—“স্বর্গের দেবতা স্বর্গে যাইতেছেন, এ সময় তোমরা রোদন করিয়া তাঁহার শাস্তিভঙ্গ করিও না।” সুখের বিষয় এই যে, প্রাণাধিকের প্রাণত্যাগ পর্যন্ত তাহারা স্বর্গযাত্রীর মুখপানে চাহিয়া রোদন সংবরণ করিলেন। এই পৌত্রটি যথার্থই একটি নিখুঁত রত্ন ছিল। প্রাণ বুঝে না বলিয়াই সময় সময় তাহার জন্ত কাঁদি, কিন্তু বাস্তবিক বিশুদ্ধ রত্নাকরেই রত্ন যাইয়া পড়িয়াছে। শোক বুঝা।”

মহাত্মা শিশিরকুমারের একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ
শেষ করিলাম—

নিজস্বন নিষ্ঠুর আনে দয়া প্রচুর
ভক্তদ্বনে চঞ্চল আনে গভীর অটন
নব অহুরাগ সুধাভূষণ ।
যত অত্যাচার তোমার অঙ্গের ভূষণ আমার
সব সুধা বরিষণ প্রেমঅঙ্কুরেতে শিশির সিঞ্চন
পুলকিত দেখে গুচ রঙ্গ ॥

(আভোগ)

জানি না জানি না তোমারি মন
তবু বলে মোর মন তুমি নহ ভিন্ন জন
চিরদিন তোমায় আমার মধুর বন্ধন ।
প্রিয়-পরিজন যত নহে তোমারি মত
নিরমল পবিত্র ।
বলরাম দাস মাগে সঙ্গ ॥

Sree Gauranga's Entreaty to Netai

প্রভু কহে নিত্যানন্দ জীব সব হ'ল অন্ধ ইত্যাদি

বলরাম দাসের পদ অবলম্বনে ।

By Bidhu Bhusan Sarker

"Blinded are the men—they know not 'good'
None is conscious of the world to come—
Giv'n to sordid world in a vicious mood ;
What a shameless struggle with no qualm !
"Here this life hath nobler future there,
Each and ev'ry life hath sacred worth,
Man should live for man with brother's care,
Help-mate should he be for higher birth.
"Netai brother ! Be thou ever kind !
Go from door to door—this message bear ;
Sweeten ev'ry life however blind
With the precious gem of Bhakti rare.
"Why should timid fear make cowards all !
Life is sacred, life is love and bliss—
Let them hear the Highest Heaven's call,
See that none this happy message miss !
"Let them dance and dance in joy divine !
Sing the Name of Hari sweet ; and so

Ev'ry house should be a holy shrine ;
Death with timorous flight should ever go.
"Bless the vilest scoffer's sinner's life
With the Holy Name ! Let none escape,
Free them from the worthless wretched strife !
Love and Love Divine should make
them safe !
"See that male and female, young and old,
High and low, and those who argue vain,
Pedants that are stupid, callous, cold,
Love, the Highest End may all attain !
"Netai ! flood the Earth with waves of Love !
Plunge the people in the sea of Bliss !
Make immortal all to rise above !
—Kirtan loud the only way to this."
Gaur exhorted Netai thus so sweet,
Puri left He glad at this behest,
Mad with prem He ran with Bhaktas meet ;—
Friend was He to all—their Heav'nly Guest,

শিশিরকুমার ও শিরোমণি-সার্বভৌম ।

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন ঘোষ

একই অমুরাগ-সূত্রে গ্রথিত হইয়া তিনটি বন্ধু প্রায় সমকালে জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, বাংলায় মহাত্মা শিশিরকুমার ও শ্রীহরিশ্রীমোহন শিবোমণি, আর শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীমধুসূদন সার্বভৌম । মহাপ্রভু শ্রীগোরাঙ্গে অসাধারণ অমুরাগ এই তিন জনকে সম্মিলিত করিয়াছিল ।

সুপ্রসিদ্ধ অমৃতবাজার পত্রিকার সংস্থাপক ও পরিচালক জগৎপ্রসিদ্ধ শিশিরকুমার ঘোষ ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক অসামান্য পুরুষ ছিলেন । লোকমাত্রে বাল গঙ্গাধর তিলক ও গোপালকৃষ্ণ গোখলে শিশিরকুমারের চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া রাজনীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন । বহির্জগতে শিশিরকুমারের ইহা এক বড় পরিচয় বটে, কিন্তু অন্তর্জগতে তাঁহার আর একটি পরিচয় ছিল । উহা তাঁহার কম পরিচয় নহে । তাঁহার অন্তরঙ্গ প্রিয়জনগণের ধারণা, উহাই তাঁহার সর্বাপেক্ষা বড় পরিচয় এবং শিশিরকুমারকে স্বার্থতঃ জানিতে হইলে, উহারই ভিতর দিয়া জানিতে হইবে । সেই পরিচয়টি এই যে—তিনি “গৌর” “গৌর” বলিয়া কাদিতেন ।

সে বহুদিনের কথা । স্বাধীন ত্রিপুরার রাজধানী আগড়-তলায় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের মন্ত্রী-সভায় তৎকাল একটি গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনা হয় । আলোচনায় স্থিরীকৃত হয়, কলিকাতার কোন শক্তিশালী সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় স্তম্ভে উক্ত বিষয় লেখাইতে হইবে । বিখ্যাত অমৃতবাজার পত্রিকা ও তাহার সুদক্ষ সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মহোদয়ের কথা প্রস্তাবিত হইল । সভায় জটিল মন্তব্যাকুশল অমাত্য একটু হাসিয়া বলিলেন,—“মহারাজ, শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় শক্তিশালী লেখক সন্দেহ নাই, আর তাঁহার অমৃতবাজার পত্রিকাও বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী ; কিন্তু মহারাজ, কি বলব, আজ কিছুদিন ধাবৎ লোকটির কি হইয়াছে, তিনি ‘গৌর’ ‘গৌর’ বলিয়া কাদেন । ইহাই তাঁহার বা কিছু দোষ, নতুবা আর কিছুই আপত্তি করিবার নাই ।” মহারাজ ইহা শ্রবণ করিলেন, কোন কথা বলিলেন না । মন্ত্রীবরের সামান্য

আপত্তি সত্ত্বেও দরবারে স্থিরীকৃত হইল, অমৃতবাজার পত্রিকায় এ বিষয় আলোচনা করাইতে হইবে ।

পরমবৈষ্ণব মহারাজ বীরচন্দ্র গভীর রজনীতে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারি ভক্তপ্রবর শ্রীল রাধারমণ ঘোষ মহাশয়কে আহ্বান করিলেন । রাধারমণবাবু আসিলে, মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাধারমণ, শুনিতে পাইলাম, কলিকাতায় নাকি একজন বড় পত্রিকা-সম্পাদক আছেন, তিনি ‘গৌর’ ‘গৌর’ বলিয়া কাদেন ? বলতো, তিনি কে, তুমি কি তাঁহাকে জান ?” রাধারমণ বিনম্রভাবে উত্তর করিলেন, “মহারাজ, তিনি শিশিরকুমার ঘোষ, সুবিখ্যাত অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক । মহারাজ যাহা শ্রবণ করিয়াছেন তাহা সত্য । স্বার্থতঃই তাঁহার মতন গৌর-অমুরাগী লোক আর দেখা যায় না ।” মহারাজা বলিলেন,—“রাধারমণ, তাঁহাকে আমার দেখিবে বড় ইচ্ছা হয় । বলতো কিরূপে দেখা হইতে পারে ?” রাধারমণ উত্তর করিলেন—“মহারাজ যখন কলিকাতায় যাইবেন, তখনই তাহার ব্যবস্থা হইতে পারিবে ।”

সে ব্যবস্থা—মহারাজা বীরচন্দ্রের সহিত শিশিরকুমারের মিলনের সুব্যবস্থা—কখনও হইয়াছিল কিনা, তাহা আমরা বিশেষভাবে জানি না, কিন্তু মহারাজা বীরচন্দ্রের হৃদয়ে শিশিরকুমারের এই যে পরিচয়টি, ইহা চিরকাল অমুরাগের লোহিত-রাগে রঞ্জিত ছিল ।

রাজনৈতিক জগৎ ভাঙ্গিয়া যাইবে, কিন্তু শিশিরকুমারের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীকালচাঁদ গীতা ও তাঁহার শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত তাঁহাকে এমন এক জগতের অধিকারী করিয়া রাখিয়াছে, যাহা কখনও ভাঙ্গিবে না । সেই অমর-জগতে শিশিরকুমার চিরকালের নিমিত্ত অমর হইয়া থাকিবেন । তাঁহার শ্রীকালচাঁদ ও শ্রীঅমিয়নিমাই অমৃতধারা বর্ষণ দ্বারা জগতের দম্ভ ও তুষ্টি জনগণকে চিরশান্তি প্রদান করিবেন ।

শিশিরকুমারের সহিত শিরোমণি হরিশ্রীমোহন কখন মিলিত হইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতেছি

না, তবে উহা যে তাঁহার ১ম ও ২য় খণ্ড শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত প্রচারিত হওয়ার পরে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যখন শ্রীঅমিয়নিমাই চরিতের মধ্যমী গোরলীলা-গাথা সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল এবং উহার ভিতর দিয়া শিশিরকুমারের গৌর-প্রেমের তরঙ্গ বাংলার শিক্ষিত নরনারীগণের প্রাণে আঘাত করিয়া প্রেমের এক অপূর্ণ উন্মাদনা জাগাইয়া দিয়াছিল, সেই সময়েই গৌর-অম্বরগামী হরিমোহন আকুল হইয়া শিশিরকুমারের সহিত মিলিবার নিমিত্ত ছুটিয়াছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের প্রথম মিলনের কথা শিরোমণি মহাশয় এইরূপে স্বীয় মুখে বর্ণন করিয়াছেন :-

আমি শিশিরবাবুকে দেখিবার জন্য কলিকাতায় তাঁহার গৃহে যাইয়া উঠিলাম। যখন তাঁহার প্রেমময় মুখটি নয়নে পতিত হইল, ভিতর হইতে একটা আকুল কান্না আসিয়া আমাকে বিহ্বল করিয়া ফেলিল। আমি কোন কথা বলিতে পারিলাম না। কেবল আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি ব্যস্ত হইয়া আমার নিকটে আসিলেন এবং গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, “ওগো, তুমি কে আমাকে দেখিয়া কাঁদিতেছ, তুমি নিশ্চয়ই আমার প্রভুর নিজন হইবে, নতুবা এমন হয়না।” ইহাই বলিতে বলিতে আমাকে দুই বাঁহ দ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রথম দর্শনেই আমরা প্রাতঃপ্রেমে বদ্ধ হইয়া কাঁদিলাম। মিলনের প্রথম আবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে তিনি স্থির হইয়া রহিলেন এবং পরিচয়াদির পরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—“ভাই হরিমোহন, তোমাদের বৈষ্ণবগ্রন্থে যখন সর্বপ্রথমে পড়িলাম, ‘হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর,’ ভাবিলাম, হরি বলিতে চক্ষে জলধারা বহিবে, এ কেমন কথা, একেবারেই ঠিক নহে। ক্রমে ক্রমে দেখিলাম, কি আশ্চর্য্য, আমি যে কঠিন পাষণ্ড, আমারও চক্ষে হরি বলিতে জল আসিল। আর আজ এ কি দেখিতেছি, সেই আমাকে দেখিতে আসিয়া ভাই, তুমিও কাঁদিলে! আমার শ্রীগোরাঙ্গের একি অদ্ভুত খেলা!” ইহাই বলিয়া শিশিরকুমার আবার বালকের মতন কাঁদিতে লাগিলেন।

এইরূপে শিরোমণি শিশিরকুমারের নিকটস্থ ও নিজন হইয়াছিলেন। চিরকাল তাঁহাদের অন্তরে অন্তরে একটি ঘনিষ্ঠ যোগবন্ধ বিস্তারিত ছিল। বরাবর দেখিরাছি, যখনই শিরোমণির নিকটে শিশিরকুমারের নাম উল্লেখ করিতাম, তিনি প্রেমে বিগলিত হইয়া রোদন করিতেন। আবার শিশিরকুমারকেও তদুপরি দর্শন করিয়াছি।—এই

অধম লেখক যখন সর্বপ্রথমে শিশিরকুমারের চরণ দর্শন করিয়া শিরোমণির কথা তাঁহার নিকটে নিবেদন করিয়াছিল, শিশিরকুমার শ্রবণ করিয়া বালকের স্তম্ভ হো হো করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; বলিলেন, “আমার হরিমোহন, আমার হরিমোহন, ওগো? আমি যে তাহাকে আমার শ্রীগোরাঙ্গের রাজ্যের রাজা করিয়াছি।”

এমনই ভাবে আর একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি তাঁহাদের দ্বৈত-অম্বরগময় অন্তরঙ্গ বন্ধুতার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী গৌরভক্ত পরমপণ্ডিত শ্রীমধুসূদন গোস্বামী সার্বভৌম। বাংলা ১৩৩০ সালে শ্রীধাম বৃন্দাবনে আমি তাঁহার সমীপস্থ হই এবং কিয়ৎকাল তাঁহার সাহচর্য্যে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করি। বৃন্দাবনে সর্বজনমান্য এত বড় শক্তিশালী পণ্ডিত, শ্রীরাধা-রমণের সেবায়ত, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে মহাপ্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহার বালকের স্তম্ভ সরলতা ও প্রগাঢ় গৌরপ্রেম দর্শনে বিস্মিত হইয়াছিলাম। শিশিরকুমারের কথা উঠিলে তিনি প্রেমে বিগলিত হইয়া দশ-মুখে তাঁহার কথা বলিতে থাকিতেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে মধুসূদন শিশির-মহিমা বলিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন, “দেখুন, আমি যখন সর্বপ্রথমে কলিকাতায় শিশিরবাবুকে দর্শন করিতে যাই, অতি ভয়ে ভয়ে তাঁহার নিকটস্থ হই, ভাবিলাম শিশিরকুমার কি তাঁহার পবিত্র সঙ্গ আমাকে প্রদান করিবেন। মহাপ্রভুর নিকটে মনে মনে প্রার্থনা করিলাম, ‘হে প্রভু, আমাকে শিশিরকুমারের সঙ্গ প্রদান কর।’ যখন যথার্থই সেই মুক্তিটর সম্মুখে দাঁড়াইবার সৌভাগ্য লাভ করিলাম, দেখিলাম ও মনে মনে ভাবিলাম, ওটি প্রাকৃতিক বস্তু নহে, ওটি চিরময় বৈষ্ণববিগ্রহ। ভাবিতেই ইচ্ছা হইল, তাঁহার চরণ দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদি।”

ভগবৎ প্রেমে মাছুষকে কত উদার ও মহৎ করে, মধুসূদনের সরল প্রাণের এই সত্য উক্তিতে তাহা প্রমাণিত হয়। মধুসূদনের এই উক্তিটি একদিন শিরোমণি হরিমোহনের নিকটে বলিলে, তিনি প্রেমগদগদকণ্ঠে আমাকে বলিয়াছিলেন, “দেখ মধুসূদন যথার্থই বলিয়াছেন। আমিও যখন সর্বপ্রথমে শিশিরকুমারকে দর্শন করি, আমিও ভাবিলাম, তাঁহার চরণদুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদি।” ইহাই বলিয়া শিরোমণি ‘আমার শিশিরকুমার’ বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

অন্তঃপুরে অধ্যাপনা

শ্রীবিষ্ণুভূষণ সরকার

সন্ধ্যা সমাগমে নারী অগণনে
শটীর আলসে আসে,
গৌরাঙ্গ নাগর রসের সাগর
অধ্যাপকরূপে বসে।

শ্রীগৌরাঙ্গঃ—(গ্রন্থস্ত ডোরং উন্মোচ্য) শ্রয়তাম্। আদৌ
সন্ধিবৃত্তিরেবাধীতব্যা।

প্রথমা সখী—সন্ধির্যোগঃ; যোগস্ত মিলনম্। বয়সপি
মিলনং প্রার্থয়ামহে—মিলনমেব অধ্যোস্থ্যামঃ।

দ্বিতীয়া সখী—যুগলমিলনমতীব মনোহরং, সর্বচিত্তাকর্ষকম্
—এতাদৃশমধ্যয়নং সাদরং গ্রহীস্থ্যামঃ।

সর্বা মিলিত্বা—সত্যমেব সত্যমেব অধ্যাপকশিরোমণিবৈব
নাগররাজঃ।

তৃতীয়া সখী—ভোঃ ভোঃ মহাশয়! সঙ্কো বৃত্তিঃ?
সঙ্কো বৃত্তিঃ? কিঞ্চ সন্ধিরেব বৃত্তিঃ?

শ্রীগৌরাঙ্গঃ—ষাদুগবয় ইচ্ছতে, তাদুগেব গৃহ্যতাম্।

চতুর্থী সখী—বৃত্তিৰ্যাপারো বর্তমানতা বা কিঞ্চ কার্যাম্।
সঙ্কো মিলন বিষয়ে বৃত্তিঃ। কয়োর্মিলনম্?

অত্ৰা সখী—যুগলকিশোরমিলনমেব!

সর্বাঃ—মধুরং মধুরম্। (কাঞ্চনাং প্রতি) নবদ্বীপময়ী নবীন-
কিশোরী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া নাগরসম্মিধানে উপবিশতু। বয়ং
অধ্যয়নচ্ছলে যুগলমাধুরীমবলোক্য দর্শনং সফলী করিস্থ্যামঃ।

মধুরমধ্যয়নং! মধুরমধ্যয়নম্! এতদ্বৈবৈবপি বাঞ্ছিতম্।

শ্রীগৌরাঙ্গঃ—ন হি! ন হি! বর্ণয়োৰ্যোগঃ সন্ধিরূচ্যতে।

অমিত প্রভা—এতম্মিলনং শ্রীনবদ্বীপ এব সম্ভবতি! পুরা
বর্ণমিলনবিধৌ বৃথৈব প্রয়াসোহভূৎ। দুর্কাদলশ্যামলেন
সহ, পুনঃ নবজলধরশ্যাম বর্ণেন সহ পীতস্ত মিলনমাসীৎ!
অধুনা তু বয়ং পীতেন পীতস্ত মিলনং সাক্ষাদেব পশ্যামঃ।
এবম্ভূতো বর্ণযোগোহস্মাভির্বাঞ্ছ্যতে। অধ্যাপয়তু ভবান্
এতমেব বর্ণযোগম্!

কদলিকা—কিং বহুভাষিতেন? দৃষ্টান্তেনৈব সাক্ষা-
দশ্যতাম্।

ইন্দুমতী—সত্যমেবোচ্যতে। দৃষ্টান্তমন্তরেণ অধ্যা-
পনমধ্যয়নঞ্চ নিরর্থকম্। যতো বুদ্ধেরনধিগম্যং। বিশেষতোহ-
ল্পবুদ্ধিরবলা।

বসন্তমঞ্জরী—বয়ং খলু এতদেবাভিলষামঃ।

কাঞ্চনা—বিলম্বেনাশং।

আগম্যতাং, উপবিশ্যতাং বিষ্ণুপ্রিয়াস্তিকে। প্রত্যক্ষং
দৃষ্টান্তমবলোকয়ন্ত সর্বাঃ অপূর্ব-বর্ণযোগস্ত।

শ্রীগৌরাঙ্গঃ—অধ্যয়নকালে প্রগল্ভতা পরিহরয়ীয়া,
বাঙ্মনঃ সংযমেন শ্রয়তামধ্যাপকবচনম্। মা কুরুত
বাঙ্নিপ্পত্তিম্!

হেমন্তমঞ্জরী—অহো! কি বয়ং মুকাঃ? অধ্যয়নার্থং
স্বাভাবিকীং বাক্শক্তির্মপি পরিহরামঃ? কিং বয়ং জড়পিণ্ড-
বং নিশ্চলা এব তিষ্ঠামঃ? কীদৃশমধ্যয়নমেতৎ? কিন্তুতো
বা অধ্যাপকোহয়ম্?

অত্ৰা সখী—(হেমন্ত মঞ্জরীং প্রতি) কিমুক্তং সখি! কিং
ভূতোহয়ং অধ্যাপকঃ? (সর্বাঃ প্রতি) সখী হেমন্তমঞ্জরী
কথয়তি পরিপূর্ণবর্তমানো নিমাইপণ্ডিতোহধুনা ভূতাস্ব-
গতঃ! আশ্চর্য্যমেতৎ!

কাঞ্চনা—এককঃ গৌরাঙ্গসুন্দরঃ নহি পূর্ণঃ! প্রিয়য়া
সহ মিলিতশ্চেৎ, পূর্ণ এব। অতঃ স নহি পূর্ণবর্তমানঃ।

কদলিকা—সত্যমেব। তদ্ বয়ং পণ্ডিতং পূর্ণরূপম-
বলোকয়িতুমভিলষামঃ। তর্হি উপবিশতু সখী বিষ্ণুপ্রিয়া
অধ্যাপকসম্মিধৌ।

বসন্তমঞ্জরী—(বিষ্ণু প্রিয়াং প্রতি) এ হি! এ হি! সাধয়
নো নয়নানন্দং। দর্শয় নো যুগলমিলনং। পূর্ণস্বরূপং
শ্রীগৌরাঙ্গমবলোক্য পরমানন্দং প্রাপ্নুয়াম।

বিষ্ণুপ্রিয়া—সখীভিঃ পরিবৃতঃ সন্ পরিপূর্ণ-স্বরূপো
ভবতি। সখীমন্তরেণ কিং মে গমনেন? অস্মাভিঃ
সর্বাভিরেব নাথং পরিবৃত্য স্থীয়তাম্।

অমিতপ্রভা—বয়ং পরিত এব। স্বং হি নাথস্ত
বামপার্শ্বমলঙ্কর।

(এতদুক্তা বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরাঙ্গস্ত বামে স্থাপয়তি)।

শ্রীগৌরান্নঃ—নারায়ণ সর্বত্রৈব রসং কাস্তি । সর্বদেব
প্রিয়য়া সহ মিলনং মে বাঞ্ছন্তি । (প্রকাশং) (কৃত্রিমং
কোপং প্রদর্শ্য) চিত্রম্! অধ্যয়নকালে চ চঞ্চলতা! নৈবা
ভবতীষু শোভতে । কিং বৃথা কালক্ষেপেণ! শ্রম্যতাম্,
শ্রম্যতাং, প্রবক্ষ্যাম্যধুনা স্বরসন্ধিম্ ।

কাঞ্চনা—বয়মপি স্বরমৌলিনং শ্রোতামঃ । (উভয়োঃ
করমোর্বেণ নিধাপ্য) (প্রভুং প্রতি) বংশীবাদয়তু,
প্রাণবল্লভ! (শ্রীমতীং প্রতি) পুরয়তু বংশীং স্বরেন,
যেনোভয়োঃ স্বরমিলনং শ্রাং! আদিশতি শ্রীগৌরচন্দ্রঃ
শ্রোতুমতম্মিলনম্ ।

মধুর রাগিণী তু'লে প্রিয়ার বাঁশরী
গাহিল মধুর শব্দ “প্রাণ” মনোহারী ।

অপূর্ব লহরী তাহে গৌরান্ন তুলিল,
মধুর “আরাম” শব্দ নাগর গাহিল ।
মিলিয়া দৌহার স্বর “প্রাণারাম” ধ্বনি
উঠিল মাধবীতলে, নাচিল ধরণী ।
লহরীর পর আরো লহরী তুলিয়া
বাজাতে লাগিল দৌহে প্রেমতে গলিয়া ।
চলু চলু হুঁহু অঙ্গ, হুঁহু জনা ভোর,
অপূর্ব মিলন দৌহে—কিশোরী কিশোর ।
যুগল মিলন হেরি' নবীনা নাগরী
তালে তালে নৃত্য করে দৌহা ঘেরি' ঘেরি' ॥
কথঞ্চিৎ স্বরসন্ধি শেখা হ'ল আজ,
এইভাবে লীলা করে নব রসরাজ ।

পত্র সংগ্রহ

চট্টগ্রাম, শিবরাত্রি ১৩৫০ ।

[এই পত্রখানি শুক্লাসপ্তমি তিথিতে ইলুহার (বরিশাল) উৎসবের দিন শ্রীমায়ের স্মৃতিস্তম্ভের পাদমূলে অস্থগীত সভায় পঠিত হয়। পত্রখানি শ্রীমায়ের গুণমুগ্ধ সন্তান বাসুদেব জমিদার পরমভাগবত শ্রীল কিরণকুমার সেন শর্মা মহাশয়কে লিখিত।]

প্রাণের কিরণদা,

গত বৎসর এই তিথির (শিবরাত্রি) পরদিনই ইলুহার রওনা হই। আজ কেবলই মায়ের বাড়ীর কথা মনে আসিতেছে। ইলুহারেই আপনাদের প্রথম দর্শন পাই, সুতরাং মায়ের বাড়ীর স্মৃতির সঙ্গে আপনারাও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আপনাদের অহৈতুকী প্রীতিতেই আমার যতকিছু অম্লভূতি। আপনাদের অশাচিত স্নেহ কখনও ভুলিবার নয়।

এবার প্রিয়াজীর উৎসবে বাসুদেব যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নানা কারণে সেই সৌভাগ্য হয় নাই। কিন্তু আপনারা যে আমাকে স্মরণ করিয়াছেন তাহা দূরে থাকিয়াও অম্লভব করিয়াছি। আজ স্বপ্নে দেখি আপনি ও দাদা (শ্রীযুক্ত

বিধুভূষণ সরকার) আমাকে নিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আশ্বাদন করিতে চলিয়াছেন।

মা'র তিরোধান তিথির উৎসব আসিতেছে। গত বৎসরের মত এবার আর সেই উৎসবে যোগদানের সৌভাগ্য আমার হইবেনা। তাই গতবর্ষের স্মৃতিই আমার উপজীব্য।

মা'র প্রতি আপনাদের যেরূপ স্বাভাবিক অম্লরক্তি আগার তরুণ নয়। আপনারা যখন মায়ের অভাবের কথা ও সকলের প্রতি তাঁর অহৈতুকী স্নেহের কথা বলিতে বলিতে অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠেন, তখনই মা কি বস্তু ছিলেন আমার উপলব্ধি হয়। সেই উপলব্ধির ফল স্বরূপই আমার মাতৃমুগ্ধ দর্শন সৌভাগ্য ঘটে। তাই তিরোভাব উৎসব আমার নিকট আবির্ভাব উৎসব রূপে প্রতীয়মান হয়। আপনাদের ও সহস্র সহস্র ভক্তভাইদের মা'র প্রতি যে বিচ্ছেদজনিত মর্ম্মবেগ তাহাই আমাকে মাতৃদর্শনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তবে তফাৎ হইল এই, আপনারা সাংসারভাবে তাঁর স্নেহ আকর্ষণ করিয়া ধন্ত হইয়াছেন, আর আমি শুধু

ভাবের আবেশে তাঁকে বিশ্বমাতা ও জগদ্ধাত্রী বা যোগমায়া শক্তিরূপে দর্শন করিয়াছি। তবে এই দর্শনের বিশেষত্ব এই যে, ইহা অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের ত্রায় আমাকে ভীতি-বিহ্বল করিতে পারে নাই। তাঁর বহিরবয়ব ঐশ্বর্যের মূর্তি হইলেও তাঁর চোখ ও মুখে অনির্বচনীয় মাধুর্যের ছাপ। আমার মনে হয় রূপকেই সন্ন্যাসীর রাজ্য প্রবোধানন্দ 'স্নেহে মাতৃকোটা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

পাছে ইলুহার গিয়া আমরা সাক্ষাৎভাবে মাতৃমূর্তি অদর্শন জনিত ক্রেশ ভোগ করি, তাই ইলুহার যাত্রার প্রাক্কালে মা কৃপা করিয়া মেঘের আবরণ উন্মোচন করিয়া শ্রীমতী সুহাসকে একবার স্নেহাস্ত্রে আকর্ষণ করিয়া আবার মেঘের অন্তরালে লুকাইলেন। এই মূর্তিও পূর্নবর্ণিত বিশ্ব-মাতৃকার অনন্ত মাধুর্যপূর্ণ মূর্তি।

আজ আমার এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইরাছে যে ষাঁরা মাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন নাই, কিন্তু ষাঁদের ভবিষ্যতে প্রভুব ভক্ত হইবার সৌভাগ্য হইবে, তাঁরা যদি মার আদেশ ও অহৈতুকী স্নেহের জন্ত ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন, তবে মায়েব মধ্যে যে আদর্শ-মাতৃত্বের বিকাশ দৃষ্ট হইত তাহাও বিশ্বমাতৃকা-রূপে তাঁদের শোকে সাহস দিবে ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব সংস্থাপনে সকলকে উদ্বুদ্ধ করিবে। ভাই ভাই মিশিয়া আনন্দে খেলাধুলা করুক ইহা মায়েরই সবচেয়ে বড় সাধ। আর বিনি মাতৃত্বের আদর্শ তিনিই সকলকে বলিতে শিখান 'বিশ্বজোড়া মোরা সবে ভাই ভাই

আমাদের পর নাই।'

শচীরত্নলাল নিমাই বিশ্ববৈ সকলকে ভাই বলিয়া কোল দিলেন। তাহা হইলে দেখা যায় সর্বচিন্তাকর্ষী ন'দের লীলাব পটভূমিকায় শচীমার ত্রায় একজন বিশ্বমাতাব প্রয়োজন ছিল, নতুবা লীলাটি সাগরস্রোতপূর্ণ হইবে কেন। আজও সেই ন'দের লীলা হইতেছে, কোনও কোনও ভাগ্যবানে তাহা দেখিতেও পান। কিন্তু শচীমার বা তাঁর লীলাকুঞ্জে আবেশময়ী কোনও আদর্শ মাতার স্নেহ ব্যাতিবেকে এই লীলাকুঞ্জে প্রবেশের কাহারও অধিকার হয় না। প্রভুর প্রকটলীলায়ও দেখা যায় ষাঁরা নিমাইর কাছে বিকাইয়াছেন, তাঁরা সকলেই শচীমায়ের

অপত্যস্নেহে অভিসিক্ত হইয়াছেন। উদ্ধব-স্বভাব পরমানন্দপুরী পাছে শচীমায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত থাকেন তাই প্রভু তাঁকে পুরী থেকে ন'দে পাঠাইলেন। আমাব স্থির বিশ্বাস, যেখানেই আদর্শ-মাতৃত্বের সুরণ হইবে সেখানেই বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভাব আপনিই জাগিয়া উঠিবে। তার কারণ প্রভুর প্রেমের লীলাব সর্বাঙ্গীন পরিপুষ্টির জন্ত শচীমায়ের আঙ্গিনার ত্রায় একটা বাৎসল্যের আবেষ্টনীর প্রয়োজন—যেখানে রাজ্যের সব ভাই আসিয়া নাচিবে, গাহিবে, নিঃসঙ্কোচে খেলাধুলা করিবে। এই আবেষ্টনীর পরিধি বতই বৃহৎ হইবে ততই সৌভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি পাইয়া প্রভুর সংকল্পিত বিশ্বপরিবারের পত্তন সহজ হইতে সহজতর হইয়া উঠিবে।

এই আবেষ্টনীর প্রীতি অহৈতুকী, স্বার্থগন্ধলেশশূণ্য ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ইহাই মাহুঘের প্রকৃত ধর্ম ও প্রগতির লক্ষণ। ইহা না পাওয়া পর্যন্ত শত রকমের বাহ্য চাকচিক্য ভূষিত হইয়াও মাহুঘ প্রকৃত পশুভাবাপন্নই থাকিয়া যায়। এই সর্বচিন্তাকর্ষী অহৈতুকী প্রেমের খেলা খেলিতেই শ্রীগোরাঙ্গ আসিয়াছিলেন, দেশ-কালের সীমার দ্বারা এই খেলার পরিসমাপ্তি হইতে পারেনা—কারণ ইহা সমাজ বা রাষ্ট্রগত স্বার্থের দ্বারা কলঙ্কিত নয় এবং পুঞ্জীবাদী ও সর্ব-হারার বৈষম্যও এখানে নাই—যেহেতু এখানে সকলেই ভাই ভাই, সমান সমান। এই সহজ ভ্রাতৃত্ববোধ থেকেই মাহুঘ একদিন লোভ হিংসা দ্বৈষকে জয় করিয়া প্রকৃত প্রগতিবাদী হইবে ও সকলের আগ্রহে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে ॥

মায়ের আন্তরিক শুভেচ্ছায় আজ নব প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোরাঙ্গ-সুব-সমিতির সভ্যদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাঁর অনন্ত বাৎসল্যেব আবেষ্টনীর পটভূমিকায়ই অচির-ভবিষ্যতে বিশ্বপরিবার সংস্থাপনের শুভ প্রচেষ্টাও ফলপ্রসূ হইবে—ইহাতে আমাব বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

‘ভ্রাতৃত্বের মাতৃত্বের উজ্জ্বল আলোকে

নদীয়ার প্রেমধারা বহুক ভূলোকে—

প্রেমের এই আশির্বাণী সমগ্র জগৎকে উদ্বুদ্ধ করুক—

ইহাই আমার একমাত্র কাতর আবেদন।

সবক মৌলী

বাতাবহ

গৌর পূর্ণিমা

পূর্ন পূর্ন বৎসরের স্তায় এ বৎসরও গৌর-পূর্ণিমায় ব্রাহ্মণ-বাড়িয়ায় রায়সাহেব জগৎ চন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ীতে ধুম-ধামের সহিত অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন হয়। বহু শত লোক মহাপ্রসাদ পান। অষ্টপ্রহর কীর্ত্তনের পূর্বে ও পরে কয়েক দিবস নূতন নূতন ভাবে গৌবকথা আশ্বাদন করা হয়। নোয়াখালীর ম্যাজিস্ট্রেটের হেডক্লার্ক বৈষ্ণববর শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় ও চট্টগ্রামের ডিষ্ট্রিক্ট কাননগো শ্রীমৌলীভূষণ দত্ত মহাশয়দ্বয় সপরিবারে এই উৎসবে যোগদান করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। ঢাকার স্বদেশ প্রেমিক বৈষ্ণববর শ্রীহরিহর মজুমদার ও নোয়াখালী আদীরাবাদ হাইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীপ্রিয়লাল মজুমদার মহাশয় এই উৎসবে যোগদান করেন ও উৎসবের পরবর্ত্তী দিবস তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাবকল্প কণ্ঠে মহাপ্রভুর লীলাবর্ণন করিতে করিতে নয়নজলে ভাসিতে থাকেন। তৎকালে নয়নবারি সঞ্চরণ করা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব হইয়াছিল। সভা অন্তে বৈষ্ণববর শ্রীবিধুভূষণ মজুমদার মহাশয় শ্রীপত্রিকা সম্বন্ধে গুটীকয়েক প্রস্তাব উত্থাপন করেন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে—বাস্তবিকই যদি শ্রীপত্রিকাখানি গৌরভক্তবৃন্দ বিশেষ করিয়া শ্রীমায়েরগণের অন্তরের ও প্রাণের বস্তুই হয় তবে ইহার দ্রুপ দেয় বাৎসরিক সাহায্য মাত্র ৪ টাকা তাহাও সম্মত মত পাওয়া যায় না কেন? এই দুর্দিনের বাজারে আমাদের সমস্ত কিছুই চলিতে পারে শুধু চলিতে পারে কেন ভাল ভাবেই চতুর্গুণ ধরচ করিয়াও চলিতে পারে, আর এই পুত নামবাহী শ্রীপত্রিকাখানি যাহা মহাপ্রভুর অমৃত-লীলাকাহিনী ও লীলারস কথা বহন করিয়া প্রতি মাসে আমাদের গৃহে উদ্ভিত হন ও আমাদের সাধন ভঞ্জে অঙ্গাঙ্গিভাবে সহায়তা করেন সেই শ্রীপত্রিকা বাবদ মাসে মাত্র চার পাঁচ আনা খরচ করিতে আমরা বহুবার স্বিধা করি। নচেৎ শ্রীপত্রিকার বাবদ বাৎসরিক সাহায্যটী আমরা ১লা বৈশাখ তুলিয়া রাখিয়া বর্ষারস্ত করিতাম।

আমরা শ্রীমায়ের জয়ধ্বনি দেই শ্রীদাদার শ্রুতি মনে জাগিলে আমাদের চক্ষে জল আসে—অথচ তাঁহাদেরই পুত নামবাহী এই শ্রীপত্রিকা, তাঁহাদেরই আদরের ধন নদীয়াবুগলের লীলারসবাহী এই শ্রীপত্রিকা বাবদ সাহায্য তাহাও মাসে মাত্র চার পাঁচ আনা—ইহা দিতেও আমরা সঙ্কুচিত হই। ইত্যাদি আরো বহুভাবে শ্রীপত্রিকা সম্বন্ধে ও ইহার স্থায়িক-কল্পে বহু আলোচনা হয়।

গৌরপূর্ণিমা, উপলক্ষে এবছর পিরোজপুরে (বরিশাল) শ্রীল হরতারণ গাঙ্গুলী উকিল মহাশয়ের বাটীতে ১৬ প্রহর ব্যাপী নাম যজ্ঞ চলে ও ৩৪ দিবস ধরিয়া হাজার হাজার লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এই তিথিতে হলুহার প্রিয়াজীবনভের শ্রীঅঙ্গনে মহিলাগণ অষ্টপ্রহর ব্যাপী গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া নাম কীর্ত্তন করেন।

* * * *

ত্রিপুরা জেলার শ্রীরাং হইতে শ্রীবল্লভচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখিতেছেন যে ২৯শে মাঘ শ্রীগগনচন্দ্র ভৌমিক মহাশয়ের বাড়ীতে অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন হয় ও ইহাতে বহু সম্প্রদায়ের ভক্তবৃন্দ যোগদান করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ গৌর ধ্বনিতে আকাশ বাতাস ভরিয়া তুলে; এবং ১লা ফাল্গুন রায়শ্রী গ্রামে শ্রীচন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয়ের বাটীতেও অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন চলে। পরে পুনঃ গৌর-পূর্ণিমায় উক্ত গ্রামের চন্দ্রমোহন দে মহাশয়ের বাটীতে অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন হয়। সকল স্থানেই বৈষ্ণববর শ্রীল কালাচাঁদ দেব মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া উৎসবের পৌরহিত্য করেন। নামে আকৃষ্ট হইরা পক্ষ উৎসবের দিন-সকাল ৮টা হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত বহু লোক তাঁহার অনুগত হইয়া মহাপ্রভুতে আত্মসমর্পণ করেন।

* * * *

হাওড়া আমতার শ্রীশ্রীশিবশক্তি বোগাশ্রম বহুপরিচিত অধ্যয়ন পীঠ। স্বামী বিজয়ানন্দ সবস্বতী মহোদয়ের সভাপতিত্বে আশ্রমের ক্রমোন্নতি আশ্রম সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে বঙ্গভাষার পুরাণ, দর্শন ভাগবত, গীতা, তন্ত্র, বৈষ্ণব সাহিত্য, ইতিহাস জ্যোতিষ ও আবুর্কেদ প্রভৃতি

শাস্ত্রের পরীক্ষা গ্রহনান্তর উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থিকে উপাধি ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। লেখক, গ্রন্থকার, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক ও জ্যোতিষশাস্ত্রীদিগকে উপযুক্ত সম্মানসূচক উপাধি প্রদত্ত হয়। উপাধি নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি আছে। নানাস্থানের নানাবিষয়ক পণ্ডিত ননিধিগণকে লইয়া এই কমিটি গঠিত। স্বামী বিজয়ানন্দ সরস্বতী তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বহুগুণাবিত দেশসেবার জন্য শাস্তিপুর, নবদ্বীপ, পূর্ববঙ্গ অঞ্চলের পণ্ডিত সমাজে সুপরিচিত। আমরা এই সনাতন হিন্দুধর্মবিজ্ঞানতনের শ্রী কামনা করি।

* * * *

ভারত সরকারের বাজেটে বাঙলার দুর্ভিক্ষের জন্য এই বৎসর অনধিক ৩ কোটি টাকা মাত্র বরাদ্দ হইয়াছে। বাঙলার অধিবাসীরা ক্ষুদ্র চিত্তেই তাহা গ্রহণ করিবে। এই শিক্ষাদানের জন্য তাহারা প্রস্তুত ছিলেন না। দুর্ভিক্ষে দুই বৎসরে প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের এই নগন্য বরাদ্দ স্বতঃই বিক্ষোভের কারণ ঘটাইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব সর্বাধিক, সম্পূর্ণ ব্যয় ভার তাহাদেরই বহন করা উচিত ছিল। এই ব্যয়বরাদ্দ তাহাদের কর্তব্য বোধের শৈথিল্যই সূচিত করে। বর্তমান বৎসরের সংশোধিত হিসাবে ৯২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা ও আগামী বৎসর ৭৮ কোটি ২১ লক্ষ টাকা ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে। এই বৎসর ২৫৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আয়, ৩৪৬ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয় এবং আগামী বৎসর ২৮৪ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা আয় এবং ৩৬৩ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট বরাদ্দগুলি বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে দেশরক্ষার ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার প্রতি বৎসর বিবৃতি ঘাটতি পড়িতেছে। ঐ বিভাগের জন্য বর্তমান বৎসরে ২৬২ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা এবং আগামী বৎসর ২৭৬ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ববর্তী বৎসরে দেশরক্ষা বিভাগে নিয়মিত ব্যয় ছিল ৪৬ কোটি ২০ লক্ষ টাকা।

আগামী বৎসর ঘাটতি হ্রাসের উদ্দেশ্যে কতকগুলি নূতন কর স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। চা সুপারি ও কাফির উপর প্রতি পাউণ্ডে দুই আনা হারে উৎপাদন শুল্ক ধার্য করার,

তামাকের উপর শুল্ক বৃদ্ধির, কৃষি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী লগ্নার সময় মৃত্যুকের আদায়ের, দশ হাজার টাকার অধিক ব্যক্তিগত আয়ের উপর এবং কারবারে ৩৫ হাজার হইতে ২লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর অতিরিক্ত করের হার বৃদ্ধির জন্য অর্থ সচিব পরামর্শ দিয়াছেন। কর স্থাপন নীতির প্রতিকূলে বহু কথা বলিবার আছে, কর্তৃপক্ষেরও তাহা ভালই জানা আছে। কিন্তু সুবিবেচনার অভাব বেধানে সেখানে অনন্যোপায় হইয়া সহ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

* * * *

ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যগুলিকে বৃহৎ রাজ্যের সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য যে বিল উত্থাপিত হইয়াছিল, গত ১৪ই মার্চ তাহা ভোট গণনা ব্যতীতই কমন্স সভায় গৃহীত হইয়াছে। মিঃ আমেরি একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন যে, বিলের প্রথম ধারায় কেবল গুজরাট ও কাথিয়াবাড়ের রাজ্যগুলি সম্পর্কেই প্রযুক্ত হইবে, অন্যান্য রাজ্য সম্বন্ধে হইবে না। লর্ড সভাতেও ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য-গ্রাস বিলের সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে রাজ্য অনুমোদন করিবামাত্রই বিলটি আইনে পরিণত হইবে।

* * * *

গত ১৫ই মার্চ এলাহাবাদের কংগ্রেসকর্মীদের এক ধরোয়া বৈঠক হইয়া গিয়াছে। শ্রীবক্ত সম্পূর্ণানন্দ, শ্রীবক্ত বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, শ্রীবক্ত শ্রীপ্রকাশ, শ্রীবক্তা ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীবক্ত কিরোজ গান্ধী, শ্রীবক্তা পূর্ণিমা ব্যানার্জী, শ্রীবক্ত এ জে খের, শ্রীবক্ত গোপালনারায়ণ ও সাকসেনা প্রভৃতির সাক্ষরবৃত্ত একটা বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। সভায় অন্যান্য বিষয়ের সহিত রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের পরিবারবর্গের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহের জন্য শ্রীবক্তা-বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, ডাঃ কে এন কটজু প্রভৃতিকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জিলা-কমিটি গঠনের আবশ্যিকতা স্বীকৃত হয়। স্বাক্ষরকারীগণ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে নূতন করিয়া তাহাদের পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেন। মুসলিম লীগের নেতৃগণ যে কংগ্রেস ও কংগ্রেসের লক্ষ্য স্বাধীনতা অর্জন হইতে

দূরে সরিয়া যাইতেছেন তজ্জন্য সভা দুঃখ প্রকাশ করেন। স্বাক্ষরকারীগণ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ১৯৪২-৪৩ সালের ২রা এপ্রিলের প্রস্তাবের প্রতি লীগেব মনোযোগ কর্ষণ করেন। উহাতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সুস্পষ্ট-রূপে মানিয়া লওয়া হইয়াছে এবং এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে যে কোনও অঞ্চলের অধিবাসীগণকে ভারতীয়-নিয়ন্ত্রনের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে বাধ্য করা হইবে না।

* * * *

একটা সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হইয়াছে যে, এখন তে বাঙ্গলা ও আসামের সর্বত্র বাবতীয় অসামরিক চিঠি-সেন্সর করা হইবে এবং শব্দপঙ্ক্তির কাজে আসিতে পারে তাপ কোন তথ্য বা সংবাদ কোন চিঠির মধ্যে থাকিলে তার লেখককে দণ্ডিত করা হইবে। যুদ্ধান্ত হইতে বাঙ্গলা আসামের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল সমূহে যে কোন প্রকার পত্রই সাব করা হইতেছে। সেই সেন্সরের গণ্ডী ব্যাপকতর হইবে। সমস্ত অঞ্চলের বাবতীয় চিঠি পত্রই এখন সেন্সরের দ্বারা নিরীক্ষিত স্থানে পৌছিব। জরুরী অবস্থায় সেন্সরের স্বাধীনতা অস্বীকার না করিয়াও জনসাধারণ এই-প্রকারে খুবই বিব্রত বোধ করিবেন। নির্দিষ্টকালে ঘরোয়া ঠা খোলা ও পড়া কেহই সন্দেহ মনে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। তাহা ভিন্ন চিঠির আদান প্রদানে বিলম্ব ঘটবে তাহা ভিন্ন দিক দিয়া ক্ষতির কারণ হইতে পারে, বৈষয়িক ক্ষতিও হইতে পারে। পরিবারের আভ্যন্তরীণ গোপনীয়-সম্বন্ধের গোচরে আসাও সহজ ভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হইবে। এইরূপ অবাধ সেন্সর কেহই বাঙ্গলীয় মনে করিতে পারেন না। যুদ্ধ প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করিয়া ও জনসাধারণ এই ধরনের সেন্সরে বিপন্ন বোধ করিবেন। চিঠি-লিখিবার সময় সাবধানতার অভাব না ঘটে তদসম্বন্ধে বাসীর অবহিত হওয়া আবশ্যিক।

গত ৬ই মার্চ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাজেটের সাধারণ লক্ষ্যনাশালে সর্দার মঙ্গল সিং বর্তমান বাজেটকে “পকেট-বাজেট” বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলেন যে, গণচিৎ গোপনে জনসাধারণের পকেটে হাত ঢুকাইয়া যে-প্রকারে টাকা “চুরি” করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা আরও বলেন যে গবর্ণমেন্ট নিজেদের ব্যবস্থার দ্বারা লায় এমন অবস্থার সৃষ্টি করেন, যাহাতে ৩৫ লক্ষ নর-স্বামী ও শিশুর প্রাণহানি ঘটে। এই যুদ্ধে ব্রুটেন ও আমেরিকার মোট ষত লোক মরিয়াছে এই সংখ্যা তাহারও বেশী। যাদের বাজেট আলোচনা সমগ্রভাবে অনুসরণ করিলে এই কথাই মনে জাগিবে ‘আমরা আছি কোথায়?’

* * * *

৬ই মার্চ তারিখে বাঙ্গলা সরকারের এক আদেশে বঙ্গীয়

অত্যাধিকারিক বাহিনী সামগ্রী মজুত নিরোধ করা হইয়াছে। যে অঞ্চলে এই আদেশ বলবৎ থাকিবে সেখানে কেহ জল বা স্থল পথে পূর্বপ্রাপ্ত অল্পমতি ভিন্ন কোন অত্যাধিকারিক বাহিনী-দ্রব্য চাউল, ধান, আটা, গম, ময়দা বা চিনি আমদানী করিতে পারিবেন না। এখন হইতে কোন ব্যক্তি অল্পমতি না লইয়া বঙ্গীয় ব্যক্তির জন্ত ৮ ইউনিট ও শিশুর জন্ত ৪ ইউনিটের বেশী চাউল, গম, আটা ও ময়দা এবং ৮ ইউনিটের বেশী চিনি মজুত করিতে পারিবেন না। এই আদেশ সমগ্র বাঙ্গলায় প্রযোজ্য হইবে। সরকার প্রয়োজন মত যে-কোন অঞ্চলে ইহা চালু করিবার কথা ঘোষণা করিবেন।

* * * *

গত ৫ই মার্চ প্রত্যুষে বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেলওয়েব আড়ংঘাটা স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে কলিকাতা অভিমুখী ঢাকা মেলের একখানি তৃতীয় শ্রেণীর বগী গাড়ীতে আগুন ধরিয়া যায় এবং তাহার ফলে ২০ জন লোক আহত হয়। এই দুর্ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। দৈবের উপর কাহারও হাত নাই তথাপি এইরূপ অপ্রত্যাশিত ঘটনা যে একান্ত করুণ সে সন্দেহে সন্দেহের অবকাশ নাই।

* * * *

রয়টারের ৬ই মার্চ তারিখের সংবাদে প্রকাশ, ব্রুটেনে বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্য সংগ্রহের ব্যাপারে কংগ্রেসকর্মীদের মনোভাব কিরূপ হওয়া উচিত, ভারতীয় কংগ্রেস কর্মী সমিতির এক পুস্তিকায় তাহা এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে :— “কোন ব্যক্তি শাস্তিবাদী না হইয়াও কংগ্রেস কর্মী হিসাবে যদি ব্রুটেনের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় (অতএব সশস্ত্র ব্রিটিশ বাহিনীতে) যোগদান করিতে না পারে তবে মতের দরদর যুদ্ধে যোগদানে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদিগের বিচারের জন্ত স্থাপিত ট্রাইবুনাল হইতে তাঁহাকে রেহাই দিবেন না। তাঁহাকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইতে বলা হইবে। যদি তিনি ইহাতে অসম্মত হন তবে তাঁহাকে দণ্ড গ্রহণের জন্ত আদালতে হাজির করা হইবে। কংগ্রেসকর্মী হিসাবে তিনি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইতে অসম্মত হইবেন, ফলে তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হইবে। তিনি যদি প্রকৃতভাবে ব্রিটিশ কারাগারে গমন করেন, তবেই ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে বেশী সাহায্য করিবেন। কংগ্রেসকর্মী আদালতের দ্বারা যাক্ষা করেন না। ব্রিটিশ রাজের নিকট হইতে তিনি কোন অল্পগ্রহণ চাহেন না। নির্ধা পালনের জন্ত দরকার হইলে কারাবরণ করিলেই তিনি স্বাধীন ভারতের ভিত্তি স্থাপন করিবেন।”

* * * *

এবার নয়া দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ২১তম অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনীরাঙ্গন সরকার সাধারণ অধিবেশনে পৌরহিত্য করেন। সম্মেলনে

বান্ধলার কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যকর্তা, সংস্কৃতিবিৎ এবং বান্ধনীতিজ্ঞ আহত হইয়াছিলেন; এতদ্বিন্ন অস্ত্রাশ্রয়ান হইতেও বহু মনোবি যোগদান করিয়াছিলেন। এই প্রকার সম্মেলনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সম্প্রসারণের যেমন সুযোগ মিলিয়া পাকে তেমনি প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও সাহিত্যছব্বাগীদের সহিত জন্মভূমির যোগাযোগ উপলব্ধির বিশিষ্ট ক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই দিক দিয়াই এই সম্মেলনের গুরুত্ব বাঙ্গালীর নিকট অনেকখানি। এই সম্মেলন সমগ্র বাঙ্গালীজাতির ঐক্য বন্ধনের প্রথম ও প্রধান সোপান।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি ডাঃ রাধাবিনোদ পাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইসচ্যান্সেলার নির্বাচিত হইয়াছেন জানিয়া সকলেই আনন্দিত হইবেন। ডাঃ বি সি রায়ের কার্যকাল শেষ হইয়া আসিয়াছে। ডাঃ রায় চিকিৎসা জগতে সর্বজনবরেণ্য। ডাঃ পালও আইনজ্ঞ-রূপে খ্যাতিমান। ডাঃ রায়ের পর ডাঃ পাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হইবেন ইহাতে দেশবাসী মানন্দে সমর্থন জানাইবেন। ডাঃ পাল বাঙলার একজন বরেণ্য সন্তান; আমরা তাঁহাকে এই উপলক্ষে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

নিখিল ভারত কিষান সম্মেলনের গত বেজোয়াদা অধিবেশনে এই মর্মে জাতীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবী করিয়া বলা হইয়াছে যে, সরকারের আটক নীতির ফলে ভারতেই কেবল অবস্থা ধারাপ হয় নাই, চীন, মার্কিন ব্রিটিশ ও ভারতীয় জনসাধারণের সম্মিলিত স্বার্থের প্রতিকূলতা করা হইয়াছে। প্রস্তাবে প্রাদেশিক কৃষক সভাগুলিকে জনগণের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীর ভিত্তিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন চালাইতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। কিষান সভা ভারতের বিরাট জনসংখ্যার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। জনমতকে লক্ষিত করিবার নীতি আরও কতদিন অমুহৃত হইবে কে জানে।

গত ১৭ই মার্চ অসামরিক সরবরাহ দপ্তর হইতে নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে :—১৯৪৩ সালের ২৭শে আগষ্ট তারিখে এক আদেশ জারী করা হইয়াছিল যে, কলিকাতা এবং শিল্পাঞ্চলগুলিতে ৫০ জনের অধিক ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে সরবরাহ দপ্তরের ডিরেক্টর অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারীর অনুমতি লইতে হইবে। সরকার এখন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ৫০ জনের অধিক ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণের অনুমতি দেওয়া হইবে না। যদি কোন ব্যক্তি গৃহস্বামীর গৃহে প্রতিদিন আহার না করেন তবে তাহাকে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করা হইবে। এই আদেশের প্রয়োজনীয়তা অবোধ্য নহে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা জটিলতার

সৃষ্টি করিবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। সামাজিকতার বাঘটলে মনে আঘাত লাগাই স্বাভাবিক।

এক সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী ৭ই, ৮ই, ৯ই এ তারিখে দিল্লীতে নিখিল ভারত কায়স্থ সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। অভ্যর্থনা সমিতির এক অধিবেশনে জ্ঞার জে পি শ্রীবাস্তব উক্ত সম্মেলনের সভা নির্বাচিত হইয়াছেন। কায়স্থ সমাজের এই সর্বস্তম্ভ সম্মেলন সার্থক হউক, সাফল্যমণ্ডিত হউক, ইহাই একান্তমনে কামনা করি।

ভারতের সীমান্তে জাপানী হামলা শুরু হইয়াছে, সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, গত ১২ই মার্চ শিলচর এলেকাষ কয়েকখানি শত্রু বিমান হানা দিয়া কয়েকটা বোমা বর্ষণ করে। ক্ষতি বৎসামাস্ত্র এবং অতি অল্প সংখ্যক লোক হতাহত হইয়াছে। গত ১৬ই মার্চ ও ১৭ই তারিখে শত্রুবিমান ইক্ষল এলেকাষ আক্রমণ চালাইয়া ক্ষতির পরিমাণ ও হতাহতের সংখ্যা নগণ্য। সেই দুইটা মন্দির ধ্বংস হইয়াছে। মিত্র পক্ষের জঙ্গী বিমান একটা শত্রু বিমান ভূপতিত করে। শত্রুপক্ষীয় তৈরী হয়ত ভবিষ্যতে প্রবলও হইতে পারে। বিপদে হইলে সর্বনাশ ডাকিয়া আনা হইবে। দেশ রক্ষার মিত্রপক্ষ পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুত করিয়াছেন। দেশবাসীর সাহসের সহিত বিপদের মুখে অবিচল থাকিতে হইবে।

আর একটা সংবাদে প্রকাশ জাপানীরা মণিপুর প্রবেশ করিয়াছে।

বহু বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া শ্রীশ্রীমাদাদার দ্বিতীয়া পূর্ণ হইল। গৌরভক্তবৃন্দ ও অমুরাগী পাঠক পাঠিকা ঐকান্তিক উৎসাহ উদ্দীপনায় ইহা সম্ভব হইয়াছে। কারণে বহু ভুল প্রমাদ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা শ্রীশ্রীমাদাদার আন্তরিক সহানুভূতি ও প্রাণের সহিত গ্রহণ করিয়া আম উৎসাহ বহুগুণ বাড়াইয়াছেন ও আগামী বৎসরের ষষ্ঠ উজোগে সাহসী করিয়াছেন। সুধীসমাজে এই শ্রীপতি স্বীয় স্থান পাওয়ায় আমরা আরো উৎসাহিত হইয়াছি।

আলোচ্য বৎসরে বাংলার নানা স্থানের বহু পণ্ডিতধর্মপ্রাণ গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। শ্রীপত্রিকাখানি বৈষ্ণব ও গৌরভক্তবৃন্দের নিকট প্রাপ্ত বাৎসরিক সাহায্যের দ্বারাই চলে; সুতরাং সকলে স্বীয় সাহায্য আমাদের কলিকাতা ২২১১২ রোড শাখা অফিসে বর্ষান্তেই পাঠাইয়া দিয়া সাহায্য করিবেন।

অত্যাশ্চর্য্য ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ দৈব ঔষধ

১। - মাতঙ্গী যোগ

সুস্থ ব্যক্তির এক সপ্তাহ মাত্র সেবনে তিন বৎসর কলেরা বা কোনরূপ পেটের পীড়া হইবে না।

কলেরা রোগাক্রান্ত ব্যক্তি রোগের প্রাথমিক অবস্থায় একবার মাত্র সেবনেই

সুস্থল পাইবেন। মূল্য এক সপ্তাহ ১ টাকা, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

২। ভৈরবী যোগ

বসন্ত রোগের প্রতিষেধক অমোঘ ঔষধ। এক সপ্তাহ সেবনে তিন বৎসর উক্ত রোগ

হইবে না। এক মাস সেবন করিলে জীবনে কখনও বসন্তরোগ হইবে না।

মূল্য এক সপ্তাহ ১।০ টাকা, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

৩। ত্রিশূলী যোগ

দিনের পুরাতন ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎদৃষ্ট বিষম জ্বর হউক, মাত্র একমাস সেবনে

সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন। সুস্থ শরীরে দুই সপ্তাহ সেবন করিলে জীবনে কখনও উক্ত

রোগ হইবে না। দুই সপ্তাহ সেবনোপযোগী মূল্য ২ টাকা। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

শ্রীগৌরীশঙ্কর বসু

১৯ নং বৈঠকখানা সেকেন্ড লেন, কলিকাতা।

চিকিৎসা জগতে যুগান্তর।

লগ্ন-নিদান বিদ্যালয়।

অধ্যক্ষ—শ্রীপ্যারীলাল রায় এম. এ. বিস্তারিত জ্যোতিষার্থে জ্যোতিঃশিরোমণি।

পৃষ্ঠপোষক

ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীল হরিদাস মজুমদার।

মানার রোগের অতীত ইতিহাস সহ পত্র লিখিবার সময় উল্লেখ করিয়া অতীত বার আনার ষ্ট্যাম্প সহ

ছুরারোগ্য ব্যাধি উপসমের ব্যবস্থার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখুন :—

বরিশাল আয়ুর্বেদ কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক—

শ্রীপ্যারীলাল রায় এম-এ

হেডমাষ্টার তারা ইন্সটিটিউশন, বাথী পোঃ (বরিশাল)



আর ম্যালেরিয়া হয় না।

“ম্যালোলীন”

ম্যালেরিয়া ও সর্বপ্রকার জ্বরের পরীক্ষিত অমোঘ ঔষধ।

উন্-আ-রিও
(অশোক কম্পাউণ্ড্, ঘটিত)
ষাবতীয় গ্রীরোগে অব্যর্থ

হ্যারোলিন
সুবাসিত কেশ তৈ
(অলিভ অয়েল ঘটিত)

রাতা

সকল প্রকার বাত বেদনায় একমাত্র প্রতিশোধক।
(প্রেটি ক্যামিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ্—কলিকাতা)

সোল্ এজেন্ট :- দাদা এণ্ড কোং
২২১-২ ষ্ট্রাণ্ড্ ব্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীমা-দাদা কমিটি

যুগ্ম সভাপতি

গৌরপ্রেমসুধাসিন্ধু শ্রীযুগলকান্তি ঘোষ ভক্তিবৃষণ
সাহিত্যবৃষণ শ্রীবিধুবৃষণ সরকার বি-এ, বিজ্ঞাবিনোদ

সভ্যবৃন্দ

শ্রীকিরণকুমার সেন রায়চৌধুরী, জমিদার, বাসগু, বরিশাল
রায় সাহেব জগচ্চন্দ্র রায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা
শ্রীমৌলীবৃষণ দত্ত বি-এ, ডিষ্ট্রিক্ট কাননগো, চট্টগ্রাম
শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়, নাজীর, নোয়াখালী
শ্রীবিধুবৃষণ মজুমদার, চাঁদপুর, ত্রিপুরা
শ্রীবিনোদবিহারী চৌধুরী বি-এল, জমিদার

৩৭।১ রজনী চৌধুরী বাগ, গ্যাণ্ডারিয়া, ঢাকা

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বিশ্বাস, তালুকদার, রঘুনাথপুর, বরিশাল
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল কুণ্ড, মার্চেন্ট, মীরকাদিম, ঢাকা
শ্রীগৌরদাস নট্ট, মার্চেন্ট, কলমিকান্দর, বরিশাল
শ্রীরসিক চন্দ্র দে, মার্চেন্ট, কাউখালী, বরিশাল
শ্রীঅতুল চন্দ্র বিশ্বাস, বি-এ, কলিকাতা
শ্রীসুধাংশুবৃষণ সরকার, কলিকাতা

কর্ম বিভাগ

প্রচার :

সাহায্যমান প্রচার

শ্রীকিরণকুমার সেন রায়চৌধুরী

শ্রীবিধুবৃষণ মজুমদার

শ্রীবিনোদবিহারী চৌধুরী

শ্রীরসিকচন্দ্র দে

প্রবন্ধ

শ্রীমৌলীবৃষণ দত্ত

মন্ত্রণা

সংগ্রহ

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বিশ্বাস

ডক্টর অক্ষয়কুমার ভৌমিক

অর্থ

রায় সাহেব জগৎ চন্দ্র রায়

শ্রীগৌরদাস নট্ট

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল কুণ্ড

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়

পরিচালনা :—শ্রীসুধাংশুবৃষণ সরকার

কলিকাতা শাখা অফিস

প্রধান কার্যালয়

ইলুহার, বরিশাল

শাখা কার্যালয়

২২১।২ ষ্ট্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা।

বৈষ্ণব গ্রন্থের বিজয় বৈজয়ন্তী।

সাহিত্যভূষণ শ্রীবিধুভূষণ সরকার, বি-এ, বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

(আদিখণ্ড)

মহাপ্রভুর লীলামৃতের জীবন্ত আলোক্য। ভাব ও ভাষার প্রাণবন্ত রূপ।

ইহা পাঠ করিতে করিতে নিতান্ত বহিস্মুখী শুষ্ক হৃদয়ও নিগুঢ় রসের সন্ধান পাইবেন।

আনন্দাশ্রু বর্ষণে মনের মালিগা কাটিয়া যাইবে।

মূল্য—৭ টাকা (ডাকমাণ্ডুল স্বতন্ত্র)

বাঁহারা দ্বিতীয় খণ্ড পাইতে ইচ্ছুক রূপা করিয়া অল্প হইতে নাম রেভিষ্ট্রী করিবেন, নচেৎ না-ও পাইতে পারেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন :—

The greatest classic of the Gaudia School of Vaishnavism as inantiated by Lord Chaitanya is Sri Sri Chaitanya Charitamrita. In fact it is the Bible of the School. Numerous editions of the celebrated work have come out, but none has delighted and moved us more than the present one. Srejut Sarker himself is a "Sadhaka" and is thus able to provide us illuminations and interpretations which we seldom get elsewhere. To men groping in the dark, he offers guidance. We have no doubt that the Commentator will be long remembered by his work.

সুগান্তর বলেন :—

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বাংলা ভাষায় একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। দীর্ঘকাল বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ ইহার তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া আসিতেছেন, বহু উল্লেখযোগ্য সংস্করণও এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। সুবিশাল সাহিত্যের মালায় এই সংস্করণটি নূতন সম্পদরূপে গণ্য হইবে এবং এই গ্রন্থের পরবর্ত্তি খণ্ডগুলি প্রকাশিত সমগ্রভাবে ইহা একটি অবিতীয় প্রামাণিক সংস্করণই হইবে। মূল শ্লোকগুলির সহিত তাহাদের অর্থ, ব্যাখ্যা ও টিকা ইহাতে যে ভাবে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে তাহা একাধারে পাণ্ডিত্য ও রসালুভূতির আদর্শ স্বরূপ। ভূমিকায় প্রেম ও ভক্তির যে বিপুল বিশ্লেষণ স্থান পাইয়াছে, রচনা হিসাবে তাহা যেমন-মনোজ্ঞ, আলোচনা হিসাবে তেমনি পত্রিচায়ক। প্রেম ও ভক্তি পরায়ণ বৈষ্ণবগণ তথা জিজ্ঞাসু পাঠকগণ সকলেই ইহা পাঠে সবিশেষ উপকৃত হইবেন। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীশ্রীমা-দাদা কার্যালয়—ইলুহার, বরিশাল।

শ্রীশ্রীমা-দাদা শাখা কার্যালয়—২২১২ ষ্ট্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা।

মহেশ লাইব্রেরী—২১১ গ্রামাচার দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বীণা লাইব্রেরী—১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।